تاریخ امت مسلمہ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী

ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
[প্রথম খণ্ড]

মূল : মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ : নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী

প্রকাশক : মাওলানা মুফতী ইসহাক
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী, বাংলার প্রকাশন
রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ৫৬০ টাকা মাত্র

অর্পণ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতা
যারা আমার পার্থিব জীবনের ওসিলা হয়েছেন
যারা ইলমে দীনের পথে আমাকে ওয়াকফ করেছেন
যারা আমাকে মমতার ছায়া দিয়েছেন, ছায়া দিচ্ছেন।
আল্লাহ, আমার মাকে 'হায়াতে তাইয়্যিবা' দান করুন।
আল্লাহ আমার বাবাকে 'তুরবাতে তাইয়্যিবা' প্রদান করুন।
আল্লাহ আমার মা-বাবাকে 'জান্নাতুল ফিরদাউস' নসিব করুন।
আমিন।

- অনুবাদক

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান
‘আল মানহাল পাবলিশার্স’-এর পক্ষ থেকে
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশের

অনুমতিপত্র

Al-MANHAL
Publishers

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

St# 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islmanic Centre,
Gulistan-e-Juhar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

Ref: AMP-107

Date: 10 - Feb - 2021

بسم الله الرحمن الرحيم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, 'Ta reekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلادیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور ومعروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہٗ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher
Block 1-A, Gulistan-e-Juhar, Karachi
021-34612901 10321-3135009

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

প্রকাশকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد

মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ দয়া ও কৃপায় 'মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ' ধীরে ধীরে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে এজন্য আমরা দয়াময় প্রভুর দরবারে জানাই কোটি কোটি শোকর ও সিজদা। সেই সাথে পাঠকের জন্যও রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। কারণ, প্রকাশনার শুরু থেকে পাঠকের আস্থা ও ভালোবাসাই ছিল আমাদের চলার পথের প্রেরণা।

মূলত 'ইত্তিহাদে'র সূচনা হয়েছিল একটি ব্যতিক্রমী চিন্তা ও স্বপ্ন থেকে। অর্থাৎ এ দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ আলেমেদীন, জামিয়া বানুরিয়া করাচির সাবেক এবং বর্তমান হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতি, হজরত মাওলানা মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব হুজুরের কিতাবসমূহ প্রকাশ করা। আলহামদু লিল্লাহ, শুরু থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইত্তিহাদ এ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। সূচনালগ্ন থেকে সব সময় হজরতের আন্তরিক দোয়া, পরামর্শ ও উপদেশ ইত্তিহাদের সঙ্গে ছিল এবং আগামীতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। মূলত হজরতের দিকনির্দেশনাই ইত্তিহাদকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

সেই সাথে অবহেলিত বিষয়গুলো নিয়েও ইত্তিহাদ কাজ করছে। বহু কিতাব এক সময় এ দেশের কওমি অঙ্গনে ব্যাপকভাবে পঠিত ও চর্চিত ছিল; কিন্তু এখন নেই, কিংবা থাকলেও খুব কম। ইত্তিহাদ অত্যন্ত যত্নের সাথে এমন বহু কিতাব সংরক্ষণ করে আসছে এবং অনুসন্ধানী পাঠকের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে।

এরই সাথে আমাদের বহুদিনের ইচ্ছা, দরসি কিতাবের পাশাপাশি বাঙালি পাঠকদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণে বিশুদ্ধ বাংলায় কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানও সরবরাহ করা। সে লক্ষ্যে ইত্তিহাদ একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কারণ, তিক্ত হলেও সত্য যে, চারিদিকে আজ চলছে ইসলাম ও মুসলিমদের নির্মূল করার নানামুখী ষড়যন্ত্র। ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্ট উভয় মাধ্যমে আজ ইসলাম-বিদ্বেষ ও মুসলিম-নিধন পরিণত হয়েছে একটি ফ্যাশন ও উল্লাসে। উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা মনে করি, প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের উচিত দীন রক্ষার নববী কাফেলায় শামিল হয়ে জীবন উৎসর্গ

করা। এ প্রেরণা ও বেদনা থেকেই আমাদের এ উদ্যোগ। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠক এ আয়োজনে বরাবরের মতোই আমাদের পাশে থাকবেন।

উক্ত পরিপল্পনারই একটি অংশ ইসলামের পূর্ণ ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করা। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুদিন আগে আমরা প্রকাশ করেছি তরুণ লেখক মাওলানা ইমরান রাইহান'র 'আব্বাসি খিলাফাহ', যা ইতিমধ্যে পাঠকের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

এ বিষয়ে ইত্তিহাদের দ্বিতীয় উপহার, ইসলামি ইতিহাসের বহু প্রতিক্ষিত ও বিশ্বব্যাপী প্রত্যাশিত গ্রন্থ 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস'। গ্রন্থটি রচনা করেছেন পাকিস্তানের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ। ৪ (চার) খণ্ডে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার এ বিশাল গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে করাচির 'আল মানহাল পাবলিশার্স'।

পাঠকের সুবিধার কথা চিন্তা করে ইত্তিহাদ এ ৪ (চার) খণ্ডকে দুই কিস্তিতে ১৫ (পনের) খণ্ডে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে ৬ (ছয়) খণ্ড প্রকাশ করা হল। এমন একটি কালজয়ী গ্রন্থ বাঙালি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যিই রব্বে কারিমের দরবারে কৃতজ্ঞ। সন্ধান পাওয়ার পর থেকেই আমরা এর স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান 'আল মানহাল' কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। একপর্যায়ে বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং লিখিতভাবে আর্থিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। সেই সাথে বিদগ্ধ লেখক মাওলানা ইসমাইল রেহান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মূল্যবান অভিমতও লিখে পাঠান।

সর্বোপরি পাঠকই একটি প্রকাশনার মূল পরিচালক। পাঠকের চাহিদা ও পছন্দই একটি প্রকাশনা বাঁচিয়ে রাখে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা চেষ্টা করেছি এই বিশাল গ্রন্থটি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে পাঠকের সামনে পরিবেশন করার জন্য। কিন্তু কোনো কিছুর নির্ভুল উপস্থাপনা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই বোদ্ধা পাঠকসমাজের কাছে অনুরোধ, আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদের উপকৃত করবেন। আপনাদের যেকোনো অভিমত ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মদ ইসহাক

২৩-২-২১ ঈসায়ী

বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে

মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহর

অভিমত

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اس عاجز کے لیے یہ انتہائی مسرت اور تشکر کا مقام ہے کہ اللہ کریم نے اس کی کاوش "تاریخ امت مسلمہ" کو توقع سے بڑھ کر پذیرائی بخشی۔ اس سلسلے میں ایک نہایت اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ہمارے برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش کے علمائے کرام نے اسے سراہتے ہوئے اس کے بنگلہ زبان میں ترجمے کی طرف توجہ دی۔ بنگلہ زبان اس خطے کے کروڑوں باشندوں کی زبان ہے جو بڑی شیریں، وسیع اور خوبصورت ہے اور اس میں صدہا جلیل القدر علماء کی درجنوں علمی تحقیقی کتب موجود ہیں۔ بندہ عاجز کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ اس عظیم زبان میں اس کی کتاب کو لباس نو سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔

"مکتبۃ الاتحاد" نے اس علمی خدمت کا بیڑا اٹھا کر نہ صرف بنگلہ زبان بلکہ عالم اسلام کی ایک بڑی ضرورت پوری کرنے میں حصہ لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مترجم، ناشر اور اس خدمت میں شریک تمام حضرات سے راضی ہو اور انہیں دینوی واخروی ترقیات سے نوازے۔

جزاہم اللہ احسن الجزاء۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

محمد اسماعیل ریحان

١٥/٧/١٤٤٣ھ

অভিমতের বাংলা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

অধমের জন্য এটি অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের বিষয় যে, তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) বিষয়ে অধমের সামান্য কিছু অপূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উম্মতের মাঝে কল্পনাতীত গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেছেন। সম্প্রতি এই ধারাবাহিকতায় আরেকটি খুশির খবর যুক্ত হয়েছে। আমরা জানি উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্কও বন্ধুপ্রতীম। এই অঞ্চলের ওলামায়ে কেরামের কাছেও সম্প্রতি অধমের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পৌঁছেছে এবং তাঁরা একে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। একপর্যায়ে তাঁরা একে তাদের মহান ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলা এতৎঅঞ্চলের একটি মহান ও প্রাচীন ভাষা। লক্ষ-কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। আমার জানামতে এই ভাষার সাহিত্য, গদ্যের ভাব ও কবিতার ছন্দ সবই অতুলনীয়। বিশেষত ইসলাম বিষয়ে এই ভাষায় অনেক গবেষণামূলক কাজ পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। অধমের জন্য এই সংবাদ অত্যন্ত আনন্দদায়ক যে, এমন একটি মহান ভাষার বর্ণমালার অলংকারে তারিখে উম্মতে মুসলিমাহকে (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) সুসজ্জিত করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ বাংলাভাষার ইসলামি সমাজের পক্ষ থেকে এই গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। বাংলাদেশ তো বটেই; বরং সমগ্র ইসলামিবিশ্বের জন্য এটি একটি বিশেষ অর্জন ও মাইলফলক বলে মনে করি। আল্লাহ রাব্বে কারিমের দরবারে আকুল আবেদন, আল্লাহ তায়ালা যেন লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা কবুল করেন। মাকতাবাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দান করেন। এই প্রচেষ্টাকে ইহ ও পরকালীন জীবনে সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

فجزاه الله احسن الجزاء، آمين بجاه سيد المرسلين

صلى الله عليه وسلم

মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান

৫/৭/১৪৪২ হিজরি

অনুবাদকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার অশেষ শোকর যে, তিনি এমন মহান ও মোবারক কাজে আমাকে অংশগ্রহণ করার তাওফিক দিয়েছেন। ইতিহাস ও ইতিহাসের গল্পপাঠের প্রতি আমি দারুণ অনুরাগী। ইসলামি ইতিহাসের মৌলিকগ্রন্থগুলো প্রায়ই ঘাঁটাঘাঁটি করার সৌভাগ্য হয়। মনীষীদের জীবনীপাঠ তো আমার অন্যতম প্রধান শখ। আল্লাহর অনুগ্রহে বালিশের পাশে, মুঠোফোনে এ ধরনের কিতাবাদি সর্বদা রাখার চেষ্টা করি।

ইতিহাসের প্রতি সখ্যতা ও ভালোলাগার সূত্রধরেই মাকতাবাতুল ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী মাওলানা ইসহাক ভাই (আল্লাহ তায়ালা তাকে উভয় জাহানে সফলতা দান করুন) যখন 'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'র অনুবাদের প্রস্তাব করেন, প্রথমে যদিও নিজের অযোগ্যতার কারণে সঙ্কোচ প্রকাশ করি; কিন্তু ইতিহাসের প্রতি অন্যরকম আকর্ষণ থাকায় আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হই। তা ছাড়া শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ যে প্রশংসাবাণী লিখে দিয়েছেন, তাতেও বক্ষ্যমাণ বইটির প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে যায়।

'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'র প্রথম খণ্ডের অর্ধেক অনুবাদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। এ অংশের বিষয়বস্তু সিরাতুন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, যা আমাদের জন্য আদর্শ, এটা কারই-বা ভালো না লাগবে! অনুবাদ করতে গিয়ে যত অগ্রসর হই, তথ্য ও তত্ত্ব সবদিক থেকেই আমি ঋদ্ধ হতে থাকি। মূলপাঠ ও টীকায় লেখক সূত্রগ্রন্থ হিসেবে মৌলিক কিতাবাদির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রতিটি বিষয় তিনি অত্যন্ত সাবলীল, প্রাঞ্জল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। লেখকের উপস্থাপনা ও বিবরণ থেকে তার বক্তব্য- 'বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি কেবল ইতিহাস গবেষণা নয়; বরং এটি একটি দীনি দাওয়াতও' এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। কিছু বিষয় অনুবাদ করার সময় তো সত্যিই আমাকে বিস্মিত করে। কারণ, যেসব গ্রন্থ থেকে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, সে গ্রন্থগুলো (উদাহরণত সহিহ বুখারি) তো কওমি মাদরাসার ধারাবাহিক পড়াশোনায় সমাপ্তকারী আমি, আমরা সকলেই পড়েছি। কিন্তু লেখক যেভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, সেভাবে তো আগে পড়ে দেখিনি! হিজরতের ঘটনাটিই পড়ে দেখুন-না, অনেক ভুল তথ্য সংশোধন হবে আপনার।

প্রথমে মূল বইয়ের অনুবাদ করি, এরপর করি ভূমিকা। এই ইতিহাস বিশ্বকোষের রচনাকাল এবং রচনার চড়াই-উৎরায়ের গল্প পড়ে তো আমি রীতিমতো অবাক। এ যুগেও এতো পরিশ্রমী এবং এমন উঁচু হিম্মতের

অধিকারী মানুষ আছেন? লেখকের ভাষায়-'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'র কাজের সূচনা হয়েছিল ২০১১ সালের শুরুর দিকে এবং এক বছরেই তা সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এর পুনঃনিরীক্ষণ, সংশোধন, সংযুক্তি, টীকা সংযোজন, প্রুফরিডিং ইত্যাদি কাজ ২০১৭ সালের শেষ পর্যন্ত চালু থাকে।'

ইতিহাস-লেখক মাওলানা ইসমাইল রেহান তার ভূমিকায় 'ইতিহাস কী?' শিরোনামে একটি অনবদ্য কর্ম উপহার দিয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধে ইতিহাসের পরিচয়, স্তর, ইসলামি ইতিহাসবিদদের স্তর, ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনার ইতিবৃত্ত, মৌলিক ইতিহাসগ্রন্থ ও ঐতিহাসিকদের ব্যাপারে পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। ভূমিকাটি পড়লেই যেকোনো পাঠক লেখকের প্রতি বিমুগ্ধ হতে বাধ্য। লেখকের এই তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ পড়ে আমার অজানার পরিধি আরও অনেক বৃদ্ধি পায়।

এ ছিল বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমার বিমুগ্ধতার কথা। তবে অনুবাদের মান সম্পর্কে কিছু বলার সাহস আমার নেই। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। অনুবাদের মান নির্ণয় করার ভার বোদ্ধা পাঠকের কাঁধে অর্পণ করলাম।

'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' বাংলা রূপান্তর প্রকাশের এই শুভমুহূর্তে স্মরণ করছি এবং শোকর আদায় করছি, আমার অনুবাদকর্মের পুরোটা সময়, প্রতিটি মুহূর্তে যার অবদান রয়েছে। ত্যাগ-আত্মত্যাগে সে আমাকে বরাবরই মোহিত করছে। অনুবাদ-নিমগ্নতার সময় সে আত্মবিসর্জনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। সে হলো প্রিয়তমা উম্মে নাসিবা। ঘরকন্না গোছানো এবং সন্তানপ্রতিপালনের বহু ঝক্কিঝামেলার মাঝেও প্রতিনিয়ত আমার কাজে খোঁজখবর নেওয়া, সাহস দেওয়া, এমনকি প্রকাশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমি তার মধ্যে যে বেচাইনি ও ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমাকে সত্যিই আপ্লুত করেছে। তাই এ মুহূর্তে আমি তার আন্তরিক শোকর আদায় করছি। দোয়া করি, আল্লাহ তাকে সিহহত-আফিয়াতের নেয়ামত দান করুন। আমৃত্যু তাকে সতী-সাধ্বি ও পুণ্যবতী স্ত্রী হয়ে থাকার তাওফিক দিন। তার সকল নেক-আমল কবুল করুন। হায়াতে তাইয়িবা দান করুন। আমিন।

পরিশেষে বইয়ের লেখক, প্রকাশক, অনুবাদক এবং বইপ্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তায়ালা তার শান মোতাবেক উত্তম জাযা দিন। সদকা জারিয়া হিসেবে একে কবুল করুন। আমিন।

নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী
২৫ জুমাদাল আখেরা ১৪৪২
৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
জামিয়াতুল আলমানহাল, উত্তরা, ঢাকা।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও এর লেখক প্রসঙ্গে কিছু কথা, কিছু অনুভূতি

মুসলমানরা জ্ঞানের সাধক। ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে ঈমানদার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রথম বাণী ছিল 'পড়'। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে প্রেরণই করা হয়েছে বিশ্ব মানবতার শিক্ষকরূপে। ইসলামের প্রথম দিন থেকে এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জ্ঞান ও শিক্ষা। বিশেষ করে পবিত্র কুরআন, মহান সুন্নাহ, দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছরের বৃহৎ ও বিশ্বময় গড়ে ওঠা ইসলামি মহাগ্রন্থাগারের সাথে দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম, জাতি ও সভ্যতার তুলনাই হয় না। শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অন্তত সাড়ে তের'শ বছর মুসলিমজাতি বিশ্বকে দার্শনিক ও ব্যবহারিকভাবে অতুলনীয় সফল নেতৃত্ব দিয়েছে। দুনিয়ার সকল শুভকর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন আল্লাহর তরফ থেকে অহি কিংবা ইলহামের মাধ্যমে এসেছে। একজন ব্যক্তি, বিজ্ঞানী বা মনীষীর অন্তরে ও ভাবনায় 'ইলকা' করেও কল্যাণকর বহু কিছু মানবজাতির জন্য আল্লাহ দান করেছেন। অতীতের এসব জ্ঞান মহান আল্লাহর নামে পড়তে বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন কলমের মাধ্যমে। আজও পর্যন্ত দুনিয়ার সব দার্শনিক ও বাস্তবিক জ্ঞান এবং বর্তমানে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়জয়কার এসবের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পথপ্রদর্শক, অগ্রপথিক হলেন ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিগণ। ইসলাম ছাড়াও মুসলিম শাসকরা সারাবিশ্বের সব অঞ্চলের বিলুপ্তির শিকার জ্ঞান, শিক্ষা ও ভাব সম্পদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জিইয়ে রেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক-দেড়'শ বছর কিংবা আরও বড় ফ্রেমে আড়াই থেকে তিন'শ বছর যাবৎ মুসলিমজাতি বিশ্বের সকল বিদ্বেষী ও শত্রুর দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত। শত্রুর চতুর্মুখী ও সম্মিলিত এমন আক্রমণে, আল্লাহ তায়ালার কুরআন ও দীন হেফাজতের ওয়াদা থাকায় এবং দীনের বাতিকে পূর্ণতা দানের চ্যালেঞ্জ থাকায় কেবল ইসলামই নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে

সক্ষম হয়েছে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম, দর্শন বা মতবাদ নিঃসন্দেহে নির্মূল হয়ে যেত। ইসলাম শত্রুর ষড়যন্ত্র ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে বটে; তবে এক সেকেন্ডের জন্যও থমকে দাঁড়ায়নি। ইসলাম ও মুসলিমজাতি আল্লাহর চিরন্তন ও শেষবিধানের বাহক। অতএব, এটি ধ্বংস করা যাবে না। কবি ইকবালের ভাষায় মুসলমান পৃথিবীতে সূর্যের মতো বিচরণ করছে। কোথাও ডুবে যায়, কোথাও উদিত হয়।

আধুনিক সময়ের প্রতিযোগিতায় মুসলিমদের দুঃসময়ে তারা হয়তো খানিকটা পিছিয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু তারাই মূল পাইওনিয়ার। তারাই পথিকৃৎ। সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের পাদপ্রদীপের আলোয় এখন থেকে আবার ইনশাআল্লাহ মুসলিমদেরই দেখা যাবে। কারণ, মানবতার জন্য কোনো ঐশীবার্তা বহন করে না এমন প্রাণহীন, পয়গামহীন, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতাহীন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-অজানা লোকেদের হাতে বিশ্ব-নেতৃত্ব বেশি দিন থাকতে পারে না। আল্লাহর ফজলে এমন একটি জ্বলন্ত জাগরণ একবিংশ শতাব্দীজুড়েই ধীরে ধীরে মানুষের ভাবনার, দৃষ্টির ও অভিজ্ঞতার দিগন্তে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দুনিয়াতে মানুষের এই দীর্ঘ সফর তখনই শিক্ষণীয় ও উপকারী সাব্যস্ত হয় যখন মানুষ অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়। যুগযুগান্তরে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে অভিজ্ঞতা লাভের আর তার আলোকে আগামীর পথ নিখুঁতভাবে পরিক্রমার সুযোগের মাধ্যম বিদ্যাটির নাম ইতিহাস। যে-জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তার হাজারও শ্রেষ্ঠত্বের অংশ হিসাবে ইতিহাসেরও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। ঐতিহাসিক যুগ বা এর উপরদিকে প্রাগৈতাহিসক কিছু ধারণা বা আন্দাজের যুগ ছাড়া আধুনিক মানুষের ইতিহাস জানার কুরআন ছাড়া কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় নেই। মুসলিমজাতিও কুরআন ও সুন্নাহর অতুলনীয় এবং অকল্পনীয় সুরক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, ইতিহাস কাকে বলে। লাখো মনীষী, জীবনী, বাণী ও জ্ঞানের মশাল ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে মুসলিমজাতিই দেখিয়ে দিয়েছে ইতিহাস কীভাবে রচনা ও সংরক্ষণ করতে হয়। শুধু ইতিহাস নয়, গোটা সমাজবিজ্ঞানেরই জনক মুসলমান। অনেকে ভাবতেন যে, আলেমগণের ইতিহাসজ্ঞান সীমিত। এর কারণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নিজেদের দীন-ধর্ম ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামসাধনায় নিমগ্ন আলেমগণ

আলাদাভাবে ইতিহাস-সহ অন্যান্য বিশেষ বিদ্যায় ব্যাপকভাবে নিজেদের ব্যাপৃত করতে পারেননি। যে-জন্য নব্য শিক্ষিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চর্চা, অনুশীলন ও উপস্থাপনার সামনে মুসলিমরা একমুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল মাত্র। কিন্তু তাজদিদি মেজাজের অগ্রপথিক আলেমদের সাধনা ও অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা আবার শুধু ঘুরে দাঁড়ায়নি; বরং প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সেই অন্ধকার সময় কেটে গেছে। মুসলমানের চরম দুর্দিন আর নেই। বড়দের জ্ঞানচর্চা ও কলমের ব্যবহার এত ঝড় তুফানের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য থেমে থাকেনি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস একটি নজিরবিহীন সৃষ্টি। মাওলানা ইসমাইল রেহান উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন দেওবন্দ অনুসারী আলেম। শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুমের ভাবশিষ্য ও অনুসারী। গবেষণা ও উপস্থাপনা শিখেছেন বিশেষভাবে আল্লামা আবদুর রশিদ নোমানি রহ. এর কাছে। এরপর সাথে ছিল তার ব্যক্তিগত উড্ডয়নস্পৃহা। মাওলানা ইসমাইল রেহানের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা যে 'আগুনে পাখা' দিয়ে রেখেছিলেন, প্রাণের টানে তিনি তা মুক্ত-আকাশে প্রবল উচ্ছ্বাসে ঝাপটে গেছেন বছরের পর বছর, অসংখ্য সাধারণের ভিড়ে বিশিষ্টজনেরা যেমন হয়। শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানির ইসলাহি মজলিসগুলো ছিল তার রত্নভাণ্ডার। নতুন নতুন হিরের খনি খুঁজে পাওয়ার দিশা। আর শায়েখ আবদুর রশিদ নোমানি রহ. এর গবেষণার মেজাজ থেকে মাওলানা ইসমাইল রেহান শিখতে পেরেছেন ডায়মন্ড কাটার বিদ্যা, যা খনির হাজার টাকার ডায়মন্ডকে দক্ষ কাটারের মুনশিয়ানার কল্যাণে পরিণত করে হাজার কোটি টাকার হিরকখণ্ডে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস একটি বড় প্রজেক্ট। মূল প্রকাশক থেকে বিজ্ঞ লেখকের বৈধ অনুমতি লাভ করে বাংলাদেশে এ গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রশংসনীয় ও দুঃসাহসী উদ্যোগ নিয়ে মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, বাংলাবাজার, ঢাকা, শুধু বাংলাদেশের মানুষের নয়, বিশ্ব বাংলাভাষী অন্তত ৩০ কোটি মানুষের কৃতজ্ঞতার হকদার হয়েছেন। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় প্রতিটি পাঠক, আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী, গবেষক, জ্ঞানপিপাসু মানুষজাতি, ধর্ম,

লিঙ্গ, বর্ণ, দল, মত ও ভাবনা নির্বিশেষ এই বিশ্বকোষপ্রমাণ বিশাল গ্রন্থটির মাধ্যমে নিজেকে আরও শিক্ষিত, উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারবেন। ইতিহাস, রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের একজন নগণ্য তালিবে ইলম হিসাবে আমার জানামতে উপমহাদেশে এমনকি মুসলিমবিশ্বেও এত তন্ন তন্ন করে মুসলিম উম্মাহর দেড় হাজার বছরের জার্নিটি আর কেউ বর্ণনা করেননি। অতীতের হাজারও মনীষীর জ্ঞানচর্চা, অনুশীলন, মানসিক শ্রম ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অবলম্বন করেই ভাষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দীনি ইলমে উচ্চশিক্ষিত এবং জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন মাওলানা ইসমাইল রেহান তার অসাধারণ এই সৃজনটি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। তবে, তার সংগ্রহ, সংকলন, উপস্থাপন আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আবেগ তার এই মহান কাজকে অনন্য ও জীবন্ত করে দিয়েছে। সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমি অভাজন সংশ্লিষ্ট সবার জন্য সবধরনের কল্যাণের দোয়া করার পাশাপাশি এই আরজটুকুও করতে চাই, তিনি যেন প্রিয় মাওলানার অনন্য ও জীবন্ত এ কাজটি অমরত্বও দান করেন। দীন, দুনিয়া, আখেরাতে এটি হোক তার এবং তার মুহিব ও মুহসিনদের জন্য চূড়ান্ত কামিয়াবির মাধ্যম।

উবায়দুর রহমান খান নদভী
ঢাকা, বাংলাদেশ
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

মাওলানা ইসমাইল রেহান : জীবন ও পরিচিতি

সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ, উম্মাহর দরদ-ব্যথা অন্তরে প্রবলভাবে লালনকারী, বিজয়ের শতাব্দীতে উম্মাহর সন্তানদের পুরোনো সেই সোনালি দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যিনি জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন, নিজের কাজের মূল্যায়নে বাংলাদেশি এক মনীষীর সামান্য ক'লাইনের মন্তব্য পেতে নিজেকে যিনি মুহূর্তেই একজন সাধারণ তালিবে ইলমের পর্যায়ে নিয়ে আসেন, সেই অসম্ভব বিনয়ী মানুষটির জীবন নিয়ে আজ সামান্য ক'টি কথা লিখব।

হাফেজ মাওলানা ইসমাইল জন্মেছেন পাকিস্তানের করাচি শহরে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক তার পশ্চিম পাঞ্জাবে। রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেলে আটক জেলা। এই জেলাতে অবস্থিত বিখ্যাত কিছু ঐতিহাসিক স্থান। মোগল দরবারের দুজন বিখ্যাত হেকিম ভাইয়ের মাকবারাও এখানে অবস্থিত। এটি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা। এখানেই হাসান আবদাল এলাকায় খালিকদার গ্রামে তাঁর স্থায়ী নিবাস। পূর্বপুরুষরা এখানেই জীবন কাটিয়েছেন। বাবার কর্মস্থলের সুবাদে মাওলানার পরিবার একসময় করাচিতে এসে পড়ে। ফলে তার জন্মস্থান হয়ে পড়ে করাচি। তারিখের হিসেবে পহেলা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের সুপুত্র হিসেবে তার প্রাথমিক নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইসমাইল। লেখালেখির সময় পুরো নাম মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান ব্যবহার করেন। করাচির পুরোনো গোলিমার এলাকায় তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। হিজরতের পর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে লাখো মুহাজির এই এলাকায় এসে বসতি গড়েন। তখন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল এই এলাকাটি। প্রায় সকল এথনিক মাইনরিটি (ছোট বড় গোত্র ও উপজাতি) এই এলাকায় কালিমার পরিচয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। বসবাস করতেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে।

পারিবারিকভাবে একটি সাধারণ দীনি পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন। মায়ের কাছে দীনিয়াত বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয় স্কুলে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ ইসমাইল বিজ্ঞানবিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর হঠাৎ জীবনে একটি আচমকা মোড়

এসে যায়। সাধারণ শিক্ষা থেকে দীনি শিক্ষায় ধাবিত হন। ভর্তি হন দারুল উলুম কোরঙ্গি করাচিতে। শুরু করেন একদম প্রথম থেকে। কালামে পাকের হিফজ দিয়ে! কৈশোরের শেষপ্রান্তে এসে হিফজের চ্যালেঞ্জ এতটাও সহজ ছিল না। এই নেয়ামত তিনি তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন। এই সময়ে নিয়মিত শায়খুল ইসলামের ইসলাহি মজলিসগুলোতে বসতেন। ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তিনি শায়খুল ইসলামের দ্বারাই হয়েছেন। শায়েখের মজলিসে শোনা ইসলামের হারানো ঐতিহ্য ও অতীতের গল্পগুলো তাকে মুগ্ধ করত। স্বপ্ন দেখতেন একদিন বড় হয়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে শায়খুল ইসলামের মতো গবেষণা করবেন। মুসলিম উম্মাহকে জানাবেন কত সমৃদ্ধ ছিল আমাদের অতীত। আর কত উজ্জ্বল আমাদের ভবিষ্যৎ।

হিফজুল কুরআনের পর বিলম্ব না করে প্রচলিত ধারার স্থানীয় দরসে নিজামিতে ভর্তি হয়ে যান। বাহাদুরাবাদ এলাকায় অবস্থিত জামেয়া মা'হাদুল খলিল আল-ইসলামি থেকে ধারাবাহিক পড়াশোনার মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে তাকমিল সমাপন করেন। পরবর্তীতে অবশ্য পুনরায় ২০০১ সালে বেফাকুল মাদারিসে তাকমিল পরীক্ষায় অংশ নেন। অর্থাৎ দু'বার তাকমিল সমাপন করেন তিনি। এর মাঝে সময়ের বিখ্যাত মুহাক্কিক গবেষক আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানির শিষ্যত্ব অর্জনেরও সৌভাগ্য হয় তার। গবেষণার নানামুখী শিল্প ও কৌশল তিনি এই সময় রপ্ত করেন। এরই মাঝে সাধারণ শিক্ষা ও এই ক্ষেত্রে কিছু সনদের জন্য নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০০৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মেজর নিয়ে বি.এ (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একটি প্রাইভেট প্রোগ্রাম ছিল সেটি। এই সময়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণামূলক থিসিস লেখেন তিনি। পড়াশোনার ধারা এরপরেও অব্যাহত থাকে। ২০১০ সালে করাচির উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় (FUUAST) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেফাক থেকে তাকমিলের পরপরই কর্মজীবনে পা রাখেন তরুণ মাওলানা। দীর্ঘ দুই দশক ধরে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছেন। আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক স্তরের বিষয় নাহব-সরফ থেকে শুরু করে দাওরায়ে হাদিস বিভাগে মুসলিম শরিফ পর্যন্ত পাঠদান করেছেন। এর মাঝে একাধারে পাঠদান করেছেন ফারসি সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, তাফসির, মিশকাত শরিফ, আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, ইবনে মাজাহ এবং মুসলিম শরিফ। পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ কোর্সও নিয়েছেন দীর্ঘদিন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ নিয়ে কিছুদিন প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান করেছেন। করাচির বিখ্যাত জামেয়াতুর

রশিদেও ইতিহাস বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। গবেষণায় ব্যস্ত থাকলেও এখনো পাঠদানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মাশা আল্লাহ।

লেখালেখিটা বলা যায় তাকমিলের কিছুকাল পূর্ব থেকেই শুরু করেছিলেন। শুরুতে কলাম, প্রবন্ধ ও ইতিহাস নিয়ে ছোটগল্প লিখতেন। এরপর ধীরে ধীরে ইতিহাসের গলিপথে ও ইসলামি ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল মোহনায় শুরু করেন আনুষ্ঠানিক এবং অনুসন্ধানী প্রবেশ। সুদীর্ঘকাল ধরে ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাবিদদের ইসলামপ্রশ্নে শত শত বরং হাজার হাজার অপপ্রচারমূলক সুচিন্তিত মিথ্যাচার, প্রচলিত সমাজে লোকমুখে জন্ম নেওয়া অসংখ্য ঐতিহাসিক অসত্য আর অজ্ঞানতাকে আলোয় নিয়ে আসতে দিনরাত আর বছরকে একাকার করে ফেলেন। এক একটি গবেষণায় ব্যয় করেন বছরের পর বছর। শুধু খাওয়ারিজম শাহের ইতিহাস নিয়েই কাজ করেছেন সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগ। সুলতান আইয়ুবিকে নিয়েও যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বাধিক পরিমাণ লিখেছেন তিনি। প্রায় হাজার পৃষ্ঠা। এটি যেকোনো ভাষায় সুলতানকে নিয়ে করা সবচেয়ে বিস্তারিত কাজ। আফগানিস্তানের ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন হাজার পৃষ্ঠার বেশি। যে বিষয়ে হাত দিয়েছেন, বিশুদ্ধতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে ইতিহাসের সুনিপুণ ছবি এঁকে প্রতিটি পরতের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন উম্মাহর সামনে। সমসাময়িক বেশ কিছু ইতিহাসবিদ শিক্ষণীয় আঙ্গিকে ইতিহাস তুলে ধরলেও এই মাওলানার কলব ও কলম দুটোই তার আবেগকে পাঠকের হৃদয় একদম ছুঁয়ে দিয়েছে। বিস্তৃত অধ্যয়নকারী পাঠকমাত্রই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। বিগত প্রায় এক দশক ধরে তিনি কাজ করে চলেছেন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস নিয়ে। শুরুতে তার পরিকল্পনা ছিল ছয় খণ্ডে সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞটি সম্পাদন করবেন। কিন্তু সর্বশেষ অবস্থা কী দাঁড়াবে তা এখনোই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সর্বশেষ ভাবনা অনুযায়ী এই সিরিজটি সাত খণ্ডেও পৌঁছতে পারে। এই সিরিজের পরিচয় ও তার বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যে বঙ্গীয় সমাজে আলোচিত হয়েছে। আমি নতুন করে শুধু একটি কথাই বলব, উম্মাহর ইতিহাসকে বিশুদ্ধতা ও ইনসাফের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এই দেওবন্দি মাওলানা। বারাকাল্লাহু ফীহ!

সাংবাদিকতাতেও তাঁর কমবেশি ঝোঁক ছিল। সেই জায়গা থেকে বেশ কিছু মাসিক ও পাক্ষিকে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মাসিক সুলুক ও ইহসান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। শিশুদের জন্য প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শিশুদের ইসলাম'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ আট

বছর। নারীবিষয়ক সাপ্তাহিকী 'খাওয়াতুনে ইসলামে'র সম্পাদনা করেছেন তিন বছর। ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক 'ইসলাম'-এ ধারাবাহিক কলাম লিখছেন দীর্ঘ দুই দশক। তবে কলাম লিখে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছেন 'যরবে মুমিন' পত্রিকায়। প্রায় ২১ বছর ধরে নিয়মিত কলাম লিখে আসছেন তিনি। বেশকিছু গ্রন্থ এই ধারাবাহিক কলাম থেকেই আলোয় এসেছে। যেমন, তারিখে আফগানিস্তান (এটি খুব শীঘ্রই কালান্তর প্রকাশনী থেকে আসবে), জালালাদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ্ আওর তাতারি ইয়ালগার (সম্প্রতি নাশাত থেকে প্রকাশিত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থেরই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)।

বর্তমানে কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে ব্যস্ত সময় পার করছেন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ এই ইতিহাসগবেষক। প্রথমত তারিখের প্রকল্পটি শেষ করার জন্য দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নিজ এলাকা হাসান আবদালে উলুমুল কুরআন নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মূলত তার কিছু আত্মীয়ের উদ্যোগে দশ বছর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। সেই সময় মাওলানা করাচিতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াত তাকে সমুদ্র তীর থেকে নিজ এলাকার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে আসে। করাচির মতো মেট্রোপলিটন শহর ছেড়ে তিনি কুরআনে কারিমের আওয়াজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দিতে একদম গাঁও-গ্রামে এসে পড়েন। আটক জেলার একটি বিখ্যাত জায়গা এই তাহসিল হাসান আবদাল। ইসলামপূর্ব ইতিহাস থেকে শুরু করে মোগল আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী এই অঞ্চল। মাওলানার বর্তমান অবস্থান আপাতত এখানেই। দিনরাত গবেষণায় মগ্ন থেকে কাজ করেন আর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি দেখভাল করেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি শায়খুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। এ ছাড়াও সময়ের অন্যান্য আলেমের বিশেষত দেওবন্দিধারার আলেমদের তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করে থাকেন। তার শিক্ষকদের অধিকাংশই দেওবন্দি চেতনার মশালবাহী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল দলমতকে তিনি সবিশেষ সম্মান করে থাকেন। কোনো রাজনৈতিক দল বা মতের সাথে যুক্ত ছিলেন না কখনো। নিভৃতভাবে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। তবে দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে বিশেষ সখ্য আছে তার। জীবনের মোর ঘুরে যাওয়ার পেছনেও এই মেহনতের শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। সুযোগ ও অবসর পেলে এখনো দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে সময় ব্যয় করার চেষ্টা করেন মাওলানা।

মূলত ইতিহাসগবেষণায় প্রসিদ্ধি পেলেও তিনি শিশুদের নিয়েও কিছু কাজ করেছেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে শিশুতোষ সাহিত্যের বিকল্প নেই। এই চিরায়ত সত্যটি তিনি কর্মজীবনের শুরুতেই অনুধাবন করেছিলেন। ফলে এখনো শিশুদের পাঠদান করেন। বিশ্বমানের গবেষণার পাশাপাশি শিশুদের নিয়মিত পাঠদান ও তাদের চিরায়ত পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব নিয়েও গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করেন তিনি। শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি শিশুদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি। এর মাঝে 'আস্তিনের সাপ' বেশ সুখপাঠ্য। বর্তমানেও 'এসো বাচ্চারা ইসলামকে জানি' নামে একটি সিরিজ নিয়ে কাজ করছেন। 'এসো বাচ্চারা গল্প শোনো!' নামেও একটি সিরিজ তিনি নির্মাণ করছেন। এ ছাড়াও তার কলামসমগ্র ছেপে এসেছে 'বরাহেরাস্ত' শিরোনামে।

৫০ বছর বয়সি এই মাওলানা নিজেকে উম্মাহর আগামী দিনের পথচলার আয়না তৈরিতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস ও ইতিহাস থেকে নেওয়া উপযুক্ত শিক্ষাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী মনোভাবে তুলে ধরেন যে, সচেতন ও সামান্য দীনি চেতনাদীপ্ত পাঠকের হৃদয়কেও তা ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। তাই তো জনাবের কলাম নিয়মিত উম্মাহর সিংহ শার্দূলরা তাদের মাসিক পত্রিকায় ছেপে থাকেন। উম্মাহর জন্য তার এই 'মুখলিসানা আন্দাজ' সকলকেই আকৃষ্ট করে। তার রচিত তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ প্রকাশিত হবার পর শায়খুল ইসলামের সাথে ফোনালাপেও তাঁর অসাধারণ বিনয় ও অপূর্ব নম্রতা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। মাওলানাসহ যারা নিশিদিন একাকার করে উম্মাহর হারানো গৌরব ও ইতিহাস সময়ের চাহিদানুযায়ী উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, সকলের জন্য আন্তরিক দুয়া করতে ভুলবেন না যেন!

ওয়াস সালাম।
যুবাঈর আহমাদ

মুখবন্ধ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد-

বর্ণনানির্ভর ইলমের মধ্যে ইতিহাস এমন এক বিষয়, যার প্রয়োজন যেমন একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তার উপর পুরোপরি নির্ভর করার সম্ভাবনাও কম; দুই কারণে। এক তো হলো- ইতিহাস সংক্রান্ত বর্ণনার সনদ ও সূত্র সাধারণত সেই দৃঢ়তা ও শক্তিমুক্ত হয়, যা পাওয়া যায় হাদিসের রেওয়ায়েতে। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের বর্ণনায় ইতিহাসবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য ঢালাওভাবে ইতিহাসের উপর পূর্ণ নির্ভর করা এবং তাকে প্রামাণ্য ভাবা চিন্তাগত বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়। তাই ইতিহাসের শিক্ষার্থীর ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে কমপক্ষে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

এক. ইতিহাসপাঠের পূর্বে ইতিহাসের প্রাথমিক বিষয়াদি তার সামনে থাকা দরকার, যেগুলোতে মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত চিন্তা-চেতনা এবং বুনিয়াদি মতাদর্শের বিবরণ রয়েছে। এগুলোকে ইতিহাসপাঠের 'মূলনীতি এবং জরুরি আদব' নামেও অভিহিত করতে পারেন।

দুই. ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সূত্রের ইতিহাস, ন্যায়নিষ্ঠ এবং মধ্যপন্থি স্বভাব এবং অসতর্ক ইতিহাসবিৎদের ব্যাপারেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তিন. প্রখ্যাত ইতিহাসবিৎদের প্রসিদ্ধ সূত্রগ্রন্থেও কখনো প্রাসঙ্গিকভাবে অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত এসে পড়ে। তাই ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থের ভালো-মন্দ নির্ণয় করার মানদণ্ড সম্পর্কেও জানা থাকা জরুরি।

ইতিহাসপাঠের এসব লক্ষণীয় ও বুনিয়াদি বিষয় ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা এতৎসংশ্লিষ্ট বইপত্রে খুব কমই একইসঙ্গে এবং সুবিন্যস্তভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বড় দয়া যে, বিজ্ঞ আলেমে দীন থেকে কোনো জমানাই শূন্য থাকেনি। আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ যে,

'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' নামে একটি সংকলন আমাদের হাতে এসে গেছে, যাতে উপর্যুক্ত তিনটি বুনিয়াদি বিষয়ই পাওয়া যায়।

উপরন্তু (আমার দেখামতে) এই সংকলন রেওয়ায়েত সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা, চিন্তাভাবনায় ভারসাম্য, সুন্দর বিন্যাস এবং চমৎকার বর্ণনার দিক থেকে একটি অনন্য ও মানসম্মত কর্ম। ইনশাআল্লাহ সর্বস্তরের পাঠকের জন্য তা উপকারী সাব্যস্ত হবে আশাকরি।

আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করছি—তিনি যেন এই কর্মটি কবুল করে নেন এবং তাকে সমাদৃত করেন। আর আল্লাহর নিকট তা কঠিন নয় (ওয়ামা যালিকা আলালল্লা-হি বিআযীয)।

ওয়াসসালাম

(ডক্টর মাওলানা) আবদুর রাযযাক সিকান্দার
মুহতামিম, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া,
আল্লামা বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান

ডক্টর মাওলানা মনযুর আহমাদ মেঙ্গল হাফিজাহুল্লাহর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله لوليه، والصلاة على نبيه، أما بعد-

নিঃসন্দেহে আজ মুসলিম উম্মাহ বহিঃআক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে এক ভয়াবহ সময় অতিবাহিত করছে। আগামী দিনে মুক্তি ও উত্তরণের পথ থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ শেখা, শেখানো এবং সেই অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা। পূর্বসূরিদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে, যা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং দুরোরোগ্য আত্মিক ব্যাধি থেকে কোনো অংশে কম নয়।

এ ছাড়া হাতেগোনা কিছু মানুষ ইতিহাসের প্রতি সামান্য আগ্রহ রাখেন; দেখা যায় তাদেরকেও এমন কিছু গ্রন্থের ভেতর থেকে ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করতে হয়, যা পড়লে তাদের মনে পূর্বসূরিদের ব্যাপারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। এসব নামসর্বস্ব ইসলামি ইতিহাসগ্রন্থ ইসলামের ব্যাপারে পাঠকের আপত্তি ও অভিযোগ দূর করার পরিবর্তে তাদের মনে আরও বেশি সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করে; ইসলামকে হেফাজত করার পরিবর্তে ইসলামের দুর্গে আরও জোরালোভাবে আঘাত হানে। বরং এর চেয়ে বড় কথা হলো, নাউজুবিল্লাহ, ইসলামি ইতিহাসে তারা এমন মনগড়া ইসরাইলি রেওয়ায়েত প্রবিষ্ট করতে থাকে, যা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এসব রেওয়ায়েতের আক্রমণ থেকে নবী-রাসুলদের মতো মাসুম ও নিষ্পাপ ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি।

তাই ইসলামি ইতিহাস পড়া ও জানারও সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। কারণ, আমরা জানি মুসলিম উম্মাহর উপর কীরূপ দুর্দশা চলছে। বহিঃআক্রমণ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক দুর্বলতা, পারস্পরিক অনৈক্য, ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত এবং দোসরদের কর্মতৎপরতা বন্ধ

এবং এগুলোর ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা কী? আমাদের পূর্বসূরিগণ এমন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? এসব বিষয় আমরা কেবল ইসলামি ইতিহাস থেকেই জানতে পারি। তবে এর জন্য শর্ত হলো ইতিহাস বিশুদ্ধ এবং দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি মুক্ত হওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি না হওয়া।

আর এর জন্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (মুদ্দাযিল্লুহু)—জামিয়াতুর রশিদ, করাচির ইসলামি ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষণাধর্মী একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা— মাশাআল্লাহ যথেষ্ট পরিশ্রম করে আমার এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের আকুতিপূরণকারী একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা মাওলানা ইসমাইল সাহেবের এই মহান কর্মযজ্ঞকে কবুল করুন, একে নাজাত ও সাফল্যের উসিলা বানিয়ে দিন, এবং পাঠকদের জন্য ব্যাপক উপকারী গ্রন্থ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

মনযুর আহমাদ মেঙ্গল

'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'র জন্য
হজরত আসার জৈনপুরীর
কাব্যবাণী

باب جہد و عزم واستقلال جب وا ہو گیا
مہرباں اک بندۂ مخلص پہ مولی ہو گیا
যখন চেষ্টা, শ্রম ও ধৈর্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে
তখন আল্লাহ তার এক একনিষ্ঠ বান্দার উপর
আপন দয়া ও করুণার দ্বার অবারিত করে দিয়েছেন।

اک مورخ پھر کمر بستہ ہوا جی جان سے
کاوشیں برسوں کی آخر رنگ لائیں شان سے
একজন ঐতিহাসিক পুনরায় জানবাজি রেখে
কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে গেছেন
অবশেষে দীর্ঘদিনের শ্রম-ঘাম ও প্রচেষ্টা যেন
পূর্ণ সফলতার সাথে আলোর মুখ দেখেছে।

امت سرکار ﷺ کو انمول تحفہ دے گیا
وہ جواں ایسا ضعیفوں سے جو بازی لے گیا
তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে একটি অমূল্য তোহফা দিয়েছেন
আসলেই তিনি একজন সফল যুবক,
এতো দুর্বল উম্মতের ভেতর থেকেও
যিনি বিজয়মাল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন।

رہ گئے حیران خود قرطاس و خامہ کیا کہوں
پا گیا انجام ایسا کارنامہ کیا کہوں
তার এমন অসামান্য অবদানে
কলম-কাগজও যেন থমকে গেছে
এমন অভাবনীয় সাফল্যের পর
তার অবদানের কথা কী আর বলব!

فکر کی پرواز پہنچی رفعت مریخ پر
جب قلم اس نے اٹھایا طائر تاریخ
তার চিন্তা ও গবেষণার বিচরণ পৌঁছে গেছে
মঙ্গলগ্রহের উচ্চতায়
যখন তিনি কলমের আল্পনায় চড়েছেন
ইতিহাসের ভগ্ন ডানায়।

ہار کر ہتھیار ڈالے خار قال و قیل نے
یوں بکھیرے علم کے ریحان اسماعیل نے
ইতিহাস নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ও আপত্তির
প্রশ্নবাণ আজ অস্ত্র ফেলে হার মেনেছে
ইসমাইল রেহান যখন জ্ঞানের মুক্তামালা
দু'হাত ভরে বিলিয়েছেন।

شہر یادِ رفتگاں ایسا سجا کر رکھ دیا
آئینہ پیشِ مسلماں گویا لا کر رکھ دیا
পূর্বসূরিদের স্মৃতিচিহ্ন তিনি এতো
নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন
যেন মুসলিম উম্মাহর সামনে ইতিহাসের
স্বচ্ছ একটি আয়না রেখে দিয়েছেন!
عکس اپنا جس میں سارے اہل ایماں دیکھ لیں
کس طرح سے مشکلیں ہوتی ہیں آساں دیکھ لیں
সব মুসলমান এতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিয়েছেন
কঠিন কাজ কতো সহজে হতে পারে তাও দেখেছেন।
কীভাবে কষ্ট সয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী
দীনের ঝান্ডা কীভাবে উড্ডীন করেছেন প্রিয় হাবীব সা.।
کس طرح جھیلی مشقت سیدِ ابرار ﷺ نے
پرچم دیں کیسے لہرایا مرے سرکار ﷺ نے
কোন সে আঁধারে আলোকিত হয়েছে হেদায়েতের প্রদীপ
কীভাবে তাজা রক্ত দিয়ে দীনের বাগান
সিক্ত করেছেন সাহাবিগণ।
کس اندھیرے میں ہوئے روشن ہدایت کے چراغ
کس طرح سینچا صحابہ نے لہو سے دیں کا باغ
একদিকে সুরাইয়া তারার উচ্চতায় অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য
অন্যদিকে নরকের প্রাণবিনাশক কণ্টকাকীর্ণ পথ।

اک طرف تحت الثری کا خارزار جاں گسل
اک طرف اوجِ ثریا کا نظارہ پر حلل
একদিকে তাকওয়া ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে
সাড়া দিয়ে নিজকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা
অন্যদিকে স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের লালসা।
ایک طرف ایثار، تقویٰ اور اخوت بے مثال
دوسری جانب تعصب، حرصِ مسند، حب مال
প্রথম স্তরের মানুষ ইহকালে-পরকালে
নেয়ামতের অংশীদার দ্বিতীয় স্তরের মানুষ
ঠিকানা ও আশ্রয়হীন।
হে প্রভু, অধম আসার-এর রোনাজারিকে
আপনি আশায় বদলে দিন
اے خدا آہِ اثر پر کھول دے باب اثر
جیتے جی تعبیر پائے جلد ہی خواب اثر
আমার স্বপ্ন ও আশা আপনি জীবিত থাকাকালেই
বাস্তবে রূপ দিয়ে দিন।
আবারও আমাদের মাঝে
پھر سے دکھلا عہد زریں شوکتِ اسلام کا
پھر سے نقارہ بجے دنیا میں تیرے نام کا
ইসলামের সোনালি যুগ ফিরিয়ে দিন
যেন পৃথিবীর বুকে আবারও বেজে ওঠে
আপনার নামের ডঙ্কা।
ওহে প্রভু, আপনি ইসমাইল রেহানের
চেষ্টা ও মেহনত কবুল করুন
کاوش اسماعیل ریحاں کی خدا مقبول کر
غنچۂ اخلاص کو خلدِ بریں کا پھول کر
নিষ্ঠার প্রস্ফুটিত মুকুলকে
চির উন্নত রঙিন পাপড়ির রূপ দিয়ে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি

বইয়ের নাম : মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

রচনা : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
অধ্যাপক, ইসলামি ইতিহাস, জামিয়াতুর রশিদ, করাচি

প্রকাশক : আলমানহাল, ব্লক এ-১ গুলিস্তানে জাওহার,
ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

বর্তমান সময়ে কেউ যখন জিজ্ঞেস করে যে, উর্দুভাষায় মুসলমানদের ইতিহাসবিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কোনটি তখন জবাব দিতে গিয়ে খুব চিন্তায় পড়তে হয়। এটা এজন্য নয় যে, ইতিহাসবিষয়ে কোনো গ্রন্থই নেই। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইতিহাসের রেওয়ায়েতের সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য বের করে আনার জন্য অনেক ধৈর্য ও মেহনতের প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থগুলো সত্যিই অনেক দুর্বল। মাওলানা মুঈনুদ্দীন নদবী রহ. এর কিতাবটি অবশ্যই মূল্যবান রচনা, যার ফলে বর্তমান বাজারে প্রচলিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তার দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়। অনুরূপ মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী রচিত 'তারিখে ইসলাম'ও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই রেওয়ায়েতের যথাযোগ্য এবং মানসম্মত তানকিহ ও পরিমার্জন করা হয়নি।

মূলকথা হলো, ইতিহাসকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় রূপ দেওয়া ওলামায়ে ইসলামের উপরই দায়িত্ব ছিল। এই বিষয়ে যেসব ইমাম কিতাব রচনা করেছে, তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির তাবারির কিতাব 'তারিখুল মুলুকি ওয়াল উমাম' পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় সূত্রগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ যেভাবে প্রথম ধাপে তাদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যে, যত সনদে হাদিস তাদের নিকট

পৌঁছেছে, সকল রেওয়ায়েত সংকলন করা। এরপর জরাহ-তাদিল এবং হাদিসের মান যাচাই-বাছাইকারী ইমামগণ এসে ঐসব সনদের রেওয়ায়েত ও দেরায়েত (উসুলি ও যৌক্তিকভাবে) অনুসন্ধান করে এটি নিশ্চিত করেছেন যে, এগুলোর মধ্যে কোনটি উসুলি ও যৌক্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য, আর কোনটা অগ্রহণযোগ্য, পরিত্যাজ্য। এভাবে ইলমে হাদিস পরিপূর্ণ তাহকিক ও গবেষণার সাথে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সনদের ব্যাপারে হাদিসের ইমামদের বক্তব্য আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে খুব সহজেই পাওয়া যাবে।

ইতিহাসশাস্ত্রেও এই কাজ হয়েছে। কিছু হাফেজ ইবনে কাসিরের মতো কিছু ইমাম এই কাজ শুরু করেছিলেন; কিন্তু তারা একে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেননি। এর ফলে যেসব রেওয়ায়েত ইতিহাসের প্রথম সারির কিতাবসমূহে বিশেষ করে 'তারিখুত তাবারি'তে এসে গিয়েছিল, তার উপর সামগ্রিকভাবেই পরবর্তী আলেমগণ নির্ভর করে গেছেন। অথচ হাফেজ ইবনে জারির তাবারি রহ. তার দীনদারি, আমানতদারি ও স্বচ্ছতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ করে তার ইতিহাসগ্রন্থের শুরুতেই লিখে দিয়েছেন :

(فما في كتابي هذا من خبر ليستنكره قارئه أو ليستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قِبَلنا، إنما أتي من قِبَل ناقليه، وأنا إنما أدّينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا.)

আমার এই গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো পাঠকের মনে যদি সংশয় জাগে এবং তা মেনে নিতে কষ্ট হয় তা হলে তার জন্য এটা জেনে রাখা জরুরি যে, আমি উক্ত রেওয়ায়েত নিজ থেকে বানিয়ে লিপিবদ্ধ করিনি; বরং বর্ণনাকারীদের নিকট থেকেই আমি গ্রহণ করেছি। আর তাদের থেকে যেভাবে আহরণ করেছি, হুবহু পৌঁছে দিয়েছি।[১]

এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইমাম তাবারি রহ. এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, রেওয়ায়েত সংকলন করা। এর মধ্যে কোনটা সহিহ, কোনটা ভুল; এর

---

[১] তারিখুত তাবারি- ১/৭, ৮

বিবরণে যাওয়া তার রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। আর ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের ভার গবেষক আলেম ও সমালোচকদের কাঁধে সোপর্দ করেছেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, রেওয়ায়েত বিশ্লেষণের কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের ইতিহাসে এমনসব কথা খ্যাতি লাভ করেছে, যা উসুল ও যুক্তির আলোকে ভুল। বরং প্রথম তিনশতাব্দীর যে চিত্র সামনে হাজির করা হয়েছে, তা ঐ যুগের ব্যক্তিদের কীর্তির সঙ্গে কোনোভাবেই মানানসই নয়। আর এর উপর ভিত্তি করেই সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কেবল ভুল নয়; বরং ভ্রান্তিকর দর্শন ছড়িয়ে পড়েছে, যা একদিকে অতিরঞ্জন, অপরদিকে শৈথিল্য ছিল।

এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলেমগণের উপর ঋণ ছিল ইতিহাসের রেওয়ায়েতসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে এমন একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করা, গতানুগতিক কপিপেস্ট নয়; বরং গবেষণা ও অনুসন্ধানের আলোকে তারা যথাসাধ্য সহিহ রেওয়ায়েত পেশ করবেন এবং অশুদ্ধ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করবেন।

কিন্তু এই ঋণ আদায়ের জন্য কেবল অনেক মেধা ও যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়; বরং হাদিস, আসার, আসমাউর রিজালের উপর গভীর জ্ঞান, তার পাশাপাশি পূর্ণ ভারসাম্য, মধ্যপন্থার মানসিকতাসম্পন্ন, প্রত্যয়, হিম্মত এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন ছিল। এজন্য আমার বুঝে আসতো না যে, এমন গুরুদায়িত্ব কে আঞ্জাম দিতে পারবে?

কিছুদিন পূর্বে জামিয়াতুর রশিদ, করাচির ইসলামি ইতিহাসবিষয়ক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান আমাকে বললেন তিনি এ ধরনের ইতিহাসবিষয়ক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এটি একদিকে যেমন সুখবর ছিল অপরদিকে সংশয়ও ছিল যে, তিনি কি এর হক আদায় করতে পারবেন? কিন্তু এই নওজোয়ান আলেমেদীন কয়েক বছর পরই তার এই কর্মযজ্ঞ তিন খণ্ডে 'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ' আমার নিকট পাঠিয়ে দেন।

আমি তো ইদানীং সফর ও ব্যস্ততার দরুন নিজের পছন্দের কিতাবগুলো পড়ার খুবই কম সুযোগ পাই। কিন্তু এই কিতাবটি কিছু সময় আমাকে আটকে রাখে। আমি এই কিতাবের হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

থেকে নিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কাল পর্যন্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করি এবং আমি যারপরনাই আনন্দিত হই যে, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, গ্রন্থকার রেওয়ায়েতসমূহ চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে ইসলামি ইতিহাসের এমন স্পর্শকাতর যুগের প্রকৃত তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাকে সত্যিই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবিই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমবিয়া আলাইহিমুস সালামের পর শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বড় মর্যাদা কোনো আল্লাহর ওলী হাসিল করতে পারবে না। 'الصحابة كلُّهم عَدُول' তথা সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত এবং সত্যের মাপকাঠি'। কেবল অন্ধবিশ্বাস নয়; বরং এটি এমন বাস্তবতা, যার সাক্ষ্য কুরআন এবং হাদিস প্রদান করে থাকে। যারা দুর্বল রেওয়ায়েতের উপর ভর করে কতিপয় সাহাবির সমালোচনা করে, তারা মূলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এই মন্দ ধারণা পোষণ করে যে, নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত وَيُزَكِّيهِم (তাদের সংশোধন করুন) দায়িত্ব (যা পবিত্র কুরআনে চারবার উল্লেখ হয়েছে) তিনি আদায় করতে ব্যর্থ হন। নাউজুবিল্লাহ। তাদেরকে তিনি ক্ষমতা ও সম্পদের লোভ থেকে মুক্ত করতে পারেননি। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও সাফাইয়ের ব্যাপারে কুরআন কারিম এবং হাদিস শরিফে যে পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে, তার বিপরীতে ইতিহাসের দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহের উপর নির্ভর করা যুক্তি ও ইনসাফের আলোকেও তা পরিত্যাজ্য।

বলা হতে পারে, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় যেসব দুর্বল রাবিকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনায় তারাই কিন্তু মূল। যদি সেক্ষেত্রে তাদেরকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হয়, তা হলে সম্পূর্ণ ইতিহাসই প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। কিন্তু এই কথার প্রবক্তারা এমন একটি সাধারণ বাস্তবতাকে ভুলে গিয়েছে যে, মানব-জীবনের সাধারণ ঘটনা, যার সাথে আকিদার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, স্বীকৃত কোনো বাস্তবতা খণ্ডিত হয় না এবং রাবিদের মতাদর্শও সমর্থন করে না- এমন ক্ষেত্রে যেকোনো দুর্বল

রাবির কথা সার্বিকভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু কোনো রাবি যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তার ভ্রান্ত মতাদর্শের সমর্থনে কোনো ঘটনা বর্ণনা করে, যার স্বীকৃত হাকিকত ও বাস্তবতার পরিপন্থি হয়, তখন তার কথা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন এ ধরনের সংবাদ পড়েন যে, অমুক স্থানে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে, অমুক জায়গায় বাস উলটে গেছে, অমুক জায়গায় শীতের প্রকোপ বেড়ে গেছে- তখন কিন্তু আপনি এই প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতা অনুসন্ধান করার কোনো প্রয়োজনবোধ করেন না। কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যাকে সার্বিকভাবে সজ্জন ও সুশীল মনে করা হয়, তার ব্যাপারে যদি এ ধরনের রিপোর্ট করা হয় যে, তিনি ঘুষ গ্রহণ করেছেন; তখন একজন সাধারণ মানুষও সংবাদের সত্যতা বিশ্বাস করার পূর্বে সেই প্রতিবেদকের সততা এবং আমানদারির ব্যাপারে খোঁজ নেবেন। মজবুত প্রমাণাদি ছাড়া তার সংবাদ গ্রহণ করবেন না।

অবাক-করা বিষয় হলো, এই সাধারণ নিয়মটি সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রয়োগ করে বলা হচ্ছে যে, ইতিহাসে দুর্বল থেকে দুর্বলতর রাবি যদি কোনো সাহাবির ব্যাপারে কোনো মন্দ কাজের বর্ণনা দেয়, তা হলে তা নিশ্চিত সঠিক বলে গণ্য হবে। উপরন্তু সেই দুর্বল রাবিদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং তাদের মতাদর্শ যাচাই করা নিষেধ।

মাওলানা ইসমাইল রেহান তার গ্রন্থে পূর্বোক্ত মূলনীতির আলোকে যে তাহকিকি আন্দাজে এবং সুন্দর বিন্যাসে প্রথম তিনশতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাকে তাজদিদি (ইতিহাস সংস্কারমূলক) কর্ম বলে অভিহিত করা যায়। তিনি তার কর্মে তথ্য-উপাত্ত নির্বাচন করে প্রতিটি রেওয়ায়েতকে ঘটনার সময়ের সঙ্গে পর্যালোচনা করে এমন যৌক্তিকভাবে বর্ণনা করেছেন, এখন আর কোনো শূন্যতাই অনুভব হয় না।

অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থের মতো বিজ্ঞ লেখক তার ইতিহাসও আদম আলাইহিস সালাম এবং পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শুরু করেছেন। তারপর নববি-জীবন, খোলাফায়ে রাশেদিন, খেলাফতে বনু উমাইয়া, খেলাফতে বনু আব্বাসের অবস্থা প্রথম তিনখণ্ডে আলোচনা করেছেন। ইতিহাসবিষয়ক আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেক যুগের ইলম ও ধর্মীয় বিশিষ্ট

ব্যক্তিদের চমৎকার পরিচিতি দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ বইয়ের পাঠকরা নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভাণ্ডার হাসিল করবে।

সাধারণত আমাদের ইসলামি ইতিহাসের কিতাবগুলোতে বাদশাহদের অবস্থা এবং যুদ্ধাভিযানের উপরই জোর দেওয়া হয়। কিন্তু সে সময়ে জনজীবন, সমাজ-উন্নয়ন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ণনার প্রতি কোনোরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিজ্ঞ লেখকের নিকট অনুরোধ থাকবে, তিনি তার ইতিহাসগ্রন্থে এই দিকটির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আরেকটি উত্তম দিক হলো, লেখক তার নাম 'ইসলামের ইতিহাস' না দিয়ে 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' দিয়েছেন। 'ইসলামের ইতিহাস' নামকরণ দ্বারা গোচরে কিংবা অগোচরে এই ধারণা তৈরি হতো যে, ইতিহাসে যা কিছু রয়েছে, সবই ইসলামের দাবি। এর ফলে অনেক রাজা-বাদশাহর কর্মকাণ্ডও ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে যাবে। অপরদিকে 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শিরোনাম দ্বারা এটি পরিষ্কার যে, এটি মুসলমানদের ইতিহাস এবং তাদের সকল কাজ ইসলামের দিকে সম্বন্ধ করা যায় না।

মোটকথা, এই অনবদ্য ও মহামূল্যবান কর্মের জন্য মাওলানা ইসমাইল রেহানকে আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, তিনি মুসলিম উম্মাহর পাঠাগারের অনেক বড় একটি শূন্যতা পূরণ করেছেন, যা আরবিপ্রবাদ كم ترك الأول للآخر তথা 'পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের জন্য কত কিছু রেখে গিয়েছেন'- এর বাস্তব উদাহরণ।

আমাদের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থের আরবি-ইংরেজি অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। এখন পর্যন্ত তিন খণ্ড পাঠকের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞ লেখক পরবর্তী অংশগুলো লিখছেন। আমরা দোয়া করছি, আল্লাহ তায়ালা তার হাতেই বর্তমান সময়ের এত বিরাট ও মহান কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিন। আমিন।

একনজরে 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

✓ সিরাতে নববি এবং সিরাতে সাহাবার ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য তথ্যমুক্ত।

✓ হজরত আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রথম বিস্তারিত উর্দু (বাংলায় অনূদিত) ইতিহাসগ্রন্থ।

✓ প্রথম অংশে ইতিহাসশাস্ত্রের পরিচয় এবং প্রাথমিক আলোচনা সংক্রান্ত ভূমিকা।

✓ দ্বিতীয় অংশে ইতিহাস-গবেষণা এবং পরিমার্জন-নীতিবিষয়ক একটি পুস্তিকা।

✓ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি মোতাবেক বিচার-বিশ্লেষণ।

✓ মাগাজি এবং মুশাজারাতের (নবীজির যুদ্ধাভিযান এবং সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব) রেওয়ায়েতের উপর হাদিসের ছাত্র-উসতাদদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ব্যাখ্যামূলক আলোচনা।

✓ রিজালশাস্ত্রের আলোকে ইতিহাসের রেওয়ায়েতের সনদ-বিশ্লেষণ এবং রাবিদের সম্পর্কে আলোচনা।

✓ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকিদা এবং মতাদর্শের সমর্থনে জায়গায় জায়গায় মজবুত আকলি ও নকলি (কুরআন-হাদিস এবং যৌক্তিক) দলিলের সমাহার।

✓ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের উদ্ভবের ব্যাপারে গবেষণা এবং মূলনীতির আলোকে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শের সমালোচনা।

✓ সংশয়পূর্ণ ঘটনাবলির সনদ ও মতন এবং রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের (কুরআন-হাদিস এবং যুক্তির) ভিত্তিতে আলোচনা।

✓ দাওয়াহ ইলাল্লাহ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ।

✓ ইসলামি ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা।

✓ ঘটনাবলি বিশেষত সিরাতুন-নবী এবং মাগাজির সঠিক সময়কাল উল্লেখ এবং যথাসাধ্য খ্রিষ্টাব্দ বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী উল্লেখের চেষ্টা।

✓ মৌলিক, প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রগ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করার প্রতি যথাসম্ভব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

✓ প্রতিটি কথার পরিপূর্ণ সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

✓ আমাদের গর্বিত মুসলমান খলিফা, সুলতান এবং প্রসিদ্ধ মনীষীদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত দল, সেক্যুলার ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদদের প্রোপাগান্ডা দালিলিকভাবে অপনোদন করা হয়েছে।

✓ ইতিহাস থেকে আহরিত শিক্ষা ও উপদেশ জায়গায় জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

✓ বিভিন্ন যুগে ইলম, সংস্কার এবং জাতীয় খেদমতে নিযুক্ত বড় বড় ব্যক্তির কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

✓ কঠিন শব্দ পরিহার করে ঝরঝরে সাবলীল ভাষায় তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

✓ পাঠক আকৃষ্টকারী চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থ।

✓ টীকায় আলেম ও তালেবে ইলমদের জন্য অনেক অনেক উপকারী ইলমি আলোচনা

বই সম্পর্কে কিছু কথা

নিজেদের ইতিহাস অধ্যয়ন করা উজ্জীবিত কওমের নিদর্শন। ইতিহাসই হলো এমন শেকল, যা আপনাকে অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দেবে। অতীতকালে পৃথিবীতে হক-বাতিলের চরম দ্বন্দ্ব ছিল। আল্লাহর বান্দা এবং বস্তুপূজারি দুটি বড় গোষ্ঠীর মাঝে দুনিয়া বণ্টিত ছিল। বস্তুবাদীরা মূলত শয়তানের অনুসারী। তারা মানুষকে ইতিহাসের সেসব বাস্তব সত্য এবং শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে দূরে রাখার হীন চেষ্টায় লিপ্ত, যা ইসলামের বদৌলতে পৃথিবী অবলোকন করেছে। কিন্তু ওসব মহাসত্য ধামাচাপা দিয়ে তারা রাজা-বাদশাহদের ভোগ-বিলাসিতার ফিরিস্তি, সুবিধাভোগী নেতাদের গল্প এবং পার্থিব আরাম-আয়েশে মত্ত বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের কল্পকাহিনি আমাদের অতীত-অবদান হিসেবে এমনভাবে রঙচঙ লাগিয়ে উপস্থাপন করছে, যা দেখে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী মানুষগুলো মুহূর্তেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। ফলে তারা আল্লাহ, রাসুল, শরিয়ত এবং পরকাল ভুলে পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা এবং প্রাচুর্যের পেছনে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটছে।

ইতিহাস বিকৃত করার এই ঘৃণ্য চক্রান্ত প্রাচ্যবিদ, ইউরোপিয়ান চতুর ঐতিহাসিক এবং তাদের এশীয়-শিষ্যদের মাধ্যমে প্রায় শতাব্দীকাল যাবৎ জোরেশোরে চলছে। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা হলো যে, তাদের অধিকাংশই নিজেদের ইতিহাসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল। জনসাধারণের কথা বাদই দিলাম, উচ্চশিক্ষিতরাও ইতিহাস সম্পর্কে বেখবর।

সর্বোপরি এই অবস্থায় আল্লাহর বান্দাদের কর্তব্য হলো মুসলমানদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা। তাদের উপর আরও আবশ্যক হলো, সত্য ইতিহাস পুরো দুনিয়ার সামনে পেশ করা এবং বাস্তবতা বিকৃত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা ব্যয় করা।

বিগত সতেরো-আঠারো বছর যাবৎ দৈনিক 'ইসলাম' এবং সাপ্তাহিক 'যরবে মুমিনে'র শনিবারের কলামসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইতিহাস বিষয়ে নিয়মিত লিখে আসছি। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক এবং ইলমি-ফিকরি প্রোগ্রামে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের আলোচনা তুলে ধরারও সুযোগ হয়েছে। এ সময় সরাসরি, ফোনে, ডাকমারফত, ইমেইলে সবচেয়ে অধিক যে বিষয়ে প্রশ্ন এসেছে তা হলো 'কোন কিতাব থেকে ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করব?' কিংবা 'এমন একটি কিতাবের নাম বলুন, যেখানে শুরুযুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাবে।'

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি বরাবরই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কারণ, বাজারে তখন এমন কোনো কিতাব ছিল না, যেখানে শুরুলগ্ন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে। উপরন্তু যেসব কিতাব রয়েছে, সেগুলোর একেকটি অধ্যায় ঐতিহাসিক নানা ভুলে ভরা। কোনোটাতে কম, কোনোটাতে বেশি। তবে এটি নিশ্চয়ই আমাদের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা সিরাতে নববি এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। সিরাতের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, যা মূলত মানদণ্ডের দিক থেকে একেবারে অকেজো। এগুলোও ইতিহাসে শামিল হয়ে গেছে। তদ্রূপ খোলাফায়ে রাশেদিন, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত হাসান, হজরত হুসাইন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর জীবনীও কিছু যয়িফ ও সংশয়পূর্ণ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে খুবই বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। উপযুক্ত তাহকিক না হওয়ার দরুন এগুলো ইতিহাসের বিশেষ অবস্থান দখল করে আছে।

এমন দুঃখজনক ঘটনা হওয়ার পেছনে বড় কারণ ঐসব আরবি ও ফারসি ইতিহাস, যেগুলো ইসলামি খেলাফতের পতনের যুগে ওলামায়ে কেরামের নিকট তাহকিক ও গবেষণার উপাত্ত কম থাকার পরেও পাঠকদের সম্মুখে প্রকাশ্যে এসে যায়। যখন এসব ইতিহাসগ্রন্থ মানুষকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তখন তার থেকে সনদ ফেলে দেওয়া হয়। এর ফলে আরো গ্রহণযোগ্যতা পায়। উপনিবেশের আধিপত্যের সময় ইউরোপিয়ান ভাষায় মুসলিমবিশ্বের ইতিহাস রচনার ধারা শুরু হয়, তখন তারা ঐসব ইতিহাসগ্রন্থ আদ্যোপান্ত নিয়ে নেয়। অধিকাংশ উর্দু এবং ইংরেজি ইতিহাস ঐ ধাঁচেরই। অর্থাৎ সেগুলো সবই অনুবাদ, নিজস্ব

কোনো গবেষণা নয়। কিছু কিছু ঐতিহাসিক তো অনুবাদের সাথে সাথে এমন পক্ষপাতমূলক পর্যালোচনা পেশ করতে থাকে, যা ইসলামি ইতিহাসের স্বর্ণযুগের গায়ে কালিমা লেপন করে। তা ছাড়া মুসলিম খলিফা ও সুলতান এবং বহু নির্ভরযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তিকে 'বাজারে' ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে নির্দয়, লোভী, জালেম শাসক হিসেবে পরিচয় প্রদান করে, যা সম্পূর্ণই বাস্তবতা পরিপন্থি।

সামগ্রিকভাবে ইসলামি ইতিহাসের প্রচলিত গ্রন্থসমূহে চারটি বড় দুর্বলতা দেখা যায় :

১. অধিকাংশ গ্রন্থ সিরাতুন-নবী থেকে নিয়ে আব্বাসিযুগ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ। এর থেকে সামনে অগ্রসর হয় না। কিছু গ্রন্থ উসমানি খেলাফতের পতন পর্যন্ত লিখিত। কিন্তু এই যুগের পরেও প্রায় শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। উর্দুভাষায় বর্তমান যুগ পর্যন্ত একটি কিতাবেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগ পর্যন্ত একটি ইতিহাস রচনা করা এখন সময়ের দাবি।

২. এই গ্রন্থগুলো সংশয়পূর্ণ তথ্য দিয়ে ভরপুর। যদিও উর্দুভাষায় দুটি কিতাব মানদণ্ডের বিচারে তুলনামূলক ভালো। একটি হলো শাহ মুঈনুদ্দীন নদবী রচিত 'তারিখে ইসলাম', দ্বিতীয় 'তারিখে মিল্লাত'। এই কিতাবগুলোতে যেসব নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলো তো সত্যিই মূল্যবান। কিন্তু এখানেও সেই দুর্বলতা বরাবরই বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে সিরাত এবং সাহাবিযুগের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতগুলো গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হয়নি এবং সংশয়পূর্ণ রেওয়ায়েতগুলোর সনদ যাচাই-বাছাই করার চেষ্টাও করা হয়নি। ফলে ভিত্তিহীন ও অসার রেওয়ায়েত পবিত্র সিরাতুন-নবী এবং সাহাবিদের বর্ণাঢ্য জীবনীর অংশে পরিণত হয়। তদ্রূপ বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস এবং তৎপরবর্তী মুসলিম সুলতানদের ব্যাপারেও কিছু সন্দেহপূর্ণ তথ্য গ্রন্থের মূল অংশ হয়ে যায়। ফলে এই কিতাবগুলোর উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও তার কিছু জায়গা তাহকিক ও গবেষণার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। আকবর শাহ নজিবাবাদী রচিত 'তারিখে ইসলাম' অনেক প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। কিন্তু উপর্যুক্ত সব দুর্বলতা এতেও বিদ্যমান। তা ছাড়া এই গ্রন্থে কোনো সূত্রমূল উল্লেখ করা হয়নি, যা তার অনেক বড় ত্রুটি।

৩. এসব গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন ও সাধারণ পাঠকদের নিকট ভারী হয়ে গেছে। উপরন্তু এগুলোতে এমন কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা বর্তমান যুগবিবেচনায় অপ্রয়োজনীয়।

৪. ঐসব গ্রন্থ নতুন যুগের পাঠকদের আত্মপ্রশান্তির জন্য যথেষ্ট নয়। এই গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে ঐসব সন্দেহ-সংশয় দূর হবে না, যা প্রজন্মের মস্তিষ্কে গেঁথে আছে। বরং সম্ভাবনা আছে এই ইতিহাসগ্রন্থগুলো নতুন করে সংশয় তৈরি করবে। পাশাপাশি অনেক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা স্থান পায়নি, যা একজন সাধারণ মানুষ ও সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজন পড়বে এবং সে তা পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এই অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে এ কথা বলা দুষ্কর যে, 'আপনি অমুক ইতিহাসগ্রন্থটি নির্দ্বিধায় পাঠ করতে পারেন, এটি পূর্ণাঙ্গ এবং সবদিক থেকেই তা নির্ভরযোগ্য।'

অপরদিকে বর্তমান সময়ে বহু ইসলামি সংস্থা, সংগঠন, দীনি মাদরাসা-মক্তবের মেহনতের ফলে নওজোয়ানদের একটি বড় অংশ দীনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে নিজেদের ইতিহাস জানার আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐ নওজোয়ানদের মধ্যে মাদরাসার তালিবে ইলম ছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত। ফলে তারা সঠিক দিকনির্দেশনা না পেয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের সবার একই প্রশ্ন যে, আমরা নিজেদের ইতিহাস অধ্যয়ন কোন কিতাব থেকে করব? কীভাবে করব?

ওলামায়ে কেরাম কিংবা আরবি-জানা তালিবে ইলমদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, তারা যেন তারিখে ইবনে খালদুন কিংবা আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া অধ্যয়ন করে। কারণ, গ্রন্থদুটি এ ধরনের খরা থেকে অনেকটাই মুক্ত। তবে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা এতেও রয়েছে। উর্দুভাষী তরুণদের বলব, তারা যেন তারিখে মিল্লাত কিংবা শাহ মুঈনুদ্দীন নদবী রচিত 'তারিখে ইসলাম' অধ্যয়ন করে। তবে সিরাতুন-নবী কিংবা সাহাবি-যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো কথা ও তথ্যের ব্যাপারে সংশয় বা বিস্ময় তৈরি হলে তা নোট করে রেখে আলেমদের থেকে জেনে নেবে। অথবা আমাদের আকাবির আলেমগণ সিরাতুন-নবী এবং সাহাবা-চরিতের উপর পৃথক পৃথক যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অধ্যয়ন করবে।

সর্বোপরি আমার নিকট এর প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভব হচ্ছিল, আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠান ইসলামি ইতিহাসকে নতুন করে বিন্যাস করার মহান কাজ আঞ্জাম দেবে। ইতিহাসটি হবে তাহকিকপরিপন্থি তথ্যমুক্ত, নির্ভরযোগ্য সূত্রসংবলিত। ফলে তা যেকোনো ব্যক্তি পড়তে পারবে, উপকৃত হবে। ইতিহাসটি বর্তমানযুগ পর্যন্ত রচিত হবে।

বছরের পর বছর অপেক্ষায় কেটে গেল। কোনো প্রতিষ্ঠানই কাজটি শুরু করেনি। আমিও তখন সুলতান জালালুদ্দীন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জীবনী নিয়ে কাজ করছিলাম। তাই এ বিষয়ে পৃথকভাবে কাজ করার সময় বের করতে পারছিলাম না। উপরন্তু সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার দায়িত্ব তো রয়েছেই। এ কাজ সম্পন্ন করতে সব ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে দৈনিক কমপক্ষে আট-দশ ঘণ্টা কিতাবের সমুদ্রে ডুবে যেতে হবে এবং অনবরত কয়েক বছর কাজ করতে হবে।

এভাবে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়। এর মাঝে ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে উক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। সকলেই পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন যে, এ কাজটি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাজ শুরু করার কোনো পথই দেখা যাচ্ছিল না। মূলকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজের সূচনা ও সমাপ্তির একটি নির্ধারণ করে রেখেছেন। মানুষ লাখো চেষ্টা করেও তার হুকুম না হলে আমাদের প্রচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার হবে না এবং স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে, বাস্তবায়িত হবে না।

'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' গ্রন্থের বানানসংশোধন এবং 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি'র পাণ্ডুলিপির কাজ থেকে যখন অবসর হলাম, অনেক চিন্তাফিকির এবং অনেকের পরামর্শের পর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আমি নিজেই এ কাজে কোমর বেঁধে লেগে গেলাম; তা কয়েকটি কারণে :

- আমার দিলে এ কাজের প্রতি এতই চাহিদা অনুভূত হচ্ছিল যে, অন্যান্য কাজ আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের মনে হচ্ছিল।
- এ কাজ না করলে আখেরাতে আমি পাকড়াও হওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। সমাজের, বিশেষ করে, শিক্ষিতশ্রেণির হাজারও লোককে ইতিহাস বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে দেখে আমার উপর আবশ্যক হয়ে পড়ে ইতিহাসের সঠিক চিত্র তাদের সামনে পরিবেশন

করার চেষ্টা করা। এটি মূলত জাতির প্রতি সমবেদনা এবং দীনি দায়িত্বের দাবি, যা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ ছিল না।

- মৃত্যুর তো কোনো নির্ধারিত সময় জানা নেই। আশঙ্কা হচ্ছিল না জানি কাজ শুরু করার পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যায়।
- আমার মুরুব্বি, আসাতিযায়ে কেরাম এবং প্রবীণ ওলামায়ে কেরামের নিকট এই সংকল্পের কথা প্রকাশ করলে সকলেই উৎসাহ দেন এবং দোয়া করেন।
- এ কাজের জন্য যে অবসরতার প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে তার বন্দোবস্ত হলো। রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে যখন কাজ আরম্ভ করার হুকুম হলো তখন আমার মুখলিস ও পুরোনো বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ মায়মুনকে আল্লাহ তায়ালা এই মহতী কাজ শুরু করার মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক জামিয়া মা'হাদুল খলিল আলইসলামিতে পড়ার সময় থেকে। এরপর জামিয়াতুর রশিদে শিক্ষকতার জীবনেও আমরা একসঙ্গে আছি। এই বন্ধুত্বের বয়স বিশ বছরেরও অধিক। প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতা, আসাতিযা এবং বড়দের দোয়া নিয়ে ১৪৩৩ হিজরিতে (২০১১ খ্রিষ্টাব্দ) আমি আল্লাহ তায়ালার নামে কাজ আরম্ভ করে দিই। দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে আমাকে ডুবে যেতে হবে। হাজারো কিতাবের লাখো পৃষ্ঠা থেকে যাচাই-বাছাই করে তথ্য সংগ্রহ করে উর্দুভাষায় সুন্দর ও সাবলীলভাবে তা উপস্থাপন করে পাঠকের সামনে পেশ করতে হবে।

যতদিন করাচি ছিলাম, ঐ কাজের পাশাপাশি দৈনিক 'ইসলাম'-এর 'খাওয়াতিনে ইসলাম' পাতার বিভাগীয় সম্পাদনার কাজও আঞ্জাম দিই। জামিয়াতুর রশিদ, আহসানাবাদ, করাচিতে আমার পাঠদানও চলমান থাকে। এর মাঝেই আমি ইতিহাস সংকলনের কাজে দৈনিক চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতাম। কিন্তু করাচির বৈরী আবহাওয়ার কারণে আমার স্বাস্থ্যের দিনদিন অবনতি হতে লাগল। ভয় হচ্ছিল ইতিহাসের কাজ পূর্ণ হওয়ার আগেই আমার শিরাগুলো স্থবির হয়ে পড়ে কিনা।

ফলে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে যখন স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে, শহরের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এবং আরো কিছু পারিপার্শ্বিক কারণে আমি

পাঞ্জাব চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সেখানকার শান্ত পরিবেশে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং কাজেও গতি এবং একাগ্রতা আসে। প্রতিদিন আট থেকে বারো ঘণ্টা কাজ করতে লাগলাম। দোয়ার দরখাস্ত! আল্লাহ তায়ালা যেন সিহহাত ও আফিয়াতের সঙ্গে কাজটি পূর্ণ করার তাওফিক দেন।

কিছু কিছু আলেমের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কাজটির নাম দিই 'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'। নিঃসন্দেহে এটি মুসলমানদের ইতিহাস। আজ পর্যন্ত 'তারিখে ইসলাম' নামে যত তথ্য পেশ করা হয়েছে, তা মূলত ইসলামের নয়, মুসলমানদের ইতিহাস। ধর্মের নয়, ধর্মানুসারীদের ইতিহাস। উত্তম ছিল 'তারিখে ইসলাম'-এর জায়গায় 'তারিখে মুসলিমিন' বলা, যাতে করে কতক মুসলমানের ভুল কর্মের কারণে ইসলামের প্রতি ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। তবে বর্তমানে এই পরিভাষা যেভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে, তা পরিবর্তন করা বড়ই দুষ্কর।

যাই হোক, আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বক্ষ্যমাণ কিতাবের নাম দিয়েছি 'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'।

'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ' ছয়টি অংশে বিভক্ত এবং তার বিন্যাস নিম্নরূপ।

১. প্রথম খণ্ড : ইতিহাসশাস্ত্রের পরিচয় এবং তার প্রাথমিক আলোচনাসংবলিত একটি পুস্তিকা। এটি পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত।
   প্রথম অধ্যায় : পূর্ববর্তী আমবিয়া (আলাইহিমুস সালাম), প্রাচীন গোত্রসমূহ এবং ইসলামপূর্ব পৃথিবীর আলোচনা।
   দ্বিতীয় অধ্যায় : সিরাতুন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
   তৃতীয় অধ্যায় : খেলাফতে রাশেদার বিজয় এবং উত্থান।
   চতুর্থ অধ্যায় : খেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামি সরকার ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির বিবরণ।
   পঞ্চম অধ্যায় : নববিযুগ এবং খেলাফতে রাশেদার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং আহলে বাইতের অবস্থা।

২. দ্বিতীয় খণ্ড : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত, জঙ্গে জামাল ও সিফফিন, দুমাতুল জানদালে সালিসি, খারেজিদের উদ্ভব, সাবায়ি ফেতনা এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত- এই বিষয়গুলোর উপর তাত্ত্বিক আলোচনা। তবে হজরত

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশ বছর শাসনকালে মুসলিম উম্মাহর যে উত্থান ও বিজয় হয়েছে, তার উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অংশে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার যুগ থেকে খেলাফতে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। আর এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ এবং বেদনাদায়ক ট্রাজেডি, রাজনৈতিক বিতর্ক, গৃহযুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ এবং এই বিষয়ক রেওয়ায়েতগুলোর বিশ্লেষণের সঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে সাহাবিযুগ সংশ্লিষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৩. তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান থেকে বনু উমাইয়ার খেলাফতের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে খেলাফতে বনু আব্বাসের উত্থান ও পতনবিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামি খেলাফতের বিপরীতে বিভিন্ন মতাদর্শের সরকারের বিবরণ রয়েছে।

৪. চতুর্থ খণ্ডে সেলজুক, আইয়ুবি, খাওয়ারিজশাহি, গজনবি, ঘুরি, খিলজি, তুঘলকি সুলতানগণ এবং মুসলিম স্পেনের অবস্থা (কলেবর দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা এই চার খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করছি ১৪ খণ্ডে। অনুবাদগ্রন্থ থেকে অধ্যায়সংযুক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপ্রকাশের সুবিধার কথা বিবেচনা করে)।

৫. পঞ্চম খণ্ডে খেলাফতে উসমানি, মোগল সাম্রাজ্য, ভারতবর্ষ এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিবরণ।

৬. ষষ্ঠ খণ্ডে আজাদি আন্দোলন এবং নতুন পৃথিবীসংক্রান্ত আলোচনা।

এবার তথ্যসূত্র সংক্রান্ত আলোচনায় আসি। পূর্ববর্তী নবী-রাসুল, সিরাতুন-নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের বিজয়াভিযানের ঘটনাবলি যে অংশে বিধৃত হয়েছে, তাতে হাদিসের ভাণ্ডার, সিরাতুন-নবী, সাহাবা-চরিতসংবলিত গ্রন্থসমূহ এবং ইতিহাসের প্রচলিত কিতাব থেকে প্রচুর পরিমাণে নেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী নবীদের জীবনীতে আমাদের ইতিহাসগ্রন্থসমূহে ইসরাইলি রেওয়ায়েত ভরপুর। তবে উসুলবিদদের নিকট সব ইসরাইলি রেওয়ায়েতই পরিত্যাজ্য নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না

হওয়ার শর্তে তা কবুল করা হবে। ফলে ঐ শর্তের আলোকে অনেক ইসরাইলি রেওয়ায়েত আমাদের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তবে আমি (গ্রন্থকার) ইসরাইলি রেওয়ায়েত পরিহার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। নবীদের জীবনীর অধিকাংশ কুরআন কারিম এবং হাদিসের কিতাবসমূহ থেকে পেশ করার যথাসম্ভব প্রয়াস চালিয়েছি।

সিরাতের অধ্যায়েও আমার দৃষ্টিভঙ্গি সামনে ছিল। অধিক পরিমাণে হাদিসের কিতাব এবং সহিহ রেওয়ায়েতের সাহায্যে আমি পেশ করার চেষ্টা চালিয়েছি। তাই সিরাতের ক্ষেত্রে আমার সামনে ছিল :

বুখারি, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাব ছাড়াও দালাইলুন নুবুওয়াহ- বাইহাকি, তাফসিরে ইবনে কাসির, সহিহুস সিরাতিন নববিয়্যাহ- ইবনে কাসির, সিরাতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক, সিরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে হিব্বান, সিরাতে হালাবিয়্যাহ, যাদুল মাআদ, আল-ইসাবাহ, উসদুল গাবাহ, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, আল-ইসতিয়াব, তারিখুত তাবারি, ফুতুহুল বুলদান, ফুতুহুশ শাম- আজদি, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, আল-কামিল ফিত তারিখ, তারিখে ইবনে খালদুন, তারিখে ইসলাম-জাহাবি, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, আল-মুনতাযাম- ইবনুল জাওযি, তারিখুল খুলাফা-সুয়ুতি, আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার।

ভারত উপমহাদেশীয় গবেষকদের মধ্যে আল্লামা শিবলি নোমানির সিরাতুন-নবী, মাওলানা ইদরিস কান্ধলবির সিরাতে মুসতফা, কাজি সুলাইমান মানসুরপুরির রাহমাতুললিল আলামিন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবির নবিয়ে রহমত, তাবলিগের মুরব্বি মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলবির হায়াতুস সাহাবা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। বর্তমান সময়ে এবং নিকট-অতীতে প্রকাশিত আরব-গবেষক যেমন: ডক্টর আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি, ডক্টর আকরাম যিয়া উমারির গ্রন্থসমূহও আমার সামনে ছিল। শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের 'মুখতাসারু সিরাতির রাসুল' অনেক বড় উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদিনের বিজয়কালের বিবরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে আমি রেওয়ায়েতের আধিক্যের সাহায্য নিয়েছি। কারণ, এসব অভিযানের নগণ্য কয়েকটি স্থান ছাড়া কোথাও কারো দ্বিমত পাওয়া যায় না। তা

ছাড়া এগুলোর মধ্যে প্রতারণার আশংকা কম। কেননা তাদের এসব বিজয়াভিযানের কথা যদি কোনো সহিহ রেওয়ায়েতের মধ্যে অনুল্লেখ থাকে, তদুপরি তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আবার এটাও হয়নি যে, সকল পরিত্যাজ্য হাদিস নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বরং মুহাদ্দিস এবং সিরাতবিদদের নিয়ম ও উসুলের আলোকে যথাসাধ্য যাচাই-বাছাই করে সতর্কতার সাথে আলোচনা করা হয়েছে। আমার কিছু কিছু উসতাজ, মুরব্বি এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনাও করেছি। তাদের দিকনির্দেশনা, সাহস প্রদান এই কাজের উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছে।

পাঠক এই গ্রন্থপাঠের সময় কিছু বিষয়ে নতুন বিন্যাস কিংবা কিছু ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হবে। তাদের নিকট আমার অনুরোধ থাকবে, এই স্থানগুলোতে কোনোধরনের অস্থিরতা ও পেরেশানির শিকার না হয়ে উল্লিখিত সূত্রগ্রন্থে পক্ষপাতমুক্ত থেকে দলিলসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আশ্বস্ত হবেন।

এখানে বিশেষভাবে একটি কথা বলতে চাই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ কেবল ইতিহাসসর্বস্ব গবেষণা নয়; বরং এটি একটি দীনি দাওয়াতও। তাই পূর্ণ চেষ্টা ছিল- বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠককে ইসলামের রাজনৈতিক এবং দাওয়াতি চিন্তাধারার সাথে ভালোভাবে পরিচিত করে তোলা। ইসলাম কঠিনতর পরিস্থিতিতে কীভাবে হিম্মত, দুঃসাহস, পরিকল্পনা এবং কল্যাণের শিক্ষা দেয়? দাওয়াত ও জিহাদের প্রতি উৎসাহপ্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করে? পূর্বসূরিগণ ইসলামের প্রসার, সংরক্ষণ এবং জিহাদের জন্য কীভাবে নিজেদের ওয়াক্ফ করেছিলেন? ইসলাম কীভাবে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততা এবং গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করে? ইসলামি রাজনীতির মূলনীতি কী? এর বিরুদ্ধাচরণ করলে মুসলিমবিশ্বকে কোন্ কোন্ দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়? এসব প্রশ্নের জবাব ইতিহাসের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই আমরা দিয়েছি। পাশাপাশি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, যেন পাঠকদের মধ্যে এমন প্রাণ সঞ্চার করতে পারি যে, তারা পূর্বসূরিদের মতো ইসলামের পথে চলা এবং তার জন্য বড় বড় কুরবানি ও আত্মত্যাগের প্রতি উৎসাহী হয়। এজন্য পাঠকগণ সিরাতুন-নবী এবং

খেলাফতে রাশেদার যুগে দাওয়াত ও জিহাদের অবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক অধিক বিবরণ পাবেন।

দ্বিতীয় অংশে পাঠক মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রামাণিকভাবে পাবেন। যেহেতু এসব বিষয় ঐতিহাসিকভাবে অধিক মতভেদপূর্ণ, তাই খুবই অনুসন্ধান করার পর এসব ঘটনা লেখা হয়েছে এবং গলদ রেওয়ায়েতসমূহের সমালোচনা করা হয়েছে।

ইতিহাসবিদরা যেমন শাসকদের আলোচনার অধীনে তাদের কওমের মহান ব্যক্তিদের আলোচনা করে থাকেন, আমিও বিভিন্ন শাসক ও শাসনব্যবস্থার সেই অধ্যায় বহাল রেখেছি। বুঝাতে চেয়েছি, এটি একটি পরম বাস্তবতা যে, উম্মতের হেফাজত ও তরবিয়ত, উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে শাসকদের তুলনায় ঐ মহান ব্যক্তিদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। তারা ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের ঝর্নাধারার মতো। তারা ছিলেন তাজকিয়া ও আত্মশুদ্ধির অগ্রপুরুষ এবং দাওয়াত ও আজিমতের (দৃঢ় সংকল্প) দিশারি। মুসলিম উম্মাহ তাদের দয়া ও অনুগ্রহ কখনোই ভুলে থাকতে পারে না। তাই প্রত্যেক যুগের এমন উঁচু দরদি ব্যক্তিদের জীবনী বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠক তাদের জীবনী পাঠ করে তাদের জীবন থেকে দীক্ষা নিতে পারেন। এটাই আমাদের এই কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

পাঠকদের প্রতি করজোড় অনুরোধ থাকবে, তারা এই বইটি কেবল ঐতিহাসিক তথ্য অর্জনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রেখে একে নিজেদের জীবনধারা চেনার মাধ্যম বানিয়ে মনমানসিকতা বদলানোর অসিলা হিসেবে গ্রহণ করবেন।

সিরাতুন-নবী লেখার সময় আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ঘটনাবলির সময়কাল নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক তাত্ত্বিক এবং বিশুদ্ধ সময়টি বের করার। পঞ্জিকাবিষয়ক প্রাজ্ঞ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার দাবি আমি কখনোই করি না। তাই আমি এই শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের গ্রন্থাদি সামনে রেখেছি। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত কিতাবাদি থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

১. সিরাতে নববি তাওকিত কি রৌশনি মে, মাওলানা ইসহাকুন-নবী আলাবি রহ.।

২. তাকউয়িমে তারিখি, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমি রহ.।
৩. তাকউয়িমে আহদে নববি, জনাব আলি মুহাম্মদ খান রহ.।

মাওলানা ইসহাকুন-নবী আলাবি রহ. ভারতের রামপুর অধিবাসী একজন গবেষক আলেম ছিলেন। আমার জানামতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সিরাতকে 'সৌর এবং চান্দ্র পঞ্জিকা' এবং 'নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা' দুটির মধ্যে প্রমাণাদির আলোকে এমনভাবে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন যে, এ ব্যাপারে কারো অস্বীকার করার সুযোগ রাখেননি। হাদিস ও সিরাতের সময়-নির্ধারণজনিত বহু সমস্যা তার নির্দেশিত পদ্ধতিতে সমাধান হয়ে যায়।

মাওলানা ইসহাক আলাবি রহ. এই কর্মটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ-দশকে সম্পাদন করেছেন। পরবর্তী দশকে আলি মুহাম্মদ খান রহ. এরই ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হন। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমিও 'তাকউয়িমে তারিখি' নামে অনেক ভালো একটি কাজ করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল একটি ভূমিকাও তিনি লিখেছেন। হিজরি ও ঈসাব্দ তারিখ বের করার জন্য আমি একাধিক সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়েছি। তদুপরি তাওকিত বা সময়-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়ার আশংকা রয়েই যায়, এখানেও আছে।

ইতিহাসের পরিচয়সংবলিত আমার রচিত একটি পুস্তিকা ভূমিকাস্বরূপ সংযুক্ত করেছি। এটি উল্লেখ করেছি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিষয়াদি এবং জরুরি মূলনীতিগুলো আয়ত্ত করার সুবিধার্থে। এতে করে ইতিহাস পড়া এবং বুঝা সহজ হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর উল্লেখ করার পর ইতিহাসের শিক্ষাও পেশ করেছি, যা সম্মানিত পাঠকের সামনে পুরো বইয়ের সারাংশ প্রমাণিত হবে।

এখানে আমার দোস্ত, আল-মানহালের ডাইরেক্টর মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ মাইমুন, মুফতি হামেদ আলি খোখর এবং ইদারাতুন নুর-এর ম্যানেজার মাওলানা মুহাম্মদ আলির শোকর আদায় না করলে বড়ই অকৃতজ্ঞতা হবে। তারা সার্বিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা এবং উৎসাহ দিয়ে এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এত বিশাল কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবাদি এক স্থানে জমা করা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কিছু স্নেহশীল এবং দরদি বন্ধু এ ব্যাপারেও অনেক সহায়তা করেছেন এবং কাঙ্ক্ষিত কিতাবাদির ব্যবস্থা

করে দিয়েছেন। যদি তাদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা না হতো, আমার নিকট এ পরিমাণ কিতাব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠতো না। পাণ্ডুলিপি সংশোধন, গবেষণা ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে মুফতি আবদুল খালেক (হাফিজাহুল্লাহ) অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তার শান মোতাবেক উত্তম জাযা প্রদান করুন।

'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' কাজের সূচনা হয়েছিল ২০১১ সালের শুরুর দিকে এবং এক বছরেই তা সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার পুনঃনিরীক্ষণ, সংশোধন, সংযোজন, টীকা সংযুক্তি, প্রুফরিডিংয়ের কাজ ২০১৭ সালের শেষ পর্যন্ত চালু থাকে।

আল-মানহাল, যারা এই কর্মটি প্রকাশের সংকল্প করেছে, ইসলামি ইতিহাসের গবেষণা-পরিপন্থি কথাবার্তা থেকে মুক্ত করে সহজ, সাবলীল এবং চিত্তাকর্ষক করে সর্বশ্রেণির পাঠকদের সামনে পরিবেশন করতে চাচ্ছিল। পাঠকদের নিকট অনুরোধ থাকবে, তারা যেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, আল্লাহর নিকট এই কাজের কবুলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা, প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষ, কর্ণধার এবং সহযোগী-সকলের সুস্বাস্থ্য এবং উক্ত কাজের পূর্ণতার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। আর ওলামায়ে কেরামের নিকট দরখাস্ত থাকবে, অসাবধানতাবশত কোনো ভুল কিংবা তাহকিকি অক্ষমতা দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন, যেকোনো পরামর্শ আমাকে ই-মেইল মারফত অবগত করলে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
rehanbhai@gmail.com
৭ জুমাদাল উলা, ১৪৩৯
২৫ জানুয়ারি, ২০১৮

তথ্যসূত্রগ্রন্থের ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা

১. অনেক জায়গায় একসঙ্গে একাধিক কিতাবের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। এটা সাধারণত এ কারণে হয়েছে যে, পাঠকদের কাছে উল্লিখিত যে সূত্রগ্রন্থটি রয়েছে, তাতেই প্রদত্ত তথ্যটি দেখে নিতে পারেন। কখনো-বা উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি ঘটনার অংশবিশেষ একাধিক সূত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাই কোনো অনুসন্ধানী পাঠক পর্যালোচনা করতে গেলে একটি সূত্রে আমাদের আঙ্গিকে পূর্ণ ঘটনা না পেয়ে পেরেশান হতে পারেন। ইনশাআল্লাহ উল্লিখিত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করলে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাবেন।

২. সূত্রগ্রন্থের ক্ষেত্রে নতুন তাহকিককৃত এবং বহুল প্রচলিত কপি থেকে রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিতাবের শেষে 'সূত্রগ্রন্থ'সূচি থেকে জানা যাবে আমরা কোন প্রকাশনীর কপি ব্যবহার করেছি। পাঠক যদি ঐ কপিটি দেখেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার তথ্যটি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, কখনো একই প্রকাশনীর নতুন সংস্করণে দুই চার পৃষ্ঠা এদিক-ওদিক হয়। তাই পাঠক তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যের জন্য উল্লিখিত পৃষ্ঠায় না পেলে আগ-পিছের দু-চার পৃষ্ঠা দেখে নেবেন।

৩. যদি সংস্করণ কপির ভিন্নতার কারণে কোনো ঘটনার উদ্ধৃত সূত্রের পৃষ্ঠা ও খণ্ডের সাথে না মেলে, তা হলে অধিকাংশ ইতিহাসের কিতাবে সেই ঘটনাটি হিজরিসন হিসেবে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। কিংবা হুকুমত ও শাসকদের অধীন আলোচনায় অনুসন্ধান করলে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

ইতিহাস কী?

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ইসলামপূর্ব ইতিহাস

ইতিহাস কী?

ইতিহাসশাস্ত্রের প্রাথমিক আলোচনাসংবলিত একটি
সংক্ষিপ্ত ও উপকারী পুস্তিকা

ইতিহাসশাস্ত্রের পরিচয়

যে শাস্ত্রে জমানার ঘটনা-দুর্ঘটনাসমূহ সময়ের বিন্যাস অনুযায়ী আলোচনা করা হয় এবং দেশ, জাতি, বাদশাহ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে ইতিহাস বলে।

ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী ঘটনাবলি থেকে উপদেশ গ্রহণ করা এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। অতীত-অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান-ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ে সহযোগিতা গ্রহণ করা।

পৃথিবীর যেকোনো জাতি উচ্চমর্যাদা হাসিল করার স্বপ্ন দেখে, তাদের অবশ্যই নিজেদের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করা আবশ্যক। যে জাতি নিজেদের ইতিহাস ভুলে যায় এবং তা নিয়ে অবহেলা করে, তারা দুনিয়াতে উচ্চমর্যাদা হাসিল করবে দূরের কথা, তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়বে।

ইতিহাসের প্রাথমিক কথা

ইতিহাসের শাব্দিক অর্থ

আরবিভাষায় ইতিহাসকে তারিখ বলা হয়। আর তারিখের আভিধানিক অর্থ [الإعلام بالوقت] 'সময় বলে দেওয়া'।

আরবরা তাদের কথায় বলে থাকে [أَرَّخَ الكتابَ يأرَخُه أَرْخًا- إيرَاخًا وتارِيْخًا] অর্থাৎ পত্রলেখক তার পত্রে তারিখ লেখল। এটি বনু কায়সের ভাষা। বনু তামিমের ভাষায় 'হামযা'র স্থানে 'ওয়াও' ব্যবহৃত হবে।[২]

তারিখের পারিভাষিক অর্থ

তারিখের পারিভাষিক অর্থসম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. লেখেন,

إِخْبَارٌ عن الأَيَّام والدُّول والسَّوابق من القُرون الأُوَل

অতীতকাল, অতীত হুকুমত এবং অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া যুগের লোকেদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া।[৩]

ইতিহাসশাস্ত্রের পরিচয়

هو علم يُبحث فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما يَتعلَّق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته

এটি এমন ইলম, যার মধ্যে সময় নির্ধারণের সাথে সাথে সে সময়ের অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা করা হয়।[৪]

---

[২] আলই'লান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত তারিখ, সাখাবি, পৃষ্ঠা ১৪; আসসিহাহ তাজুল লুগাহ, আবু নসর আলজাওহারি: মাদ্দাহ أرخ: ১/৪১৮, দারুল ইলম সংস্করণ।

[৩] তারিখে ইবনে খালদুন : ১/৬; ভূমিকা, দারুল ফিকর সংস্করণ।

[৪] আলমুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ, কাফিজি, পৃষ্ঠা ৫৫

আল্লাম সাখাবি রহ. ইতিহাসের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন,

البحث عن وقائع الزمان بالتوقيت

সময়ের বিন্যাস এবং নির্ধারণের সঙ্গে সেই জমানার ঘটনাবলিও আলোচনা করা।[৫]

ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রের মাঝে ব্যবধান

আপনি তো নিশ্চয় জানেন যে, সাহিত্যের কিতাবাদিতেও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। হাদিসেও বহু ঘটনা উল্লেখ হয়। কিন্তু ঐগুলোকে তো ইতিহাসগ্রন্থ বলা হয় না। এর কারণ হলো, সাহিত্যের বইপত্রে ঘটনাবলি সময়ের বিন্যাস অনুযায়ী উল্লিখিত হয় না। অনেক জায়গায় তো ঘটনার মাস, বছরও উল্লেখ করা হয় না। সাহিত্যের ঘটনার দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে- পাঠক এর দ্বারা সবক হাসিল করবে। হাদিসে উল্লিখিত ঘটনাবলি ফিকহি আহকাম, সূক্ষ্মতত্ত্ব, সনদের দৃষ্টিকোণ কিংবা রাবিদের নামে সংকলিত হয়। যেমন হাদিসের কিতাবসমূহের প্রত্যেক সংকলকের সামনে তার গ্রন্থ সংকলনের পৃথক উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে।

ইতিহাস পৃথক একটি শাস্ত্র। এখানে ঘটনাকে এভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে, প্রথম সংঘটিত ঘটনা প্রথম আসবে, যা পরবর্তীতে ঘটেছে, তা পরে উল্লেখ হবে। অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের পদ্ধতি হলো এমন যে, প্রথম হিজরির মহররম মাসের ঘটনাবলি উল্লেখ করার পর পর্যায়ক্রমে সফর, রবিউল আওয়াল, এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে পূর্ণ বছরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এরপর ২য় হিজরির ঘটনাবলি শুরু করা হয়। এই পদ্ধতিতেই একজন ইতিহাস-লেখক তার যুগ পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করতে থাকেন।

আলোচ্যবিষয়

ইতিহাসের প্রকৃত আলোচ্যবিষয় ও তথ্যাবলি একজন ঐতিহাসিকের যেসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তা-ই। অর্থাৎ জাতি, রাজ্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অবস্থা। আল্লামা সাখাবি রহ. একেই সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করেন-

[৫] আলই'লান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত তারিখ, সাখাবি, পৃষ্ঠা ১৭

موضوعه الإنسان والزَّمان

ইতিহাসের আলোচ্যবিষয় হলো 'মানুষ ও জমানা'।[৬]

অর্থাৎ কোন্ কোন্ যুগের মানুষের কী কী ঘটনা ও অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, একজন ইতিহাসবিদ সর্বদা এটা খোঁজ করতে থাকে। আর এটিই ইতিহাসের মূল আলোচ্যবিষয়। সকল আলোচনার ভিত্তি এটিই।

উপরন্তু এটা পরিষ্কার যে, ইতিহাসে সকল মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা হয় না। বরং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাদের আলোচনা করা হয়। এই নির্বাচন অলৌকিকভাবে সেসব ব্যক্তিরই হয়ে থাকে, যারা কোনো-না-কোনো দিক বিবেচনায় অনন্য, যাদের জীবনচরিত অন্যদের উপর প্রভাববিস্তারকারী, কিংবা যাদের জীবনীতে কোনো বিস্ময়কর কীর্তি রয়েছে, অথবা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ স্বাভাবিকত কোনো বড় পদধারী হয়ে থাকেন কিংবা পরবর্তীকালে কোনো পদে আসীন হন। তাই ইতিহাসে বাদশাহ, উজির, আমির, গোত্রপতি, আলেম, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনা অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। ফলে 'ইতিহাস মশহুর ব্যক্তিদের জীবনচরিত' - কথাটি তার আপন স্থানে একদম সঠিক।

ইতিহাসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রতিটি শাস্ত্রেরই কিছু উপকারিতা রয়েছে। তবে তার উপরকারিতার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। একে সামনে রেখেই মানুষ কোনো শাস্ত্রকে তার মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারে। তদ্রূপ ইতিহাসপাঠ ও পাঠদানের দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে।

১. মানুষ ও জমানা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

২. জাতির ঘটনা, গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা এবং তাকে স্থায়ী রাখা।[৭]

---

[৬] আলই'লান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত তারিখ, সাখাবি, পৃষ্ঠা ১৭

[৭] জাতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাদের আখলাক-চরিত্র, আদব-শিষ্টাচার, সামাজিক আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, অতীতের সাথে সম্পর্ক তৈরি ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

এই দুটি উদ্দেশ্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো মুসলমান এটি দেখার পর তার ইতিহাসের ব্যাপারে গাফেল থাকা শোভন মনে হবে না। বিশেষ করে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি চোখের সামনে রাখলে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম মনে হবে।[৮]

[৮] আল্লামা সাখাবি রহ. ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্বের বিষয়ে পঁচিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনুসন্ধানী পাঠকদের জন্য এই আলোচনাটি পড়া উচিত। আমরা তার সেই দীর্ঘ আলোচনাকে সারসংক্ষেপ হিসেবে দুটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছি।

ইতিহাসের ইতিহাস

প্রাচীন রোম, গ্রিক, চিন, শাম, মিসর এবং ভারতীয় সভ্যতায় ইতিহাসের প্রাথমিক রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনযুগের মানুষেরা যদিও লিখতে-পড়তে জানত না, তদুপরি তারা পূর্ববর্তী লোক, বিশেষ করে তাদের পিতৃপুরুষের গল্প শোনার জন্য উদগ্রীব ছিল। মায়েরা তাদের বাচ্চাদের পূববর্তী যুগের বাহাদুর ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের ঘটনা শুনিয়ে তরবিয়ত দিতেন। জাতি কিংবা কবিলার ইতিহাস সংরক্ষণের একটি প্রসিদ্ধ তরিকা ছিল কবিতা ও কাব্যচর্চা। কবি ও কবিতা এবং সাধারণ আসরগুলোতে পুরোনো গল্পসমূহ কাব্যাকারে পেশ করা হতো। আর ধীশক্তিসম্পন্ন লোকেরা সেগুলো মুখস্থ করে নিত। এই কাব্যগুলো বংশপরম্পরায় চলতে থাকত। সাধারণত এই কাব্যচর্চা রণোদ্দীপক হতো অর্থাৎ তাতে কওমের বাহাদুরদের অবদান ও কীর্তি বর্ণনা করা হতো। চিন, আর্য এবং আরব ইতিহাসের প্রাচীন কাব্যগুলোতে এই চিত্রই লক্ষ করা যায়। আজও বেদুইন কবিলা এবং অনুন্নত এলাকাগুলোতে এই পদ্ধতি চালু আছে।

জ্ঞানচর্চা যখন কিছুটা অগ্রগতি লাভ করে, তখন সভ্য এবং উন্নত রাজ্যসমূহে শাসকদের নির্দেশে কিছু কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ধর্মীয় কিতাব এবং আসমানি সহিফাসমূহেও কিছু জাতির আংশিক অবস্থা সংরক্ষিত আছে।

কবিতা ছাড়া সেই ঐতিহাসিকসূত্রের মধ্যে বাইবেলের নতুন-পুরাতন সংস্করণ, ভগবত গীতা, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ছিল। এইসব সূত্রগ্রন্থে বিকৃতি থাকা সত্ত্বেও এগুলো প্রাচীনযুগের অবস্থা সম্পর্কে জানার মৌলিক সূত্রগ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

ঐ যুগকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসগবেষণাযুগ হিসেবে সাব্যস্ত করি না। কিন্তু সে যুগের সূত্রগ্রন্থসমূহ পরবর্তীযুগে এসে অনেক গুরুত্ব লাভ

করে। কারণ, প্রাচীন যুগের মানুষের অবস্থা জানার মাধ্যম ঐগুলো ছাড়া আর নেই।

রোম ও গ্রিক ইতিহাসে খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশ বছর এবং তার পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলি সংরক্ষিত আছে বলে দাবি করা হয়। কারণ, এই যুগটা ছিল গ্রিক পণ্ডিত সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুগ। তখন ইউরোপে জ্ঞানচর্চা চালু হয়ে গিয়েছিল। এজন্য গ্রেট সিকান্দার এবং হ্যানিপলের মতো বিখ্যাত বাদশাহদের জীবনীর একটি বড় অংশ সংরক্ষিত হয়। এটা ভিন্ন কথা যে, এগুলোতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিক সনদ নেই। ইউরোপে ইতিহাস-রচনার এই উন্নতির পরেও বহুদিন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশ বছর ভারতীয় ইতিহাসেও অন্ধকার দৃশ্যমান হয়। অশোকা, গৌতম বুদ্ধ, মহান কানিশকা সংশ্লিষ্ট কাব্য ও বীরত্বগাথার ইতিহাস ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না।

ইতিহাস রচনা যখন একধাপ অগ্রসর হয়, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘটনা লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তিদের উদ্ভব হয়। ঘটনা লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তি হিসেবে সেসব সংবাদদাতা কিংবা মুনশিই নির্বাচিত হতো, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লিখে শাসকদের কাছে পাঠাত। তাদের সেই সংরক্ষিত দিনলিপিগুলো ঐতিহাসিকদের জন্য অতীতের ঘটনা সংকলনের ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করে।

পঞ্জিকা

কোনো ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার সময় মনে রাখার সাধারণ পদ্ধতি এটাই যে, তাকে এমন কোনো বড় ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা, যার সম্পর্কে সকলেই অবগত। যেমন : কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির জন্ম ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে, আর সে একশ'র উর্ধ্বে গুনতেও পারে না। ফলে সে তার জন্মসন মনে রাখতে পারে না। তবে তার জন্মসন সম্পর্কে এটা বলতে পারে যে, পূর্বপাকিস্তান ভাগ হওয়ার একমাস পূর্বে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। প্রাচীনযুগে সাধারণ-বিশেষ সকলের মধ্যেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। সে সময় পঞ্জিকার (ক্যালেন্ডার) কোনো রেওয়াজ ছিল না। লোকেরা তখন প্রসিদ্ধ ঘটনার মাধ্যমেই তারিখের অনুমান করত।

আল্লামা সুয়ূতি রহ. বলেন, প্রথমে মানুষ হজরত আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়াতে আগমনের সময়কাল থেকে তারিখ গণনা করত। যখন নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন জীবিত ব্যক্তিরা ঐ প্লাবন থেকে তারিখ গণনা শুরু করে।

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের বংশধররা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকেই যার যার মতো করে তারিখ স্মরণ রাখতে থাকে। আরবদেশে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আগুনে নিক্ষেপের সময় থেকে তারিখ গণনা করা হয়। এরপর ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশধর (ইহুদিরা) বছর অনুমান করার জন্য এভাবে গোনে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম থেকে মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, এরপর মুসা থেকে সুলাইমান আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, এরপর সুলাইমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত। এভাবেই তারা হিসাব রাখতে থাকে।

ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর কাবাশরিফ নির্মাণের সময় থেকে তারিখ গণনা আরম্ভ করে। পরবর্তী লোকেরা কাব বিন লুওয়াইয়ের

অফাত থেকে নতুন হিসাব শুরু করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের কুরাইশরা হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছর থেকে বছর গণনা শুরু করে। পরবর্তীকালে মুসলমানরা নবীজির হিজরত থেকে হিজরিসনের হিসাব আরম্ভ করে।

অপরদিকে রোমানরা গ্রেট সিকান্দারের যুগ থেকে তারিখ গণনা করে। পারস্যবাসী তাদের প্রত্যেক বাদশাহর মসনদে আরোহণের সময় থেকে তারিখ হিসাব করে।[৯]

পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের সূচনা ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ দেয়। বিভিন্ন কওম ও হুকুমত বিভিন্ন সময়ে তাদের ক্যালেন্ডার চালু করে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করে কেবল দুটি ক্যালেন্ডার।

এক. ঈসায়ী বা গ্রেগরি ক্যালেন্ডার, যা খ্রিষ্টান পাদরি এবং শাসকরা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মসন থেকে প্রবর্তন করে। এটা সৌরপঞ্জিকা।

দুই. হিজরি পঞ্জিকা, যা মুসলমানরা নবীজির মদিনা হিজরত থেকে গণনা শুরু করে। এটার হিসাব চান্দ্রপঞ্জিকা অনুসারে।

আরবরা তাদের সহজতার জন্য চান্দ্রমাস মহররম, সফর, রবিউল আওয়াল ইত্যাদি নামে নির্বাচন করে। তবে কোনো বছর নির্দিষ্ট করে গণনা করা হতো না। বরং কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাকে মনে রাখা হতো। যেমন: অমুক যুদ্ধপরবর্তী মহররমে, অমুক চুক্তির আগের রমজান মাসে। এর মাধ্যমে তাদের সাদাসিধা নগর-জীবনের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যেত। অধিকাংশ লেনদেন মৌখিকভাবেই সম্পন্ন হতো। কাগজপত্র, চিরকুট এবং চিঠিপত্র তো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ রাখার প্রচলন ছিল না। এজন্য পৃথক পৃথক বছর গণনা করার সুযোগ হতো না। এই রেফারেন্সে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনো কোনো সংশয় সৃষ্টি হয়নি।

---

[৯] আশশামারিখ ফি ইলমিত তারিখ, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা ৭-১০ (মাকতাবাতুল আদাব সংস্করণ)

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে যখন আরবরা প্রথমবার পূর্বপশ্চিমের অঞ্চলগুলোর অধিপতি হয় এবং সরকারি খাতায় পত্রবাহক, রসিদ ও অন্যান্য কাগজপত্রে একই পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। তখন কোন্ লেখাটি কোন্ বছরের, তা নির্দিষ্ট করার জটিলতা দেখা দেয়।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রপ্রেরণ করেন যে, আপনার এমন কিছু পত্র হস্তগত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো তারিখ নেই। আপনি আপনার পত্রে কোনো তারিখ লিখে দেবেন।

রেওয়ায়েতে এসেছে, ইয়েমেন থেকে আগত এক ব্যক্তি উমর রা. কে পরামর্শ দেয় যে, ইয়েমেনিরা তাদের চিঠিপত্রে তারিখ লেখে, আপনিও এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।[১০]

এক বর্ণনায় আছে, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি পত্র আসে, যার মধ্যে শুধু শাবান লেখা ছিল। তখন তিনি বললেন, এটা কোন বছরের শাবান, তা কীভাবে জানবো?'

এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, মানুষের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিন, যেখান থেকে তারা সময় গণনা করবে।

কিছু সাহাবি বললেন, রোমানদের তারিখ নির্বাচন করা যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রোমানদের তারিখ গণনা অনেক দীর্ঘ। তারা সিকান্দার থেকে গণনা শুরু করে।

কেউ বলল, পারসিকদের তারিখ নির্বাচন করা যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারা তাদের বাদশাহদের গদিনশিন হওয়ার সময় থেকে তারিখ গণনা শুরু করে।[১১]

---

[১০] আশশামারিখ: পৃষ্ঠা ১৪, ১৫
[১১] আশশামারিখ: পৃষ্ঠা ১৭

অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়, একটি পৃথক পঞ্জিকা নির্ধারণ করা হবে। প্রশ্ন ওঠে কখন থেকে সময় গণনা করা হবে? তখন তিনটি মত সামনে আসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে, হিজরত থেকে, অফাত থেকে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন, 'হিজরত থেকেই পঞ্জিকার সূচনা হবে। কারণ এর মাধ্যমেই হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য চূড়ান্ত হয়।'[১২]

এই জায়গায় আল্লামা সুয়ুতি রহ. ইবনে শিহাব যুহরির সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখ করেন, যার থেকে জানা যায়, সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর বছরের গণনা হিজরত থেকেই শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩]

আল্লামা সুয়ুতি রহ. নবীজির একটি পত্রও উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নবীজির পক্ষ থেকে পঞ্চম হিজরি লেখা প্রমাণিত হয়।[১৪]

সুয়ুতি রহ. বলেন, এ থেকে বুঝা যায়, হিজরিসনের প্রথম প্রবর্তক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন।[১৫]

যখন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, ইসলামি তারিখ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের সময় শুরু হবে, তখন আরেকটি প্রশ্ন তৈরি হয় যে, কোন্ মাস থেকে বছর গণনা আরম্ভ হবে? যেহেতু রবিউল আওয়াল মাসে হিজরত হয়েছিল, তাই কোনো কোনো সাহাবি এই মাস থেকে হিজরিবর্ষ গণনার মত দেন। কেউ রমজানের ফজিলতের প্রতি লক্ষ করে তার নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মহররম মাসের অনেক ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে বলেন, 'মহররম থেকে পঞ্জিকা শুরু করা যায়। কেননা এটি সম্মানিত মাস। এটিই বছরের প্রথম মাস। এ মাসেই

---

[১২] দেখুন আশশামারিখ: পৃষ্ঠা ১১

[১৩] আশশামারিখ, পৃষ্ঠা ১৪

[১৪] আশশামারিখ, পৃষ্ঠা ১২, তারিখুত তাবারি- ২/২৮৮

[১৫] আশশামারিখ, পৃষ্ঠা ১২

লোকেরা হজ থেকে ফিরে আসে।' ফলে তার কথামতো সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, হিজরি বছর গণনা মহররম মাস থেকে আরম্ভ হবে। এই ঘটনা ১৭ কিংবা ১৮ হিজরিসনের।[১৬]

এটাই ছিল হিজরি পঞ্জিকার সূচনা, যা ইসলামি ইতিহাস রচয়িতাদের মৌলিক পথনির্দেশিকা।

আরবের ইতিহাসে মাস ও বছরের মাঝে ব্যবধান কেন?

ইসলামি ইতিহাসে মাস ও বছরের মাঝে কোনো কোনো সময় তারতম্য লক্ষ করা যায়। তার গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. রাবিগণ ঐ যুগের অনেক ঘটনার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।
২. কিছু কিছু জায়গায় একই ঘটনার তারিখের ক্ষেত্রে একাধিক বক্তব্য রয়েছে, যেগুলোর কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া অনেক মুশকিল। আর এই মতভিন্নতা মাস ও বছরেও দেখা দেয়।
৩. কিছু তারিখ প্রথম যুগের ঐতিহাসিকদের নিকট মশহুর (যেমন নবীজির জন্মতারিখ ১২ রবিউল আওয়াল), কিন্তু তা কোনোভাবেই পঞ্জিকার হিসাবের সঙ্গে মেলে না।
৪. একটি বড় কারণ হলো, মুশরিকদের দ্বারা চান্দ্রপঞ্জিকায় আগপিছ করা, যাকে কুরআন কারিমে 'নাসায়ি' বলে উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়েছে।[১৭] আর এ কারণেই নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকার বিপরীতে বিকৃত চান্দ্রসৌর পঞ্জিকা অস্তিত্ব লাভ করে।

নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা ও বিকৃত চান্দ্রসৌর পঞ্জিকা

মুশরিকরা সৌরপঞ্জিকার অনুকূল করার জন্য চান্দ্রপঞ্জিকা বিকৃত করে রেখেছিল, যাকে 'আননাসিয়ি' বলা হয়। আমরা জানি যে, চান্দ্রমাস সর্বদা এক মৌসুমে হয় না। প্রতিটি চান্দ্রমাসই ধীরে ধীরে (৩৩ চান্দ্রবর্ষে) ঠান্ডা, গরম, হেমন্ত এবং বসন্তকালে প্রদক্ষিণ করে থাকে। অপরদিকে সৌরমাস সর্বদা একই মৌসুমে হয় যেমন জানুয়ারি সর্বদা

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২
[১৭] সুরা তাওবা, আয়াত ৩৬, ৩৭

শীতে, মার্চ সর্বদা বসন্তে, জুন গ্রীষ্মে এবং অক্টোবর সর্বদা হেমন্তকালে আসে।

যদি চান্দ্রমাসকেও সেই একই মৌসুমে রাখতে হয়, তা হলে কিছু চান্দ্রবর্ষ তেরো মাস গণনা করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। কারণ, চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ থেকে প্রায় এগারো দিন কম হয়ে থাকে। এজন্য উভয় বর্ষকে সমান করার জন্য সর্বোচ্চ তিন বছর পরপর এবং কখনো-বা দুই বছর পরপর তেরোতম মাস সংযুক্ত করা হতো। এটা পরিষ্কার যে, যখন তেরোতম মাস বৃদ্ধি করা হবে, তখন নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকার মাস আপন স্থানে বহাল থাকবে না।

মুশরিকরা নবীজির হিজরতপূর্ব ২২০ বছর থেকে নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকার মধ্যে এই বিকৃতি সাধন করেছিল। কারণ, হজ ছিল তাদের একটি বড় ব্যবসার মৌসুম। এই সময় তাদের বড় বড় বাণিজ্যমেলা জমতো। কিন্তু তারা দেখল হজ কখনো আসে গ্রীষ্মকালে, কখনো বা শীতে। যার ফলে খেজুর এবং ভেড়া-বকরির ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন না ফসল পাকে, না ভেড়া-বকরির বাচ্চা প্রজননের জন্য তৈরি থাকে। এমন মুহূর্তে হজের মৌসুম এসে পড়লে সবকিছু ত্যাগ করে হজের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। হজ সর্বদা গ্রীষ্মকালে হওয়ার মধ্যেই মুশরিকরা তাদের ব্যবসায়িক ফায়দা নিশ্চিত করে। তাই বনু কিনানার এক সরদার কালাম্মাস (قَلَمَّس) হজের মাসকে একটি বিশেষ মৌসুমে তথা গরমকালে নির্দিষ্ট করার জন্য 'আননাসিয়ি' তথা বিলম্ববর্ষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে।[১৮] এর ফলে

---

[১৮] তাফসিরে রাজি: ১৬/৪০, ৪১ (দারু ইহয়াউত তুরাস আলআরাবি, আত-তাহরির ওয়াত তানবির, শায়েখ মুহাম্মদ বিন তাহির আলআশুর: ১০/১৯১ (তিউনিসিয়া সংস্করণ)

আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালাবি রহ. লেখেন,

لأن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون الحج في كل عام أحد عشر يوما حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته (السيرة الحلبية: ٣٦٠/٣، طبعة دار الكتب العلمية)

আল্লামা সুহাইলি রহ. লেখেন,

فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوما أو أكثر حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقته (الروض الأنف: ١٣٩/١، دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق عمر عبد السلام سلامي)

চান্দ্রমাস কৃত্রিমভাবে সৌরমাসের বরাবর হয়ে যায়। প্রতিবছর মহররম হয় সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের শুরুতে। রমজান প্রতিবছর মে-জুনে এবং হজ গরম মৌসুমের শেষ মাস আগস্টে আসে, যখন উৎপাদিত ফসল কেনাবেচার পূর্ণ উপযোগী হয়ে যায়।[১৯]

কিনানা গোত্রের সরদারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়—তারা প্রয়োজনমাফিক তেরোতম মাস বৃদ্ধি করবে। এই কবিলার সরদার প্রতিবছর হজের ময়দানে ঘোষণা দিয়ে দিত, আগামী বছর হজ বারোতম মাসে হবে নাকি তেরোতম মাসে। আর এই অতিরিক্ত মাসটি কোন মাসের সঙ্গে বাড়ানো হবে সেটাও সবাইকে বলে দিত।[২০]

একাধিক মুফাসসিরও একই কথা বলেছেন। [তাফসিরে আবদুর রাযযাক, সুরা তাওবা, ২/১৪৯, দারুল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ, তাফসিরে তাবারি- ১১/৪৫৪, দারু হিজর সংস্করণ, তাফসিরে সাআলিবি: ৫/৪৪, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি সংস্করণ]
ইউরোপে একে লিপ-ইয়ার বলে অভিহিত করা হয়। লিপ-ইয়ারে প্রতি চার বছর পর এপ্রিলের শেষে একদিন তথা ২৯ এপ্রিলকে বৃদ্ধি করা হবে। হিন্দুস্থানের বিক্রমী হিসাবেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তারা একে 'লোন্ড' নামে ব্যক্ত করে। প্রয়োজন অনুপাতে প্রতিমাসে একটু একটু করে সময় বাড়ানো হয়। যেমন: আষাঢ়ের সাথে অতিরিক্ত এক মাস যোগ করে তাকে 'দোষাঢ়' বলে। পরের বার বৈশাখের সাথে অতিরিক্ত এক মাস যোগ করে তাকে 'দোশাখ' নাম দেওয়া হয়। প্রয়োজনমতো বারবার প্রতিটি মাসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। যেমন একবার শরতের সঙ্গে মিলিয়ে একমাস বৃদ্ধি করে তাকে দোশরত বলা হয়। পরের বার বৈশাখের সঙ্গে এক মাস বৃদ্ধি করে দোবৈশাখ বলা হয়ে থাকে। (তাকউয়িমে তারিখি, হাশেমি, পৃষ্ঠা ১৮)

১৯ দেখুন: মাওলানা ইসহাকুন নবী আলাবি রহ. এর প্রবন্ধ: 'সিরাতুন নবী তাওকিত কি রুশনি মে'। (নুকুশ: রাসুল, নম্বর, দ্বিতীয় ভলিয়ম, ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ)।
আমি (লেখক) তার গবেষণা-প্রবন্ধটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং দীর্ঘ পর্যালোচনার পর তার বক্তব্য সঠিক মনে হয়েছে। অপরদিকে কিছু সিরাতগবেষকের ধারণা হলো, মক্কিপঞ্জিকা বসন্ত মৌসুমে আরম্ভ হতো, তা আমার নিকট আদৌ সহিহ মনে হয় না। তবে আরবের মধ্যে 'চান্দ্রসৌর বসন্ত পঞ্জিকা' নামে একটি ক্যালেন্ডার অবশ্যই ছিল, রবিউল আওয়াল থেকে তা আরম্ভ হতো। কিন্তু এর প্রচলন কম ছিল। মক্কিপঞ্জিকা হেমন্তকাল থেকেই শুরু হতো।

২০ সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৪। কালাম্মাসের পর এই দায়িত্ব পালনকারী সকল সরদারকে 'কালাম্মাস' বলে অভিহিত করা হয়। আর এটি একটি দায়িত্বে পরিণত হয়, যা ইতিহাস সংকলনে 'কাল্লামাসাহ' নামে পাওয়া যায়। (আররাওযুল উনুফ- ১/১৩৯)

সাধারণত কিছু চান্দ্রমাসের নাম ঐ নতুন সময়ের মৌসুম অনুপাতেই রাখা হয়। প্রতিবছর জুমাদাল উলা এবং জুমাদাল আখিরা শীতকালে আসত। এই নামগুলোর মূলধাতু হলো 'جَمَد', যার অর্থ জমাটবদ্ধতা। এটাই তার মৌসুমের দিকে ইঙ্গিত করে। রমজান 'رَمَض' ধাতুমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ উত্তাপ। তাকে এই নামকরণের কারণ হচ্ছে, এ মাসটি গ্রীষ্মকালে আগমন করত।[২১]

আরবরা 'আশহুরে হুরুম' তথা নিষিদ্ধ মাসগুলো খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতো। রজব, যিলকদ, যিলহজ এবং মহররম এই চার মাসকে তারা নিষিদ্ধ মাস হিসেবে স্বীকৃত দিত। হজের মাস পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার দরুন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উক্ত চারমাসেও রদবদল হতো। ফলে হজের ময়দানেই ঘোষণা করে দেওয়া হতো আগামী বছর অমুক অমুক মাস 'আশহুরে হুরুম' তথা নিষিদ্ধ মাস গণ্য হবে। এতে করে 'আননাসিয়ি'তে এই দুটিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১. হজের সময়ে বিকৃতি। ২. আশহুরে হুরুমে বিকৃতি।[২২]

নোট : 'আননাসিয়ি' বিষয়ে বোদ্ধা পাঠকগণ ডক্টর জাওয়াদ আলির গ্রন্থ 'المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام' অবশ্যই অধ্যয়ন করবেন।

২১.

لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافقت هذا الشهر أيام رمض الحر، فسُمِّي بذلك (الصحاح تاج اللغة للجوهري: ١٠٨١/٣)
وجُمَادى من أسماء الشهور سميت بذلك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور (لسان العرب: ١٣٠/٣)

এর থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে, চান্দ্রমাসগুলোর নাম প্রাচীন আরবে ভিন্ন ছিল। ইমাম আবু মানসুর হারাবি (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি) এটি সুস্পষ্টভাবে লেখেন,
"كانت العرب تسمي جُمادى الآخرة: رُنَّى، وذا القعدة: وَرَنَة، وذا الحجة: بُرَك (تهذيب اللغة: ١٩١/١٥)

২২

فكان على ضربين: أحدهما: تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثارات، والثاني تأخيرهم عن وقته (الروض الأنف: ١٣٩/١)

নোট : সাধারণত মুফাসসিরগণ 'আননাসিয়ি'কে আশহুরে হুরুমের বিকৃতি সাধনকেই বুঝাতেন। আরবদের নিকট এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম ছিল। যেহেতু তারা এ সময় যুদ্ধ পরিহার করতে পারত না, তাই তারা সেই নিষিদ্ধ মাসসমূহকে আগ-পিছ

উক্ত বিকৃতির ফলে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে যে পঞ্জিকার প্রচলন ছিল, তা নিরেট চান্দ্রমাস থাকেনি, বরং সৌরমাসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে মদিনা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী আরব কবিলাসমূহে কোনোরকম বিদ্যমান থাকে শুধু চন্দ্রপঞ্জিকা। এর ফলে আরবের মধ্যে একই সময়ে চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা (মক্কি পঞ্জিকা) এবং নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা (মাদানি পঞ্জিকা) উভয়টিরই প্রচলন অব্যাহত থাকে।[২৩]

এ দুটি ছাড়া আরবে আরেকটি চান্দ্রপঞ্জিকা চালু ছিল, যা বসন্তকাল থেকে আরম্ভ হতো। তবে তার ব্যবহার খুব কম ছিল। আমরা একে 'চান্দ্রসৌর বসন্ত পঞ্জিকা' বলতে পারি।[২৪]

করত। যেমন: যখন তাদের মহররম মাসে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতো, তারা বলত এ বছর মহররম রবিউল আউয়াল মাসের স্থানে হবে, এরপরই তারা যুদ্ধে লেগে পড়ত। এই ব্যাখ্যা ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। [সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৪, আলবাবি আলহালাবি সংস্করণ]

অনেক মুফাসসির উক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন। অথচ ইবনে ইসহাকের কারণে এই রেওয়ায়েতের সনদ যয়িফ এবং নিম্নোক্ত সহিহ রেওয়ায়েতের পরিপন্থি।

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت العرب يجعلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في ستة وعشرين سنة مرة، وهو النسيء الذي ذكره الله عزوجل في كتابه (المعجم الأوسط للطبراني: رقم الحديث: ٢٩٠٩، طبعة دار الحرمين)

(অর্থাৎ আরবরা কোনো বছর এক মাস কোনো বছর দুই মাস বৃদ্ধি করত, ছত্রিশ বছরে কেবল একবারই সময়মতো হজ আদায় করতে পারত। আর এটাকেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 'আননাসিয়ি' বলে অভিহিত করেছেন।) - আলমু'জামুল আওসাত, তাবারানি: হাদিস নং ২৯০৯, দারুল হারামাইন সংস্করণ।

তা ছাড়া পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ 'يُحِلُّوْنه عامًا وَيُحَرِّمُونه عامًا ' এর মর্ম হলো, কুরাইশদের বিকৃতির কারণে নিষিদ্ধ মাস কোনো বছর হালাল এবং কোনো বছর হারাম মাসসমূহে ঢুকে পড়ত। এবার যখন কিছু কবিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হতো, অথচ তা নিষিদ্ধ মাস, তখন আপত্তি পেশকারীদের সামনে ব্যাখ্যা দেওয়া হতো যে, তোমরা যে মাস নিষিদ্ধ মনে করছ, তা যদিও নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা অনুযায়ী হারাম; কিন্তু মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক এটি তো হালাল মাস। তাই এই মাসে যুদ্ধ করতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

[২৩] তাকউয়িমে তারিখি, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমি, পৃষ্ঠা ১৮ (ইদারাতে তাহকিকাতে ইসলামিয়্যাহ, ইসলামাবাদ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ সংস্করণ)

[২৪] তাকউয়িমে আহদে নববি, আলি মুহাম্মদ খান, পৃষ্ঠা ১২

তবে 'চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা' (মক্কিপঞ্জিকা) ৩৩ বছর প্রদক্ষিণ করে একবার 'নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা' (মাদানিপঞ্জিকা) এর বরাবর হয়ে যায়। এ সময় 'নিরেট চান্দ্রবর্ষ' পরিপূর্ণ গায়েব হয়ে যেত। তাই ইসলামের যখন প্রভাব বৃদ্ধি পেল, বিদায় হজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আননাসিয়ি'পদ্ধতি চিরদিনের জন্য বিলুপ্তির ঘোষণা দেন।[২৫] এরপর

---

[২৫] সেই স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض

নিশ্চয় জমানা প্রদক্ষিণ করে সে অবস্থায় ফিরে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। [সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাফসির ,বাবু কাওলিহি: ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি, হাদিস নং ৪৬৬২, তাওকুন নাজাহ সংস্করণ]

উপরোক্ত হাদিস থেকে একাধিক হাদিসব্যাখ্যাকার বুঝেছেন যে, বিদায়হজের মধ্যে নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা এবং চান্দ্রসৌরপঞ্জিকা একীভূত হওয়ার দিকেই হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এটি সঠিক নয়। গাণিতিক নিয়ম ছাড়াও বিভিন্ন প্রমাণ বলে যে, বিদায়হজ মক্কিপঞ্জিকা মোতাবেক জুমাদাল আখেরায় হয়েছে। কারণ, খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী তখন মার্চ মাস ছিল। আর মক্কিপঞ্জিকায় চান্দ্রবর্ষ কৃত্রিমভাবে সৌরবর্ষ মোতাবেক চলত। সে হিসেবে মহররম মাস সাধারণত সেপ্টেম্বরের শেষদিকে কিংবা অক্টোবরের শুরুদিকে আসত, যিলহজ আসত আগস্টের শেষদিকে। যেহেতু বিদায় হজ নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা মোতাবেক যিলহজ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর তা সর্বসম্মতিক্রমে খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস ছিল, ফলে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে আরম্ভ হওয়া মক্কিপঞ্জিকার ছ'মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এটি ছিল তার ষষ্ঠ মাস অর্থাৎ জুমাদাল আখিরাহ। কারণ মক্কিপঞ্জিকায় এই মাসটি সাধারণত মার্চ মাসে আসত। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদিসের সহিহ মর্ম হবে তাই, যা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. লিখেছেন,

والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنار

জমানা প্রদক্ষিণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ৯ই যিলহজ ঐ সময়ে উপনিত হয়েছে যখন সূর্য বুর্জুল হামল- এ ছিল, সেখানে রাতদিন সমান থাকে। [ফাতহুল বারি- ৮/৩২৪]

ইবনে হাজার রহ. এর উক্ত ব্যাখ্যাকে আরো পরিষ্কার করার জন্য আমরা মাওলানা ইসহাকুন নবী আলাবির বক্তব্য পেশ করছি। তিনি লেখেন, 'আমরা ক্যালেন্ডার সামনে রেখে চান্দ্রবর্ষের মহররম মাসটি দেখি, ঐ বছর ২৯ মার্চ তথা স্বাভাবিক বসন্ত মৌসুমের সাথে সাথেই আরম্ভ হয়ে যায়। এটি স্বীকৃত কথা যে, প্রাচীন বাবেলবাসী ও ইরানিরা, সম্ভবত দক্ষিণ আরবের অধিবাসীরা এবং হিন্দুস্থানের সকল অধিবাসী স্বাভাবিক বসন্ত মৌসুম থেকেই বছর গণনা শুরু করত, যা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে চালু রয়েছে। ইহুদিধর্মে বাৎসরিক ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস 'নায়সান'ও উক্ত মৌসুমেই শুরু হয়ে থাকে। প্রবল ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন

আরবের মধ্যে পুনরায় 'নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা'র প্রচলন শুরু হয়, যা আজও বিদ্যমান।

মোটকথা, মধ্যবর্তী সময়ে (যখন 'আননাসিয়ির' বিকৃতি চলছিল) তারিখ নির্ধারণ এজন্য দুষ্কর ছিল, প্রাচীন রাবিগণ সিরাতের ঘটনাবলি কোথাও মক্কিপঞ্জিকা, কোথাও মাদানিপঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ণনা করত। এ কারণে সাধারণভাবে সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা মুশকিল হয়ে যেত। সিরাতুন-নবীর তারিখের মধ্যে মতভিন্নতার অন্যতম কারণ এটি।

আরবদের মাঝেও এক বর্ষ স্বাভাবিক বসন্ত মৌসুম থেকে বছর গণনা করা হতো যখন সূর্য বুর্জুল হামলে থাকে। কেননা আরবদের ধারণা ছিল, পৃথিবীর অস্তিত্বও ঠিক এই স্বাভাবিক বসন্ত মৌসুমেই হয়েছে।
ইবনে কুতাইবা বলেন, 'এবং বলে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি বস্তুকে ঐ সময়ে সৃষ্টি করেছেন, যখন সূর্য বুর্জুল হামলে ছিল এবং জমানাও তখন মাঝামাঝি অবস্থায় ও রাতদিন বরাবর ছিল।' [সিরাতুন-নবী তাওকিত কি রুশনি মে, নুকুশ, রাসুল নম্বর, ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ ২/২০০]
উপরোক্ত হাদিসের আরেকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করছি, যা প্রথমোক্ত (ইবনে হাজারের) মর্ম পরিপন্থি নয়, তবে অনেক সহজবোধ্য:

إن الزمان قد استدار، يعني أمر الله تعالى أن يكون ذو الحجة في هذا الوقت فاحفظوه، واجعلوا الحج في هذا الوقت، ولا تبدلوا شهرا بشهر كعادة أهل الجاهلية

জমানা প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন যে, যিলহজ এ সময়েই হবে, তোমরা তা মনে রাখবে, আর হজও এই সময়েই পালন করবে। জাহেলিযুগের লোকদের মতো তোমরা এক মাসকে অন্য মাসের দ্বারা পরিবর্তন করবে না। [আওনুল মা'বুদ শারহু সুনানি আবু দাউদ মাআ হাশিয়াতি ইবনিল কাইয়িম: ৫/২৯৪]
উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, এখানে নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা আরবদের 'বসন্তকালীন পঞ্জিকা'র সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। আলি মুহাম্মদ খানের গবেষণাও হলো নিরেট চান্দ্রপঞ্জিকা আরবদের 'বসন্তকালীন পঞ্জিকা'র সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। [তাকউয়িমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ১৪]
গভীরভাবে ফিকির করলেও এটি সঠিক মনে হয়। কারণ, বিদায় হজ বসন্ত মৌসুমেই পালিত হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হাদিসের জুমহুর ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যও আপন স্থানে সঠিক হবে।

ইতিহাস-লেখকদের চার স্তর

যেকোনো ভবনের পূর্ণতার কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে পরিকল্পনা মোতাবেক ভিত্তি খনন করা, এরপর পর্যায়ক্রমে দেয়াল, ছাদ ও প্লাস্টার করা, এখানে-সেখানে লেগে থাকা সিমেন্ট ও কংক্রিট পরিষ্কার করে রঙ-পালিশ করা, পাখা, বাতি ও স্যানিটারির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভবনকে বসবাসের উপযোগী করে তোলা হয়।

যেকোনো জ্ঞান ও শাস্ত্র অনুরূপ চারটি স্তর অতিক্রম করার পর তা পূর্ণতা লাভ করে।

১. তাসিস তথা ভিত্তিস্থাপন করা।
২. তাদবিন অর্থাৎ তথ্য সঙ্কলন করা।
৩. তানকিহ ওয়া তাহজিব অর্থাৎ দুর্বল তথ্য বিলুপ্ত করে প্রামাণিক ও নির্ভুল তথ্য বিন্যস্ত করা।
৪. তাকমিল অর্থাৎ শাস্ত্রকে উত্তম ও সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা।

প্রথম ধাপকে মৌলিক স্তর বলা হয়। এটি ভিত্তিস্থাপনের সমপর্যায়ে। এ স্তরে কিছু ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করে তার একটি খসড়া নকশা তৈরি করেন। এমন কিছু শাস্ত্রীয় সীমারেখার মধ্যে শাস্ত্রকে সীমাবদ্ধ করেন, যার ফলে অন্য শাস্ত্র থেকে তাকে পৃথক করা যায়।

দ্বিতীয় ধাপ হলো তাদবিন তথা তথ্য সঙ্কলন করা। এটি ভবনের দেয়াল ও ছাদ তৈরি করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ স্তরে শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়। এর পাশাপাশি শাস্ত্রসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাথমিক ও খসড়া আকারে সঙ্কলন করা হয়।

তৃতীয় ধাপ হলো তানকিহ ওয়া তাহজিব তথা দুর্বল তথ্য বিলুপ্ত করে প্রামাণিক ও উত্তম তথ্য বিন্যস্ত করা। এটি ভবন প্লাস্টার এবং পরিষ্কার করার অনুরূপ। শাস্ত্রের তথ্যভাণ্ডার মজবুত ও সমৃদ্ধ করা, পূর্ববর্তী

সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া দুর্বল তথ্য এবং অসম্পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা এবং মতাদর্শ থেকে শাস্ত্রকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।

চতুর্থ ধাপ হলো তাকমিল, অর্থাৎ শাস্ত্রকে উত্তম এবং সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা। এটি ভবন নির্মাণের ফ্যান-বাতি তথা বসবাস সামগ্রী সংযুক্ত করা। এ পর্যায়ে এসে শাস্ত্রের শোভা বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন গবেষণা উঠে আসে, শাস্ত্রের প্রচার-প্রসার হয়।

যেহেতু এ স্তরের পর শাস্ত্রে তেমন অতিরিক্ত কাজ আর অবশিষ্ট থাকে না। তাই শাস্ত্রের উত্তরসূরিদের উপর তা সংরক্ষণ ও প্রসারই মৌলিক উদ্দেশ্য থাকে। উত্তরসূরিরা যদি শাস্ত্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকে, তাহলে শাস্ত্র বড় ধ্বংসের শিকার হবে। আর তাদের এ অসতর্কতায় শত্রুরা ফায়দা লুটবে, ভূত-প্রেত এসে বাসা বাঁধবে।

ইতিহাস রচনাও অনুরূপ কয়েকটি ধাপ ও পর্যায় অতিক্রম করেছে। এর ভিত্তি ইসলামি যুগের পূর্বেই রচিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস সঙ্কলনের ধারা শুরু হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ হিজরি শতাব্দী হলো ইতিহাস সঙ্কলনের যুগ। সপ্তম হিজরিতে এসে ইতিহাসের বিন্যাস ও পরিমার্জন শুরু হয়। আর তা-হাফেজ জাহাবি রহ. এর 'তারিখুল ইসলাম' এবং হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' সঙ্কলনের মাধ্যমে সূচিত হয়। কিন্তু পরিমার্জনে পরিপূর্ণতা আসেনি। অর্থাৎ দুর্বল তথ্য থেকে ইতিহাসকে পরিশুদ্ধ রাখা এবং ইতিহাসের সময়সংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলোর মাঝে গোলমেলে দূর করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ পরিশুদ্ধতার জায়গায় পরিমার্জনের দিকে অধিক মনোযোগী হন।

অষ্টম হিজরি শতাব্দীকে বলা হয় ইতিহাস পরিমার্জনের অগ্রগতির যুগ। কারণ, এ সময়েই তারিখে ইবনে খালদুন রচিত হয়। এরপর এই শাস্ত্র নিজেদের অযত্নের দরুন দৃশ্যপট থেকে আড়াল হয়ে যায়। তাই এখন প্রয়োজন ইতিহাসচর্চায় বিপ্লব ঘটানো, পূর্বসূরিদের মতো পুনরায় ইতিহাসের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা। মনোযোগ নিবদ্ধ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী সিরাতবিদ, ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং উসুলবিদগণ যে উসুল ও মূলনীতি প্রণয়ন করে গিয়েছেন, সেগুলোর

আলোকে অত্যন্ত সতর্কতা ও বলিষ্ঠতার সাথে ইতিহাসের ঘটনাবলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা।

এইসব বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সিরাত ও ইতিহাসকে কল্পকাহিনি আখ্যা দেব, ছড়ি নিয়ে প্রাচীন রাবি, মুহাদ্দিস ও সিরাতবিদদের পেছনে ধাওয়া করব, এবং যাদেরকে ইতিহাস ও রিজালশাস্ত্রজ্ঞ মনীষীরা জালিম, ফাসিক, পাপিষ্ঠ বলেছেন, তাদের জন্য 'হজরত', 'রাহিমাহুল্লাহ' বরং 'রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো সম্মানসূচক সম্বোধন ব্যবহার করব; আর যাদেরকে আকাবির-আসলাম আলেমগণ ইমাম ও হুজ্জত হিসাবে মান্য করেছেন, তাদেরকে মুনাফিক ও বদ্দীন সাব্যস্ত করে নিজেকে—ইতিহাসচর্চার নামে—চৌদ্দশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মুহাক্কিক ও গবেষক হিসেবে জাহির করবো।

ইতিহাসের ইসলামি যুগ

ইসলামের পূর্বে প্রতিটি কওমের ইতিহাস কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা এবং অতিরঞ্জন ও মনগড়া-বানোয়াট বিষয়াদিতে ভরা ছিল। ইতিহাস যাচাই করার কোনো নিয়ম-নীতি ছিল না। মানুষ যা ইচ্ছা ইতিহাসের নামে, তা-ই ছড়িয়ে দিত। মুসলমানরা এর মূলনীতি নির্ধারণ করে তাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্রে রূপ দান করে। বর্তমান যুগে কোনো জাতির কোনো ইতিহাস-গবেষকের মধ্যে আমানত ও দীনদারি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা সেইসব মূলনীতি অনুসরণের বদৌলতেই, যার উদ্ভব ঘটেছে মুসলিম ইতিহাসবিৎদের হাত ধরে। এজন্য 'শাস্ত্রীয় ইতিহাসচর্চার সূচনা মুসলমানদের হাতে হয়েছে' বললে অমূলক হবে না।

ইতিহাসচর্চার দুটি মৌলিক বিষয়

ইসলামি ইতিহাসচর্চার মৌলিক বিষয় দুটি : এক. সিরাত। দুই. রিজালশাস্ত্র। দুটি শাস্ত্রেরই ইলমে হাদিসের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সিরাতচর্চা হাদিসশাস্ত্রের একটি অভ্যন্তরীণ শাখা ছিল, যাকে সিয়ার ও মাগাজি বলা হতো। কিন্তু সিরাতবিদগণ তার মধ্যে ব্যাপ্তি এনে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত করেন। হাদিস ও ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য রিজালশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, যার ফলে রাবিদের অবস্থাও লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আমরা উভয় শাস্ত্রের পৃথক পৃথক পরিচয় তুলে ধরবো।

সিরাতশাস্ত্র

ইসলামি ইতিহাসের ভিত্তি হলো সিরাতচর্চা। প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলমানরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এবং কথামালা বড় ভক্তি মহব্বত ও সতর্কতার সাথে সংকলন করেন, যা হাদিসের ভাণ্ডারে বিদ্যমান রয়েছে। হাদিসের উক্ত ভাণ্ডারেরই একটি অংশকে সিয়ার ও মাগাজি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাজওয়া, সারিয়া, যুদ্ধ, দাওয়াত এবং রাজনৈতিক সফরসমূহ উল্লেখ হয়েছে। এটাকে আনুষঙ্গিক মর্যাদা

দেওয়ার কারণ হলো, মুহাদ্দিসদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঐসব হাদিস জমা করা, যার মাধ্যমে আকিদা-বিশ্বাস, আমল সংক্রান্ত মাসআলার সমাধান হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কতিপয় এমন আশেক ছিলেন, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী জানা, বলা এবং সংরক্ষণ করা পছন্দ করতেন।

নিঃসন্দেহে হাদিসের ভাণ্ডারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তবে সেখানে সময়ানুক্রমিক বিন্যাস নেই। তাই আলেমগণ সিরাতের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে কেউ কেউ নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনী জন্ম থেকে অফাত পর্যন্ত সন-তারিখ অনুযায়ী বিন্যস্ত করা আরম্ভ করেন। তাদেরকে আসহাবুস সিয়ার বা সিরাত-লেখক বলা হয়। তারা ছিলেন সিরাতচর্চার উদ্ভাবক। আরো কিছু বরেণ্য আলেম সাহাবায়ে কেরাম এবং সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তির জীবনী সংকলন করার উদ্যোগ নেন। তাদেরকে আসহাবে খবর কিংবা আখবারি (সংবাদসংগ্রাহক) বলা হয়ে থাকে। ইসলামের খলিফাগণ অন্যান্য শাস্ত্রের মতো এই শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও উৎসাহ প্রদান করেন, যা ইসলামি ইতিহাস-গবেষকদের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইতিহাসের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি এশার পর আহলে সিয়ার এবং আখবারিদের জমায়েত করে তাদের থেকে অতীতের ঘটনাবলি শুনতেন। তিনি প্রসিদ্ধ আখবারি উবাইদ বিন শারিয়াকে ইয়েমেন থেকে তলব করে সরাসরি তার মাধ্যমে একটি আরবি ইতিহাস রচনা করান। তার নাম দেওয়া হয় 'আলমুলুক ওয়া আখবারুল মাজিয়্যিন'। তদ্রূপ 'আল-আমসাল' নামে আরেকটি সংকলন প্রস্তুত করান। এই কিতাবগুলো এখন দুর্লভ।[২৬]

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. মাগাজি ও সিয়ারের দরসপ্রদানের জন্য মসজিদভিত্তিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আসিম বিন কাতাদা আনসারিকে (মৃত্যু : ১২১ হিজরি) তাগিদ

---

[২৬] আলমুসলিমুনা ওয়া কিতাবাতুত তারিখ, পৃষ্ঠা ৯০, আলফিহরিসত, ইবনুন নাদিম, পৃষ্ঠা ১১৮

দেন, তিনি যেন জামে উমাবিতে সিরাত, মাগাজি ও মানাকিবের দরস প্রদান করেন। সেই জমানার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব যুহরি (মৃত্যু : ১২৪ হিজরি), উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর নির্দেশে সর্বপ্রথম হাদিস সংকলন করেন এবং মাগাজি নিয়েও একটি কিতাব প্রস্তুত করেন। আর এটিই মাগাজিবিষয়ক প্রথম লিখিত গ্রন্থ। এটিও এখন পাওয়া যায় না।

যুহরি রহ. এর ছাত্রদের মধ্যে মুসা বিন উকবা (মৃত্যু : ১৪১ হিজরি) এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃত্যু : ১৫১ হিজরি) এই শাস্ত্রের আরো উন্নতি করেন। মুসা বিন উকবা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিরাতের রেওয়ায়েত সংগ্রহ করতেন। এজন্য তার রেওয়ায়েত সংকলনটিও সংক্ষিপ্ত। সিরাতের কিতাবসমূহে এর রেফারেন্স বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়; কিন্তু এই কিতাবটিও দুর্লভ।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েতে সনদের বিশুদ্ধতার দিকে খেয়াল করতেন না। সবধরনের রেওয়ায়েত তিনি জমা করতেন। এ কারণে তার রেওয়ায়েতসংখ্যা অধিক। মাগাজি বিষয়ে তার একটি বড় কিতাব আছে। ইসলামিবিশ্বের উপর উপনিবেশ যখন আধিপত্য লাভ করে, তখন সেটি হারিয়ে যায়। এই তো কয়েক দশক পূর্বে কিছু মুহাক্কিকের প্রচেষ্টায় সংশোধন এবং তাহকিকসহ দ্বিতীয়বার দৃশ্যপটে আসে।

ইবনে ইসহাকের পর ইয়েমেনি ইতিহাসবিদ এবং সিরাতগবেষক আবদুল মালিক বিন হিশাম (মৃত্যু : ২১৩ হিজরি) এর হাত ধরে এই শাস্ত্র আরো অগ্রসর হয়। তিনি হিময়ারের সুলতানদের ইতিহাসও রচনা করেন। ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার কারণে তার সজ্জা আরো সমৃদ্ধ করেন। এর দুর্বোধ্য শব্দমালার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এভাবেই সিরাতে ইবনে হিশাম আবির্ভূত হয় এবং সিরাতের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাবে পরিণত হয়।

দক্ষিণ আফগানিস্তানের পোস্ত প্রদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হিব্বান (মৃত্যু : ৩৫৪ হিজরি) এর রচিত 'আসসিরাতুন নববিয়্যাহ ওয়া আখবারুল খুলাফা'ও সিরাতের অন্যতম মৌলিক সূত্রগ্রন্থ। এরপর সিরাতগবেষণা আলেমদের প্রিয় ব্যস্ততায় পরিণত হয়। সিরাত-গবেষকগণ এক্ষেত্রে জ্ঞানের সমুদ্র বইয়ে দেন। হাজারো কিতাব রচনা করেন। এর সূচি তৈরি করতে গেলেও বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে।

রিজালশাস্ত্র

হাদিসের ভাণ্ডার এবং ইতিহাসকে সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে ইমামগণ রিজালশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। একজন পরিপূর্ণ মুহাদ্দিসের জন্য আসমাউর রিজালের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। রাবিদের পরিচয়ের ব্যাপারে সংকলন প্রস্তুত করার ধারা তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে শুরু হয়ে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত জোরেশোরে চলতে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে অনেক তাহকিকি ও গবেষণাকর্ম সংকলিত হয়। আহমাদ ইজলির (মৃত্যু : ২৬১ হিজরি) আসমাউর রিজালে 'আসসিকাত' গ্রন্থটি এই শাস্ত্রের প্রথমসারির কিতাব। এরপর উকাইলি, ইবনে হিব্বান, ইমাম দারাকুতনি, ইবনে আদির মতো বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির হাতে এই শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়। অবশেষে আল্লামা মিযযির 'তাহজিবুল কামাল', হাফেজ জাহাবির 'মিযানুল ইতিদাল', হাফেজ ইবনে হাজারের (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) 'তাহজিবুত তাহজিব'-এর মতো বিশাল কর্ম উম্মতের সামনে আসে।

ইতিহাস-লেখকদের সূচনা

এই যুগটিতে মুসলিম ইতিহাস-রচয়িতাগণ সিরাতের গণ্ডি থেকে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই যুগেই মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদির (মৃত্যু : ২০৭ হিজরি) নাম বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তার কিতাব 'কিতাবুস সিরাহ, কিতাবুত তারিখ আলমাগাজি, ফুতুহুশ শাম এবং আখবারু মাক্কা জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ওয়াকিদি তার গ্রন্থাবলিতে রেওয়ায়েত সংকলন করার কোনো মানদণ্ড রাখেননি। ভালো-মন্দ ও ভিত্তিহীন অনেক বিষয়ও তিনি নিয়ে এসেছেন। তার রচনাবলি নির্ভরযোগ্যতার কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তবে ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর সাবলীলতা এবং ঘটনার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ থাকায় সাধারণ ও বিশেষ সর্বস্তরেই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

ওয়াকিদির শাগরিদ মুহাম্মদ বিন সাদ (মৃত্যু : ২৩০ হিজরি) বড় খ্যাতি অর্জন করেন। উসতাদের বিপরীতে তিনি রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাই করে সংকলন করেন। 'আত-তাবাকাতুল কুবরা' তার গৌরবময় রচনা। এটি

বারো খণ্ডে প্রকাশিত। সিরাতে নববি এবং সাহাবিদের জীবনীর ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগ্রন্থ এটি।

এই যুগেই হাদিসশাস্ত্রের ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ. ইতিহাসের শিরোনামে দুটি কিতাব রচনা করেন। 'আত-তারিখুল আওসাত' এবং 'আত-তারিখুল কাবির'। এই দুটি মূলত রাবিদের পরিচিতি নিয়ে লেখা। এর মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি কোনো বিন্যাস ছাড়াই উল্লেখ হয়েছে। তদ্রূপ তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' কিতাবেও ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ হয়েছে।

ধোঁকাবাজ রাবি

তার পূর্বেই খারেজি এবং রাফেজিগোষ্ঠীর উত্থান হয়, যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার করত না। এই ফেরকার মধ্যে আলেম-জাহেল সব শ্রেণির লোকই ছিল। মূর্খরা তাদের মতো করে রক্তপাত করে অনিষ্ট ছড়াচ্ছিল, আর আলেমশ্রেণি ইলমি এবং দার্শনিকভাবে তাদের মতাদর্শ প্রচার করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ ত্রুটি করেনি। এই আলেমদের মধ্যে হাদিসের প্রতি অনুরাগী এবং ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিও ছিল। প্রত্যেকেই আপন মতাদর্শ অনুসারে কাজ করে। আর এভাবে তাদের মতাদর্শ প্রতিরক্ষায় নিজেদের তৈরি হাদিস প্রচার করতে থাকে, তদ্রূপ ইতিহাসে নিজেদেরকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য মাঝেমধ্যে তারা ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতেও জাল করতে থাকে।

হাদিসশাস্ত্রে ধোঁকা-প্রতারণার মুখোশ উন্মোচনের জন্য হাদিসের ইমামগণ খুব দ্রুতই মাঠে অবতরণ করেন এবং এই ফেতনার গতিরোধ করতে সক্ষম হন। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি রুখে দেওয়ার জন্য তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে গবেষক আলেমগণ প্রত্যেকেই যার যার মতো অবদান রেখে গেছেন। সামনে আমরা তার আলোচনা করব।

সুবিন্যস্ত ইতিহাস রচনার যুগ

বিভিন্ন শাস্ত্রের যখন জোয়ার চলছে, তখন ইতিহাস সংকলনের যুগও আরম্ভ হয়ে যায়। মূলত পৃথিবীতে তখন ইতিহাসচর্চার গতি ঊর্ধ্বমুখী ছিল। এই যুগটি তৃতীয় হিজরিশতাব্দীর মাঝ থেকে শুরু হয়েছিল। এই

যুগেই 'তারিখ' (ইতিহাস) শব্দটি সিয়ার ও মাগাজির কিতাবাদির শিরোনাম হতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম সারিতে আছে উমর বিন শাব্বাহ বসরি (মৃত্যু : ২৬২ হিজরি) রচিত 'তারিখুল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ'। এই যুগেই ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি (মৃত্যু : ২৭০ হিজরি) 'আল-মাআরিফ' রচনা করেন, যা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে নিয়ে তার যুগ পর্যন্ত ঘটনাবলি উল্লেখ হয়েছে। আবু হানিফা দিনাওয়ারি (মৃত্যু : ২৮২ হিজরি) 'আল-আখবারুত তিওয়াল' লিখে বিশ্বইতিহাস লেখার সর্বপ্রথম সূচনা করেন; যদিও এই কিতাবগুলোতে যয়িফ রেওয়ায়েত অধিক পরিমাণে রয়েছে।

এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কিতাবসমূহের মধ্যে আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আলবালাযুরি (মৃত্যু : ২৮৯ হিজরি) লিখিত 'ফুতুহুল বুলদান' এবং 'আনসাবুল আশরাফ'কে ইসলামি ইতিহাসের প্রথম সারির সূত্রগ্রন্থে শামিল করা হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির তাবারির বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক', যাকে ইসলামি ইতিহাসের সর্বপ্রথম বৃহৎ ও ব্যাপক সূত্রগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণত তাকে 'তারিখুত তাবারি' নামেই অভিহিত করা হয়। এটি পরবর্তী অধিকাংশ ইতিহাসেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। 'তারিখুত তাবারি' এবং 'আনসাবুল আশরাফ'সহ প্রথম যুগের প্রায় সব কিতাবেই তাহকিক-পরিপন্থি অনেক রেওয়ায়েত অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইতিহাস রচনায় ভ্রান্ত আকিদার শাসকদের প্রভাব

প্রাথমিক দুই-তিন শতাব্দীতে ইতিহাস সংকলিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু যাচাই-বাছাই একেবারেই হয়নি। এ সংকলন-কাজে শিয়া হুকুমতগুলো সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। বনু আব্বাসের মামুনসহ কিছু খলিফা শিয়া এবং মুতাজিলা মতাদর্শের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন এবং শিয়া আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শিয়া মতাবলম্বী হুকুমত বনু উবাইদ ২৯৭ হিজরি থেকে ৫৬৭ হিজরি পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকা এবং মিসরে শাসনকার্য পরিচালনা করে। বনু বুওয়াহ-হুকুমত শিয়া ইসনা আশারিয়া মতাদর্শী ছিল। তারা ইরান ও খোরাসানে ৩২০ থেকে ৪৭৭ হিজরি পর্যন্ত শাসন করে।

ইসমাইলি শিয়া বাতেনি ফেরকা পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শেষ-চতুর্থাংশ থেকে নিয়ে সপ্তম হিজরি শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর ইরান, কুর্দিস্তান এবং শামের উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ অধিকৃত করে রাখে। এসব সরকারের অধীনে ডজনখানেক ঐতিহাসিক এমন ছিল, যারা শাসকদের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব ইতিহাস বিকৃত করে দিত। সেই শিয়া ঐতিহাসিকদের কিছু কিছু কিতাব খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। আহমাদ বিন আবু ইয়াকুব (মৃত্যু : ২৮৪ হিজরি) 'তারিখে ইয়াকুবি' রচনা করেন। এতে গ্রিক, রোমান, পারস্য, হিন্দুস্থানের ইতিহাসের সাথে সংমিশ্রণ করে ইসলামি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। আল মাসউদি (মৃত্যু : ৩৪৬ হিজরি) রচিত 'মুরুজুয যাহাব'ও খুব বিখ্যাত হয়। উক্ত কিতাবসমূহে সাহাবিযুগের অধ্যায়গুলো মনগড়া রেওয়ায়েতে ভরপুর।

ইসলামি ইতিহাস রচনার স্বর্ণযুগ

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আলেমগণ ইসলামি ইতিহাসের অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। কিছু গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

- খতিব বাগদাদির (মৃত্যু : ৪৬৩ হিজরি) 'তারিখে বাগদাদ'।
- ইবনে আসাকিরের (মৃত্যু : ৫৭১ হিজরি) 'তারিখে দিমাশক'।
- আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযির (মৃত্যু : ৫৯৭ হিজরি) 'আল-মুনতাযাম ফি তারিখি ওয়াল মুলুকি ওয়াল উমাম'।
- ইবনুল আসির জাজারির (মৃত্যু : ৬৩০ হিজরি) 'আল-কামিল ফিত তারিখ' খুবই বিখ্যাত।

সেই জমানাতেই সাহাবিদের জীবনীসমৃদ্ধ গ্রন্থরচনার ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হন। তন্মধ্যে :

- ইবনে আবদুল বার (মৃত্যু : ৪৬৩ হিজরি)-এর 'আল-ইসতিয়াব'।
- ইবনে আসির জাজারির 'উসদুল গাবাহ'।
- ইবনে হাজার আসকালানির (৮৫২ হিজরি) 'আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ'র মতো অতি মূল্যবান কিতাব পাঠকের সম্মুখে আসে।

তাতারিদের হামলার পর ইসলামিবিশ্বে যখন নবজাগরণ ঘটে, তখন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করে কতিপয় প্রাজ্ঞ আলেম

সচেতনতার সঙ্গে ইসলামি ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য তৎপর হন এবং কিছু সমৃদ্ধ কিতাব উপহার দেন।

- হাফেজ জাহাবির (৭৪৮ হিজরি) 'তারিখুল ইসলাম'।
- ইবনে কাসির (৭৭৪ হিজরি)-এর 'আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া'।
- ইবনে খালদুনের (৮০৮ হিজরি) 'দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার'।
- ইবনে ইমাদ হামবলির (১০৮৯ হিজরি) 'শাযারাতুয যাহাব'

ইতিহাসের এই গ্রন্থগুলো অতুলনীয়। মোটকথা সপ্তম হিজরি শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীকাল ইতিহাস-সংকলনের উত্থানযুগ ছিল, এ সময়েই ইতিহাসশাস্ত্র সীমাহীন বিস্তৃতি লাভ করে।

ইলমুল বুলদান (তথা রাষ্ট্রবিদ্যা) এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত

নগর ও রাজ্যের ভূগোল, তার ইতিহাস, সেখানকার প্রখ্যাত ব্যক্তি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তন্মধ্যে :

- ইবনে শাব্বাহর (২৬২ হিজরি) 'তারিখুল মাদিনা'।
- ইমাম ফাকিহানি (২৭২ হিজরি) এবং ইমাম আজরাকির (২৫০ হিজরি) একই নামে রচিত পৃথক পৃথক গ্রন্থ 'আখবারু মাক্কা'।
- ইবনে খুরদাযাবার (২৮০ হিজরি) 'আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক'।
- ইবনুল হায়িক হামদানির (৩৩৪ হিজরি) 'সিফাতু জাজিরাতিল আরব'।
- আল-বিরুনির (৪৪০ হিজরি) 'কিতাবুল হিন্দ'।
- ইবনুল ফারাজির (৪০৩ হিজরি) 'তারিখু উলামাইল আন্দালুস'।
- আবু নুয়াইম ইস্ফাহানির (৪০৫ হিজরি) 'তারিখু নায়সাবুর'।
- হামজা জুরজানির (৪২৭ হিজরি) 'তারিখু জুরজান'।
- আল-ইদরিসির (৫৬০ হিজরি) 'নুযহাতুল মুশতাক'।
- ইবনুল জাওযির (৫৯৭ হিজরি) 'তারিখু বায়তিল মাকদাস'।
- ইয়াকুত হামাবির (৬২৬ হিজরি) 'মু'জামুল বুলদান' উল্লেখযোগ্য কিতাব।

এই স্তরেরই কিছু অনুসন্ধানী লোক দেশে দেশে ঘুরে ভ্রমণকাহিনি লেখেন। যেমন : ইবনে জুবাইর আন্দালুসি (৬১৪ হিজরি) এবং ইবনে বতুতা (৭৭৯ হিজরি) এর সফরনামা আজ পর্যন্ত পৃথিবীবরিত হয়ে আছে।

ইলমুত তাবাকাত (স্তরবিদ্যা)

ইতিহাস এবং রিজালশাস্ত্র সংকলনের পাশাপাশি মুসলমানদের প্রখ্যাত এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের জীবনী সংরক্ষণের কাজও তখন খুব জোরদারভাবে চলতে থাকে। যার ফলে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো রচিত হয়।

- খলিফা বিন খাইয়াতের 'আত-তাবাকাত'।
- আজদির 'তাবাকাতুস সুফিয়া'।
- ইবনুল জাওযির 'সাফওয়াতুস সাফওয়া'।
- জাহাবির 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'।
- সুয়ুতির 'তাবাকাতুল হুফফাজ'।
- আবু ইসহাক শিরাজির 'তাবাকাতুল ফুকাহা'।
- ইয়াকুত হামাবির 'মু'জামুল উদাবা'।
- ইবনুল মু'তাযযের 'তাবাকাতুশ শুআরা'।

এই অনন্য কিতাবগুলো ইসলামি কুতুবখানার সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। এর ফলে রিজাল এবং ইতিহাসশাস্ত্রের সাথে সাথে ইলমে তাবাকাতও ব্যাপকতা লাভ করে। উক্ত শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কোনো যুগ কিংবা কোনো শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী এমনভাবে উল্লেখ করা হয়, যেন পূর্ববর্তী এক যুগ কিংবা এক প্রজন্মে মনীষীদের আলোচনা চলে আসে। এরপর আসে তার পরবর্তী যুগের আলোচনা। এক স্তরের আলোচনায় কখনো তাদের পদবি, কখনো এলাকা, কখনো পেশা, কখনো বর্ণমালার বিন্যাস লক্ষ করা হয়।

ইলমে তাবাকাত ইতিহাসশাস্ত্রের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। উভয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, ইতিহাসে মূল উদ্দেশ্য থাকে ঘটনাবলি ও বিপ্লব, জাতির উত্থান-পতন, হুকুমতের রদবদল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উত্থান-পতনের উল্লেখসহ যুগের স্তরবিন্যাস করা। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উল্লেখ আনুষঙ্গিকভাবে আসে। অন্যদিকে ইলমে তাবাকাতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীই থাকে মুখ্য; বিপ্লব ও ঘটনাবলি হয় পরোক্ষ।

জীবনচরিত সংকলন

ইতিহাস এবং তাবাকাতশাস্ত্রে বিখ্যাত মনীষীদের জীবনচরিত রচনা নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করে; এবং উম্মাহর হাজারও কলম বিখ্যাত

ব্যক্তিদের উজ্জ্বল জীবনের এক একটি দিক নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে। নিম্নে কয়েকটি নাম উল্লেখ করছি :

- আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম (২২৪ হিজরি) রচিত 'সিরাতু উমর বিন আবদুল আজিজ'।
- আবুল ফজল সালেহ (২৬০ হিজরি) এর 'সিরাতু আহমাদ বিন হামবল'।
- কাজি সায়মারির 'আখবারু আবি হানিফা'।
- কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদের 'আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়্যাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ জীবনচরিত বিষয়ে অনবদ্য রচনা।

মোটকথা, ইসলামি ইতিহাস সংকলনের উত্থানযুগে দেশ, নগর, জাতি, গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্তরের মানুষ, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং প্রসিদ্ধ পেশাজীবীদের জীবনী বিষয়ে হাজারো সংকলন তৈরি হয়েছে।

ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের বিশদ জীবনীবিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচিত হয়। যেমন :

- তাবাকাতুল আহনাফ।
- তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যা।
- তাবাকাতুল হানাবিলা।

ওলিদের ঘটনাবলি সংক্রান্ত কিতাব যেমন : হিলয়াতুল আওলিয়া।

প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সংক্রান্ত কিতাব যেমন : ওফায়াতুল আ'য়ান।

উজির, আমির, নাহুবিদ, সরফবিদ, কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী সংক্রান্ত কিতাব; যেমন :

- মুজামুল উদাবা।
- তাবাকাতুশ শুআরা।
- আখবারুন নাহবিয়্যীন।
- আখবারুল কুযাত।

এভাবে মুসলিম ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ ইসলামিবিশ্বের ইতিহাস, তাহজিব-তামাদ্দুন এবং ভূগোল সংক্রান্ত প্রতিটি মূল্যবান বিষয় আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন। যার ফলে আজ অধঃপতনের যুগেও উম্মাহ তার উত্থানযুগের দেদীপ্যমান সূর্য যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

ইসলামি ইতিহাস এবং অন্যান্য ইতিহাসের মাঝে পার্থক্য

ইসলামি ইতিহাস একটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সংকলন, যার নির্ধারিত মূলনীতি রয়েছে। অন্যান্য ইতিহাসের বর্ণনাসমূহ নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রামাণিকতার দিক থেকে কোনোভাবেই তার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না।

ইসলামি ইতিহাসে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসে তার কোনো মূল্যই নেই। রেওয়ায়েত গ্রাহ্য-অগ্রাহ্যের কোনো নীতি নেই। কিছু ব্যক্তির প্রতি অন্ধভক্তি আর কারো কারো প্রতি অমূলক বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামি ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহ যাচাই-বাছাই করা হয়। আর এজন্য রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে ঐতিহাসিক রাবিদের জীবনীও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে রাবিদের চিহ্নিত ও যাচাই করা এবং রেওয়ায়েতের মান নির্ধারণ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতির ইতিহাসের রেওয়ায়েত যাচাই করার কোনো উসুল ও নীতিমালা নেই। ইউরোপের আধুনিক ইতিহাস রচনাপদ্ধতির মধ্যেও যুক্তিগ্রাহ্য হওয়ার শর্ত ছাড়া রেওয়ায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করার আর কোনো নির্দেশনা নেই।

ইসলামি ইতিহাসে রেওয়ায়েতের সাথে সাথে দেরায়েত বা যুক্তি প্রয়োগেরও নিয়মনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসে দেরায়েতকে মামুলি ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়েছে। আর এ কারণেই হিন্দুরা আজও রামায়ন এবং ভগবত গীতাকে অলৌকিক ঘটনা বলে এবং গ্রিক জাতি হারকিউলিসের দুর্বোধ্য ইতিহাসকে মেনে চলেছে।

ইসলামি ইতিহাস এবং অন্যান্য ইতিহাসের মাঝে মানদণ্ডের বিচারে এভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা হয় যে, ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরা আজও ইনজিলের প্রাচীন সংস্করণকে (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ইতিহাসের সবচেয়ে বড়

প্রামাণ্য সূত্র হিসেবে বিশ্বাস করে, আর হিন্দুরা 'রামায়ন'কে তাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বলে গর্ব করে বেড়ায়। অথচ তার মধ্যে স্বভাববিরোধী অনেক কথা দিয়ে ভরা এবং সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনো মর্যাদা নেই। অপরদিকে মুসলমান ইতিহাসবিদগণ ইবনে কুতাইবার 'আল-মাআরিফ'কেও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সূচি থেকে বের করে দিয়েছেন। মুসলমান মুহাক্কিকরা (গবেষক) বাগদাদের তৎকালীন কাজি ওয়াকিদির রেওয়ায়েতও চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে না।

ইতিহাসশাস্ত্রে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ

মুসলমানদের পতন এবং ইতিহাসশাস্ত্রের অধঃপতন প্রায় একই সময়ে ঘটে। এর দ্বারা এ কথা সত্য প্রমাণিত হয় যে, কোনো জাতি যখন নিজের ইতিহাস ভুলতে বসে, তখন তারা নিজের পরিচয়ই হারিয়ে ফেলে। বিগত তিন শতাব্দী ধরে আমরা অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ইতিহাসেও অবক্ষয়ের শিকার। যদিও আরবদুনিয়ায় এ বিষয়ে সচেতনতার জোয়ার বইছে এবং ইলমি হালাকাগুলোতে ইতিহাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস জানার কোনোরূপ নড়াচড়া ও উদ্যোগ পরিলক্ষ হচ্ছে না।

ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞ থাকার বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করছি।

১. ইতিহাসের প্রকৃত সংরক্ষক ছিলেন আলেমগণ। অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং ফকিহগণ এই শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে তাকে আরো উন্নত পর্যায়ে পৌছান। কিন্তু ধীরে ধীরে ইতিহাসের ব্যাপারে ইসলামি ভাবধারার লোকেদের মধ্যে দুর্বলতা ছেয়ে যেতে থাকে। এটি রাজপ্রাসাদের মুনশি এবং কবি-সাহিত্যিকদের আয়ত্তে চলে যায়। এরপর চরম অধঃপতনের শিকার হলে শত্রুরা তাকে কব্জায় নিয়ে নেয়। প্রাচ্যবিদরা ইসলামি ইতিহাসকে শিশুদের খেলনার বস্তু বানিয়ে রাখে। এরপর তাদের ভাবশিষ্য সেক্যুলারদের হাতে ইসলামি ইতিহাস এতই দলিত-মথিত হয়েছে যে, বিগত শতাব্দীগুলোতে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ ইতিহাসের ব্যাপারে সেই সেক্যুলারদেরই সমর্থন করা হয়, যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে; মূলত তারা ইসলামের চরম দুশমন। ওরা ইতিহাস বিকৃতি, সাহাবিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ভুল ব্যাখ্যা, পূর্বসূরিদের বদনাম করা, মহান মুসলিম-বিজেতাদেরকে ডাকাত-লুটেরা আখ্যা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এভাবে সঠিক ইতিহাস থেকে গাফলতি ব্যাপক আকার ধারণ করছে। আর এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ ইতিহাস জনসম্মুখে চলে আসছে।

২. সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। দুনিয়াপূজা, আখেরাতের ব্যাপারে গাফলতি, এর পাশাপাশি দরিদ্রতা, অসচ্ছলতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং আরো কিছু সমস্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের যোগ্যতাকে জীবিকা উপার্জন এবং বাসস্থানের অন্বেষণে নিয়োজিত করতে বাধ্য করেছে। এ অবস্থায় নিজের ইতিহাস অধ্যয়ন করে তা থেকে সবক নেওয়ার সুযোগ কারই-বা হবে।

৩. ইসলামিবিশ্বে বিশেষকরে উপমহাদেশ তথা পাক-ভারতে অন্যান্য বিদ্যার মতো ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার সুযোগও কম। এর সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ ধরনের কোনো কার্যক্রম চালু নেই। ইতিহাসবিষয়ে তাখাসসুস কিংবা কোনো শাখাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্তির চিন্তাও আমাদের মধ্যে অনেক দেরিতে এসেছে।

৪. আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামি ইতিহাস নামে একটি বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু এটা নিছকই নামসর্বস্ব।

৫. আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাসের বহু শিক্ষক সেক্যুলার। এজন্য তারা সুলতান মাহমুদ গজনবি ও আলমগিরের মতো শাসকদের জীবনী পাঠদানকালে তাদেরকে অত্যাচারী, নির্দয় এবং জনগণের শত্রু হিসেবে প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তাদেরকে ডাকাত ও লুটেরা আখ্যা দেয়। কারণ, তারা হিন্দু ইতিহাসবিদদের বানোয়াট তথ্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ফিল্মে এগুলোই দেখে, পড়ে ও শোনে। এর ফলে সাহাবিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে তারা এতটাই ন্যাক্কারজনকভাবে চিত্রিত করে যে, এই পবিত্র ব্যক্তিদেরকে তারা স্বার্থপর, দুনিয়াদার এবং ক্ষমতার মোহের শিকার বলে উপস্থাপন করে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গোল্ড যিহার, পাদরি য়ুয়াইমার, যোসেফ শাখত এবং উইলিয়াম ম্যুর তাদের গ্রন্থসমূহে এমনটিই ব্যক্ত করেছে।

৬. ইলম এখন উচ্চ সনদ অর্জনের পরিবর্তে পার্থিব লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। মানসম্পন্ন কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ খুবই কম। কপি-পেস্ট করে প্রবন্ধ প্রস্তুত করেও পিএইচ,ডি করা যায়। অপরের মাধ্যমে থিসিস তৈরি করিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনও ব্যাপকতা লাভ করেছে।

৭. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কলেজ-ইউনির্ভাসিটির সার্টিফিকেট অর্জন করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে; কিন্তু বড় কোনো গবেষণা করার সময় আমাদের খুবই কম।

৮. ইলমি ও গবেষণামূলক কাজ ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না। ইতিহাস-গবেষকদের চেয়ে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের অধিক সমাদর।

৯. ইসলামি ইতিহাসে পিএইচ,ডি অর্জনকারীরাও সার্বিকভাবে ইসলামি ইতিহাসের মূল ভাষা আরবি ও ফারসি জানে না। তারা প্রাচ্যবিদদের লিখিত ইংরেজি গ্রন্থ কিংবা তার উর্দু অনুবাদ থেকে ইতিহাস অধ্যয়ন করার দরুন চিন্তার দীনতার শিকার হয়। এরপর তারা সেই বিকৃত ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করে। ফলে তাদের জ্ঞানের স্থলে মূর্খতাই বৃদ্ধি পায়।

এগুলোর কারণেই ইতিহাসশাস্ত্র প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যতদিন না এসব দূর করা হবে, ততদিন এই মূর্খতার অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে।

ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব এবং উপকারিতা

কুরআনের আলোকে ইতিহাসের গুরুত্ব

ইতিহাসের গুরুত্ব কুরআন কারিম দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা পূববর্তী নবীগণের ইতিহাস সুসংক্ষিপ্তরূপে অলংকারপূর্ণ ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, যাতে করে হকপন্থিরা উৎসাহিত হয় আর কাফেররা সাবধান হয়ে যায়। তিনি ইরশাদ করেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

> আর নবীগণের এসব ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত করছি।[২৭]

পবিত্র কুরআনের অনেক সুরায় পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে তাদের মন্দকর্ম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হয়। ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

> নিঃসন্দেহে তাদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ রয়েছে।[২৮]

কুরআন কারিম ইতিহাসগ্রন্থ নয়, লিখিত হেদায়েতপত্র। পবিত্র কুরআনে ইতিহাস এমনভাবে বর্ণনা করা হয়, যাতে মানুষ হেদায়েত লাভ করে এবং তাদের স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কে জুড়ে নেয়।

হাদিস শরিফে ইতিহাসের গুরুত্ব

হাদিস থেকে ইতিহাসের গুরুত্ব বুঝা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি এবং নবীর অনেক ঘটনা বর্ণনা

---

[২৭] সুরা হুদ, আয়াত ১২০
[২৮] সুরা ইউসুফ, আয়াত ১১১

করেছেন, হাদিসের কিতাবাদিতে যা মজুদ রয়েছে। এগুলো বর্ণনা করার পেছনে উদ্দেশ্য কুরআনে কারিমের অনুরূপই তথা শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ করা। সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা, কাজকর্ম ছাড়াও নবীযুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, গাজওয়া এবং অন্যান্য অবস্থা এজন্য বর্ণনা করেছেন, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষ এর থেকে হেদায়েতের আলো লাভ করতে পারে। তাবেয়ি এবং হাদিসের রাবিগণও একই উদ্দেশ্যে সিরাতুন-নবী এবং সিরাতে সাহাবা সংরক্ষণ করেছেন।

সিরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগের একটি বড় অংশের বর্ণনা আমরা হাদিসের কিতাবসমূহেও পেয়ে যাব। হাদিস যদিও ইতিহাস সংকলন নয়; তদুপরি তাতে আনুষঙ্গিকভাবে ইতিহাসের অনেক ঘটনাই পাওয়া যায়। ইসলামি ইতিহাসের যে অংশটি হাদিসের কিতাবসমূহে সন্ধান মেলে, তার বিশুদ্ধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সকল ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থের ঊর্ধ্বে। হাদিসের ভাণ্ডারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থাকা প্রমাণ করে যে, ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব নবীজি, সাহাবা ও খাইরুল কুরুনের আলেমদের নিকট স্বীকৃত ছিল।

ফকিহদের নিকট ইতিহাসের গুরুত্ব

অন্যান্য শাস্ত্র ও বিদ্যার মতো ইতিহাসেরও দুটি দিক রয়েছে। একটি উপকারী আরেকটি ক্ষতিকর। আবার উপকারী দিকেও কিছু আছে অধিক উপকারী আর কিছু কম উপকারী। তদ্রূপ ক্ষতিকর দিকের ক্ষেত্রেও কিছু আছে কম ক্ষতিকর, কিছু অধিক ক্ষতিকর; বরং ধ্বংসাত্মক।

আল্লাহ তায়ালা ফকিহদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক। কারণ, তারা মানব-জীবনের প্রতিটি বিষয়ের শরয়ি বিধান কুরআন ও হাদিস থেকে উৎসারিত মূলনীতির আলোকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তদ্রূপ তারা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনটা জায়েজ কোনটা নাজায়েজ তা ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসশাস্ত্রের ব্যাপারে ফকিহদের অভিমত হলো :

১. ইতিহাসের কিছু অধ্যায়ের জ্ঞান অর্জন করা ফরজে আইন। কিছু ফরজে কিফায়া, কিছু ওয়াজিব, কিছু মানদুব (উত্তম), কিছু মুবাহ (বৈধ), কিছু মাকরুহ, কিছু হারাম।

২. সিরাতুন-নবীর এ পরিমাণ ইলম অর্জন করা মুসলমানদের জন্য ফরজে আইন, যার মাধ্যমে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারে।

৩. এমনসব ঘটনা জানা, যার উপর আকিদা ও ফিকহের কোনো মাসআলা এবং মুসলমানদের স্বার্থ নির্ভরশীল- তা ওয়াজিব। তাই উম্মতের একটি শ্রেণির এই পরিমাণ ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফায়া। আকিদা ও আমল সংক্রান্ত মাসআলা ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ হলো, বহু আকিদা ও আমল সংক্রান্ত মাসআলা হাদিস থেকে সংগৃহীত। এর রাবি ও বর্ণনাকারীদের জীবনী সে পর্যন্ত জানা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। তদ্রূপ কোনো হাদিসের সনদ মুত্তাসিল হওয়া, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে অবগত হওয়া, এ ছাড়াও বংশ ও উত্তরাধিকারের অনেক বিষয় ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য ইতিহাসের এই অংশের জ্ঞান অর্জনকে ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪. আল্লামা সাখাবি রহ. আবুল হুসাইন ফারিসের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, সিরাতুন-নবী মুখস্থ রাখা আলেম ও বুজুর্গদের উপর ওয়াজিব।

৫. সাহাবি, ওলি ও মহান ব্যক্তিদের জীবনী জানা, যার মাধ্যমে নেককাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তা মানদুব।

৬. বাদশাহ, উজির, শাহজাদা, কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যান্য লোকের জীবনী ও ঘটনাবলি জানা, যার দ্বারা দীনের কোনো ক্ষতি হয় না, দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে উপকার হয়, তা হলে তা মুবাহ।

৭. এমন বেহুদা ঘটনাবলি পড়া, যার মধ্যে দীন-দুনিয়ার কোনো উপকার নেই, তা পড়া মাকরুহ।

৮. প্রেমকাহিনি, নৈতিকতাবিবর্জিত কিসসা, পাপিষ্ঠ লোকদের যেসব ঘটনা পড়ার দ্বারা আকিদা কিংবা আমলের দিক দিয়ে অবক্ষয়ের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা তার মাধ্যমে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তা হলে তা পড়া হারাম।[২৯]

---

[২৯] আল-ইলান বিত-তাওবিখ (সারনির্যাস), পৃষ্ঠা ৮৬-৯০

৯. কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিষয়াদি অধ্যয়ন করা কিংবা আলোচনা করা মাকরুহ।[৩০] কারণ, এতে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই। বরং এই মহান মনীষীগণের প্রতি বেআদবি হওয়া এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যদি আকিদার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে অধ্যয়ন করা হারাম।[৩১] তবে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভ্রান্ত গোষ্ঠীর প্রোপাগান্ডার জবাব এবং অন্যদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয় অধ্যয়ন করা, গবেষণা করা কেবল জায়েজই নয়, বরং প্রয়োজনের সময় ওয়াজিবও হয়ে যায়।[৩২]

আলেমদের নিকট ইতিহাসের গুরুত্ব

আলেমদের নিকট ইতিহাসশাস্ত্রের অবস্থান কী, এ শাস্ত্রের উপকারিতা কী কী, নিম্নে তারই কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরছি :

- ইমাম আলি বিন মাদিনি রহ. বলেন, হাদিসের মর্মার্থ বুঝা ইলমের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক হলো রাবিদের চেনা।[৩৩]
- মাওলানা শামসুল হক আফগানি রহ. লেখেন, দুনিয়ার উন্নতির জন্য চারটি বিষয় অতীব জরুরি। অতীতের সাথে সম্পর্ক, চিন্তা ও আমলের একাত্মতা, শক্তির উপকরণ জমায়েত করা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।[৩৪]

---

[৩০] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃষ্ঠা ৮৮

[৩১].আলইবানাহ আন শারিআতিল ফিরকাতিন নাজিয়াহ, ইবনে বাত্তাহ, পৃষ্ঠা ২৪৫ (দারুর রায়াহ সংস্করণ)

[৩২] তানবিরুল ঈমান, তারজামাহ তাতহিরুল জিনান, ইবনে হাজার আলহাইসামি, পৃষ্ঠা ৭৫

[৩৩] ফিতনা ইসতিশরাক, পৃষ্ঠা ৪ (সিদ্দিকি ট্রাস্ট সংস্করণ, করাচি)

[৩৪] আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামি রহ. তার রচনাবলিতে সাহাবায়ে কেরামের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত একাধিক রেওয়ায়েত নকল করেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'আমাদের ইমামগণ উসুলের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে লড়াই হয়েছে, তার আলোচনা না করা উত্তম। প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, তা হলে আপনি কেন ঐসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন? উত্তর হলো, আমাদের উদ্দেশ্য সহিহ ঘটনা নকল করা এবং তার থেকে বিশুদ্ধ ফল বের করা।' এরপর তিনি

আপনি গভীরভাবে ফিকির করলে দেখতে পাবেন- উন্নতি-অগ্রগতির উক্ত চারটি মৌলিক জিনিসের জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি। আর এই চারটি জিনিস ক্রমান্বয়ে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইতিহাস হলো তার প্রথম ধাপ। তাই ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে ঐ চারটি বিষয় অস্তিত্বে আনা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

ইতিহাসের উপকারিতা

এ ছাড়াও ইতিহাস অধ্যয়নের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। তা থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি :

- ইতিহাস আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে দূরদর্শিতা তৈরি করবে। কোনো ঘটনার সহিহ ব্যাখ্যা এবং কোনো ঘটনার তাৎক্ষণিক সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করবে। কেননা ইতিহাসের পাঠক অতীতের বহু ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকবে। ফলে কোনো ঘটনাই তার কাছে বিস্ময়কর মনে হবে না। বরং বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে অতীতের কোনো চিত্র তার সামনে ভেসে উঠবে (সে আলোকে তার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে)। এই স্থানে একটি ঐতিহাসিক আরবি প্রবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে- ما أَشْبَهَ الليلةُ بالبارحة (আজকের রাত গতরাতের সঙ্গে কত সাদৃশ্যপূর্ণ!') ইউরোপিয়ানরা এই স্থানে বলে থাকে, 'ইতিহাস নিজেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়'।
- ইতিহাস মানুষকে অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলে। একজন সেনা-অফিসার সাধারণ সৈন্য থেকে এজন্য উঁচুমর্যাদা সম্পন্ন নন যে, তিনি অধিক শক্তিশালী ও উদ্যমী। শক্তি-সামর্থ্যের দিক থেকে অনেক সাধারণ সৈন্যও সিপাহসালার থেকে অগ্রসর। মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করা হয় অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার সামর্থ্যের ভিত্তিতে। ইতিহাস অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত করত: মানুষকে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই শত

আরো বলেন, 'আমি যা কিছু উল্লেখ করেছি, সত্যপ্রকাশের জন্য বাস্তব ঘটনা নকল করেছি। আর এভাবে আলোচনা করা আমাদের উপর একান্ত কর্তব্য ও অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র সত্তা এবং নিষ্কলুষতা প্রকাশ পাবে।' -[তানবিরুল ঈমান, তারজামাহ তাতহিরুল জিনান, পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫]

শত বছরের ঘটনাবলির আলোকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্য করে তোলে। একজন বয়োবৃদ্ধ সেনানায়ক ৬০-৭০ বছরের অভিজ্ঞতা ধারণ করেন। কিন্তু ইতিহাস শত শত বছরের অভিজ্ঞতার সারনির্যাস ধারণ করে। জাতির নেতৃত্বদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন করা অতীব জরুরি।

- আমরা বইপত্র থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মনীতি, জ্ঞানীদের কথা ও প্রজ্ঞাবাণী শিখে থাকি; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সেসব নীতি এবং বাণীর বাস্তব প্রয়োগের যোগ্যতা হাসিল করা মামুলি ব্যাপার নয়। ইতিহাসের পাঠক তার বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে সহজেই উসুল (নীতি) প্রয়োগ করতে পারে। কারণ, তার সামনে তো অতীতের মানুষ এবং যোগ্য নেতাদের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফলে সে জানে এ ধরনের কার্যক্রম কীভাবে আঞ্জাম দিতে হয়।
- ইতিহাস মানুষকে সজাগ রাখে। প্রত্যয় ও সতর্কতার সবক শেখায়। দূরদর্শিতার জন্ম দেয়। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। দুশমনের অতর্কিত আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের উপায় বাতলে দেয়। ইমাম সাখাবি রহ. জনৈক বুজুর্গের বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা শেখানোর দুটি উপায়। এক. লিখিত কথাবার্তা। দুই. শ্রুত কথাবার্তা। আর শ্রুত কথাবার্তাও যতক্ষণ না লেখা হবে, ততক্ষণ উপকারী সাব্যস্ত হবে না। কারণ, তা ভুলে যাবে।[৩৫] তাই বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা হাসিল করার জন্যও ইতিহাস পড়া আবশ্যক।
- ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা রাজনৈতিক এবং সামরিক বিষয়ে দূরদর্শিতা তৈরি হয়। কঠিন সময়ে পূর্ববর্তী সেনাপতি, শাসক, বিজয়ী সালারদের কর্মপদ্ধতি সামনে বিদ্যমান থাকে।
- ইতিহাস পূর্বসূরিদের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং নিজ জাতির আত্মসম্মান ও গৌরব সৃষ্টি করে, যা সকল আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রাণ। তার বিপরীতে নির্লজ্জতা এবং আত্মমর্যাদাহীনতা সকল অনিষ্টের মূল। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে- إذا لم تستحي فاصنع ما

[৩৫] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃষ্ঠা ৩২

شئت 'তোমার মধ্যে যখন লজ্জা না থাকবে, তখন যা মনে চায়, করবে।'[৩৬]

যদি এই আত্মসম্মানবোধ না থাকে, তা হলে মানুষ মন্দ থেকে মন্দতর কাজ করতেও লজ্জাবোধ করবে না। কোনো সাইয়েদপুত্র যদি না-ই জানে যে, সাইয়েদ কী আর তার মর্যাদাই-বা কী? এবং সে কোন বংশের সন্তান, তা হলে তার দ্বারা যেকোনো অপকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। আর যদি সে তার সম্ভ্রান্ত বংশ সম্পর্কে অবগত থাকে, তা হলে সে মরে গেলেও নিজের বংশের ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না।

এটিই কোনো জাতির সামাজিক প্রাণস্পন্দন। কোনো জাতি যদি তার পূর্বসূরিদের সম্পর্কে জানে, তা হলে কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও ধৈর্য ধরে এবং বড় বড় পরাশক্তির সামনেও মাথানত করে না। কিন্তু যখন এই অনুভূতি মরে যায়, তখন প্রতিটি ঘরেই গাদ্দার এবং কাপুরুষ জন্ম নেয়। এভাবে জাতির তরী ডুবে যেতে থাকে।

- ইতিহাস পূর্ববর্তী জমানার দুর্ঘটনা, দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-মুসিবত, ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ এবং আক্রমণের দৃশ্যপট তুলে ধরে মানুষের মধ্যে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা সহ্য করার যোগ্যতা তৈরি করে। মানুষ তখন বুঝতে পারে যে, দুনিয়াটা পরীক্ষার স্থান, মুমিনের কারাগার। এখানে কেউ-ই বিপদমুক্ত নয়।
- ইতিহাস অধ্যয়ন ছাড়া আমরা ইহুদি, খ্রিষ্টানসহ ইসলামের অন্যান্য দুশমনি শক্তির চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং মানসিকতা সম্পর্কে অবগত হতে পারব না।
- ইতিহাসের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমেই আমরা কেবল ভ্রান্ত ফেরকা, সেক্যুলার ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদদের নামসর্বস্ব গবেষণাগুলো খতিয়ে দেখতে পারব, যা তারা ইতিহাসের নামে উপস্থাপন করে থাকে।
- ইতিহাস পূর্বসূরিদের ঘটনাবলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেকআমল এবং অধ্যবসায়ের প্রতি জজবা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে।

---

[৩৬] সুনান ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪১৮৩

- নিজের যোগ্যতা বিকশিত করার জন্য সৎসঙ্গ এবং বড় ব্যক্তিদের সাহচর্যের চেয়ে অধিক উপকারী জিনিস দ্বিতীয়টি নেই। ইতিহাস আমাদেরকে কখনো নবীযুগে নিয়ে যায়, কখনো সাহাবিযুগের ঔজ্জ্বল্য দেখায়, কখনো শিবলি আর জুনাইদ বাগদাদির মজলিসে বসিয়ে দেয়, কখনো-বা সালাহুদ্দীন আইয়ুবি এবং সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহের দরবারে পৌঁছে দেয়। কবি বলেন-

হে কল্পনা, তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও
সেই সোনালি প্রভাত ও সন্ধ্যা
দেখিয়ে দাও আমাকে
অতীতের সেই দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার দিনগুলো।

- ইতিহাস আপনার হৃদয়ে গেড়ে বসতে পারলে, আপনাকে বৈধ আনন্দ ও উত্তম বিনোদনের ব্যবস্থা করবে। অবর্ণনীয় স্বাদ ও তৃপ্তি প্রদান করবে।
- ইতিহাস মানুষকে মৃত্যুর পরেও জিন্দা রাখে। আল্লামা সাখাবি রহ. বলেন, মানুষের মর্যাদা তার আলোচিত হবার সমানানুপাতিক। কথায় আছে, মরণশীল মরে যায়, কিন্তু তার আলোচনা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। রাজা-বাদশাহ ও শাসকরা এসব ভবন, অট্টালিকা ও দুর্গ এজন্য নির্মাণ করেন, যেন তাদের স্মৃতি রয়ে যায়।[৩৭] আর এই উদ্দেশ্য ইতিহাসের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে হাসিল হয়।
- আল্লামা সাখাবি রহ. বলেন, ইতিহাসের ভেতরে একাধিক শাস্ত্র রয়েছে। যেমন : রাজনীতি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ রাজনীতি, নেতৃত্ব এবং সমাজ-পরিচালনার প্রকারভেদ, প্রয়োজন এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় জানতে পারবে। তদ্রূপ ইলমুল আখলাক (নীতিবিজ্ঞান)-ও একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা; কিন্তু ইতিহাসপাঠের দ্বারা উন্নত আখলাক-চরিত্র এবং তা অর্জন করার পদ্ধতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করবে। অনুরূপ মন্দাচার এবং তার থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতাও তার মধ্যে এসে পড়বে।[৩৮]

---

[৩৭] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮

[৩৮] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃষ্ঠা ৮৪

ইসলামি ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা

• এমন অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য সাধারণ ইতিহাস থেকে অর্জিত হয় না; তা কেবল ইসলামি ইতিহাসের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। যেমন : ইসলামি ইতিহাস তাওহিদ (একত্ববাদ) এর প্রমাণ বহন করে। কারণ, এখানে কুরআন-হাদিসের ঘটনাবলি চয়ন করে বুঝায় যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল মানুষ তাওহিদের আকিদায় বিশ্বাসী ছিল। এরপর শয়তান শিরকের প্রসার ঘটিয়েছে।[৩৯]

এর থেকে বুঝা যায়, ফিতরাত (সহজাত স্বভাব) অনুযায়ীই মানুষ তাওহিদে বিশ্বাসী, শিরক পরবর্তীতে যুক্ত একটি আত্মিক ও বিশ্বাসগত ব্যাধি। অন্যান্য নবীর সঠিক ইতিহাসও কেবল ইসলামি ইতিহাসেই পাওয়া যায়। আর তাদের এই বিশুদ্ধ ইতিহাসও বলে যে, তারা তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

- ইসলামি ইতিহাস নবুওয়াতের উপর ঈমান পাকাপোক্ত করার মাধ্যম। কারণ, আমরা এখানে দেখতে পাব- মানবসমাজ বার বার সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তাই স্বভাবগত চাহিদার কারণেই কিছুদিন পরপরই কোনো-না-কোনো আধ্যাত্মিক রাহবার (পথপ্রদর্শক) এর প্রয়োজন পড়ে। আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে এই প্রয়োজন পূরণ করেন। এই অবস্থাগুলো বিশুদ্ধভাবে ইসলামি ইতিহাসেই সংরক্ষিত রয়েছে।
- ইসলামি ইতিহাস আমাদেরকে সত্যের পথে অটল-অবিচল থাকার শিক্ষা দেয়। কেননা, এখানে বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী নবী এবং তাদের উম্মতদের কত কষ্ট-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। আর আমরা সর্বশেষ উম্মত। আমাদের আরো অধিক সবর ও ধৈর্যের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের অনুযোগ করা হয়, তখন তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বের উম্মতদের লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরে এমনভাবে আঁচড় দেওয়া হতো, হাড্ডি থেকে গোশত

---

[৩৯] সুরা বাকারা, আয়াত ১৩৬, ২১৩; সুরা আলে ইমরান, ১৯, ৮১; সুরা মায়িদা, ৪৮

আলাদা হয়ে যেত। করাত দিয়ে তাদের দ্বিখণ্ডিত করা হতো। তারপরও তারা দীন থেকে সরে যায়নি।[৪০]

- ইসলামি ইতিহাস, নবীদের জীবনী, শেষনবীর সিরাত অধ্যয়ন করার দ্বারা আল্লাহর মহব্বত ও তার ভয়, কওমের ফিকির, দীনের জন্য কুরবানি, সৃষ্টির প্রতি দয়া, মানুষের কল্যাণকামিতাসহ অনেক অমূল্য শিক্ষা আমাদের অর্জিত হয়, যা ইতিহাসের অন্য কোনো অধ্যায় থেকে হাসিল হবে না।

আলেম ও ফকিহদের জন্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা

আলেম ও ফকিহদের জন্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক। কারণ :

- আলেম ও ফকিহগণ জাতির নেতৃপুরুষ। একজন নেতার জন্য যে অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং চিন্তাগত পরিচর্যার প্রয়োজন, তা ইতিহাস অধ্যয়ন ছাড়া সম্পন্ন হবে না।
- বহু দীনি বিষয় বোঝাও ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, সিরাত এবং সাহাবিদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের অধ্যায়সমূহে এমন অনেক জায়গা আসবে, যা ইতিহাসের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে। যেমনঃ এক আয়াত নাসিখ (রহিতকারী) হওয়া এবং আরেকটি মানসুখ (রহিত) হওয়া তখনই নির্ণয় করা যাবে, যখন দুটির মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে নাজিল হয়েছে, তা জানা যাবে। আর এটা তো পরিষ্কার যে, এই তথ্যের জন্য ইতিহাস জানা জরুরি।

তদ্রূপ দুটি বিরোধপূর্ণ হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য দেওয়ার জন্য কখনো ইতিহাসবিদ্যা উপকার দেয়। যেমন : আগুনে রান্না-করা জিনিস খাওয়ার দ্বারা অজু ভাঙার মাসআলা মতভেদপূর্ণ। কিন্তু একটি রেওয়ায়েত বলে দিচ্ছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষজীবনের আমল ছিল আগুনে রান্না-করা জিনিসের কারণে নতুন করে অজু না করা। এর মাধ্যমে উভয় হাদিসের মাঝে অসঙ্গতি দূর হয়ে যায়।

---

[৪০] সহিহ বুখারি (কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ) হাদিস নং ২৬১২

অনুরূপ সনদের যাচাই-বাছাই ইতিহাসশাস্ত্র ছাড়া অসম্ভব। ইতিহাসই বলে দেবে রাবি যে-মুহাদ্দিস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি তার যুগের মানুষ কি না? যদি উভয়ই সমসাময়িক হন, তাদের মধ্যে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে কি না? দূরদূরান্তে বসবাসকারী দুই রাবির মাঝে সাক্ষাৎ কিংবা হাদিসের অনুমতি লাভ কীভাবে সম্ভব হতে পারে? কেউ যদি ইতিহাসশাস্ত্রে প্রজ্ঞা অর্জন করে থাকে, তা হলে এ ধরনের সকল দ্বিধা-সংশয় দূর হয়ে যাবে।[৪১]

ইতিহাসের মাধ্যমে মিথ্যুক রাবিদের পাকড়াও

ইতিহাসের দ্বারা মিথ্যুক রাবিদের নিমেষেই চিহ্নিত করা যায়। সুফিয়ান সাওরি রহ. এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন,

لما استعمل الرواة الكذبَ استعملنا لهم التاريخ

রাবিরা যখন রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু করেছে, আমরা তাদের চিহ্নিত করার জন্য ইতিহাসের ব্যবহার আরম্ভ করে দিই।

হাফস বিন গিয়াস রহ. বলেন,

إذا اتهمتم فحاسبوه بالسِّنين

কোনো রাবির ব্যাপারে যখন তোমাদের সন্দেহ জাগবে, তখন ইতিহাসের মাধ্যমে তাদের যাচাই করবে।

হাম্মাদ বিন যায়েদ রহ. বলেন,

لم يُسْتَعنْ على الكذّابين بمِثل التاريخ

মিথ্যা রেওয়ায়েত তৈরিকারীদের ব্যাপারে ইতিহাসের চেয়ে উত্তম কোনো সাহায্যকারী নেই।[৪২]

ইতিহাসের মাধ্যমে জাল রেওয়ায়েতের মুখোশ উন্মোচন

ইতিহাস কীভাবে জাল রেওয়ায়েতের মুখোশ উন্মোচন করে, তার একটি উদাহরণ দেখুন : জনৈক রাবি ইমাম শাফেয়ি রহ. সম্পর্কে একটি ঘটনা

---

[৪১] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃষ্ঠা ১৮, ১৯

[৪২] আশ-শামারিখ, পৃষ্ঠা ১৮

বর্ণনা করে যে, একবার খলিফা মামুনুর রশিদ তাকে এ পরিমাণ নাবিয[৪৩] পান করান, কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে তা পান করানো হলে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত; কিন্তু ইমাম শাফেয়ির উপর তার কোনো প্রভাবই পড়েনি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. 'লিসানুল মিযানে' ঐতিহাসিক প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত করেন যে, এটা মিথ্যা-বানোয়াট। কারণ, খলিফা মামুনুর রশিদের সঙ্গে ইমাম শাফেয়ির সাক্ষাৎই প্রমাণিত নয়। উপরন্তু তিনি যুক্তির নিরিখে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ি এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি বলেছেন, 'আমার যদি সন্দেহ জাগে যে, ঠান্ডা পানি আমার বোধশক্তি এবং গাম্ভির্যের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করবে, আমি জীবনভর গরম পানি ব্যবহার করে যাব।' এমন ব্যক্তির ব্যাপারে নাবিয পান করার রেওয়ায়েতের উপর কীভাবে ভরসা করা যায়!![৪৪]

ইতিহাসে পারদর্শিতার মাধ্যমে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা

এখানে ইতিহাসে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন সম্মানিত আলেমের ঘটনা উল্লেখ করা যথোপযুক্ত মনে করছি। এর মাধ্যমে অনুমান করা যাবে যে, কোনো আলেম যদি ইতিহাসে দক্ষ হন, তা হলে তিনি দীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কীভাবে মুসলিম উম্মাহর উপকার করতে পারেন।

পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে বাগদাদে ইহুদিরা একটি পুরোনো নথি পেশ করে। তাতে লেখা ছিল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার বিজয়ের পর ইহুদিদের জিজিয়া মওকুফ করে দিয়েছেন। এই নথিপত্রে হজরত আলি, হজরত সাদ বিন মুয়াজ এবং হজরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর স্বাক্ষর রয়েছে। দলিল দেখতেও খুব পুরোনো মনে হচ্ছিল। এটা দেখে মুসলমানরাও তাদেরকে করমুক্ত করে দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে নথিটা ইমাম আবু বকর আলখতিব বাগদাদি রহ. কে দেখানো হয়। তিনি এক নজর দেখেই এটাকে বানোয়াট আখ্যা দেন এবং এর পক্ষে দুটি প্রমাণ পেশ করেন।

---

[৪৩] নেশাজাতীয় একপ্রকার পানীয়, খেজুর ভিজিয়ে প্রস্তুত করা।
[৪৪] লিসানুল মিযান, ৬/৬৭ (আল-ইলান বিত-তাওবিখ এর সূত্রে, পৃষ্ঠা ২৬)

১. উক্ত দলিলে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বাক্ষর রয়েছে, অথচ তিনি মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[৪৫]

২. এর মধ্যে সাদ বিন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বাক্ষর রয়েছে; অথচ তিনি খাইবার বিজয়ের বহু আগে খন্দকের যুদ্ধে শহিদ হয়ে গিয়েছেন।[৪৬]

এভাবেই ইতিহাসশাস্ত্রে পণ্ডিত একজন আলেম ইহুদিদের ধোঁকা-প্রতারণার জাল উন্মোচন করেন।

---

[৪৫] এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বক্তব্য রয়েছে যে, তিনি গোপনে ৬ হিজরিতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে মক্কা থেকে হিজরত করেননি। [তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/৩০৬]

এই দ্বিতীয় মতটি মানলেও বক্তব্য আগের মতোই বিদ্যমান থাকে। কারণ হজরত মুয়াবিয়া রা. গাজওয়া খায়বারে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য। তিনি সেসময় মক্কায় ছিলেন।

[৪৬] খতিব বাগদাদির এর এই সময়োচিত ঘটনা আদ্যোপান্ত নকল করেছেন ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.। দেখুন আলমুনতাজাম; ইবনুল জাওযি: ১৬/১২৯।

এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি ঘটনা রয়েছে অষ্টম হিজরির ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ব্যাপারে। তার খাস শাগরিদ ইমাম ইবনু কাইয়িম আলজাওযিয়্যাহ রহ. বর্ণনা করেছেন, ইহুদিরা সাহাবায়ে কেরামের স্বাক্ষরসংবলিত একটি দলিল পেশ করে, যা খায়বারের ইহুদিদের জিজিয়া মাফ করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. উক্ত দলিলটি জাল হওয়ার দশটি প্রমাণ পেশ করেন। তন্মধ্যে একটি প্রমাণ ছিল যে, উক্ত নথিতে জিজিয়া মাফ করে দেওয়ার কথা এসেছে। অথচ জিজিয়ার বিধান ৯ম হিজরিতে গাজওয়া তাবুকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আরেকটি প্রমাণ হলো, উক্ত নথিতে ইহুদিদের থেকে বিনাপারিশ্রমিকে কাজ করার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। অথচ মুসলমানদের কাছে ইহুদি এবং অন্য কেউ, কারো ব্যাপারেই বেগার খাটানোর কোনো প্রচলন নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম এই ধরনের অন্যায় এবং জুলুম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। বেগার খাটানোর রেওয়ায়েজ পরবর্তী অত্যাচারী বাদশাহদের যুগে আরম্ভ হয়েছে। [যাদুল মাআদ: ৩/১৩৮]

উসুল ছাড়া ইতিহাস পড়ার ক্ষতি

যেকোনো ভালো জিনিস যখনই নিয়ম ছাড়া ব্যবহৃত হয়, তখন তা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। মধু একপ্রকার ওষুধ। কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত সেবন করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ইতিহাসশাস্ত্রেরও কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ না রাখার দরুন বহু ইতিহাসের শিক্ষক ও পাঠক নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পূর্বসূরিদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কারণ :

১. ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থসমূহে ভ্রান্ত ফেরকার রাবিরা জায়গায় জায়গায় তাদের বানোয়াট রেওয়ায়েত ছড়িয়ে রেখেছে। ঐসব রেওয়ায়েত পর্যালোচনা ও পরিশুদ্ধির কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়নি। এসব বিষয় কেবল প্রাজ্ঞ আলেমগণই শনাক্ত করতে পারেন। অজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞানীরা সেসব রেওয়ায়েত বিশ্বাস করে নেবে এবং কোনো-না-কোনো ভ্রান্ত চিন্তা ভেতরে ঢুকে পড়বে।

২. ইতিহাসের কিছু বিপজ্জনক জালে ফেঁসে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ইতিহাসে ঘটনার বিবরণ আসে ঠিক; কিন্তু তার কারণ, প্রেক্ষাপট এবং বিশ্লেষণ খুব কমই এসে থাকে। ফলে এতে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। যদি কারো মধ্যে সচেতনতা, সূক্ষ্ম মেধা এবং ন্যায়নিষ্ঠা না থাকে, তা হলে এর মাধ্যমে অবান্তর ঘটনাও তৈরি হতে পারে। অনুমাননির্ভর কাহিনি সামনে আসবে। আর এ ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয় দুই কারণে :

ক. কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত না থাকা।

খ. বিদ্বেষ ও জেদ।

উদাহরণত বলা যায়, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিন ১টা বাজে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। একজন তাকে দেখে ভাবে সে হয়তো কোনো গোয়েন্দাপুলিশ। গোপনে কাউকে নজরদারি করছে। আরেকজন মন্তব্য করে, সে একজন সাধারণ মানুষ। এমনিতেই

পায়চারি করতে বের হয়েছে। কেউ এটাও বলতে পারে যে, সে মানসিক রোগী। এখানে অযথাই দাঁড়িয়ে থাকে। কেউবা শত্রুতাবশত এটাও বলতে পারে যে, সে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য মোক্ষম সুযোগের সন্ধান করছে। উপর্যুক্ত সবকটি অনুমান সম্ভব হলেও অমূলক। বরং সে একজন চাকুরিজীবী। অফিসে যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

উদাহরণ দ্বারা বুঝতে পারলাম, একই ঘটনা থেকে কীভাবে একাধিক ধারণা সৃষ্টি হয় এবং অনেক অলীক গল্পও তৈরি হয়ে যেতে পারে। ইতিহাস মানেই ঘটনাবলির সংকলন। কেউ যদি ঘটনা থেকে ফল বের করতে চায় কিংবা বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ করতে চায়, তা হলে তাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া আবশ্যক। বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার এই ধাপ একজন ঐতিহাসিকই কেবল অতিক্রম করতে পারে। তিনি যদি সতর্ক এবং ন্যায়নিষ্ঠ না হন, তা হলে এক্ষেত্রে তিনিও মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার মাধ্যম হতে পারেন।

৩. মানুষ ইতিহাস এবং ইতিহাসদর্শন (যার সিংহভাগ ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত) পড়ে এবং পাঠদান করে, কিন্তু তারা ইতিহাসের ঐসব মূলনীতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে অনবগত থাকে, যা মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রণয়ন করেছেন। যেকোনো জ্ঞান ও শাস্ত্র যখন তার মূলনীতি ছাড়া অর্জন করা হবে, তখন অবশ্যই গোমরাহি এবং চিন্তাগত সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে।

৪. ইতিহাস এবং তার মূলনীতিরও আগে একজন মুসলমানের জন্য আকিদা, শরিয়তের বিধান, সিরাতুন নবী, উসুলে হাদিস এবং রিজালশাস্ত্রের জরুরি জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো মানুষ সহিহ আকিদা সম্পর্কেই অজ্ঞ। অথচ ইসলামি যেকোনো বিষয়ে কাজ করার জন্য প্রথমে উল্লিখিত ইলমগুলো জরুরি। এসব নীতি বর্জন করার ফলে ইতিহাসের এমন মসৃণ ও পিচ্ছিল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং চিন্তাগত গোমরাহির শিকার হওয়াটাই যৌক্তিক।

৫. আমাদের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ আরবি-ফারসি ভাষা না জানার দরুন প্রকৃত ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না। উর্দু কিংবা ইংরেজি অনুবাদের উপর দিয়েই চালিয়ে দেন। এভাবে ইতিহাসশাস্ত্রে গভীরতা অর্জন হবে না।

৬. ইংরেজিচর্চার কারণে ইতিহাস অধ্যয়নকারীদের অধিকাংশই প্রাচ্যবিদদের বইপত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করা আরম্ভ করে। অথচ তাদের বইপত্র ক্ষতিকর দর্শন ও চিন্তাবিধ্বংসী বিষ দিয়ে ভরপুর। কেবল আল্লাহ তায়ালাই তাদের দীন ও ঈমান হেফাজত করতে পারেন।

৭. কিছু ইতিহাসবিদ রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে জানাশোনা না থাকার দরুন মিথ্যুক রাবিদের রেওয়ায়েতও অহির মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

৮. কিছু লোক রেওয়ায়েতশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন কোনো রেওয়ায়েতে এলোমেলো তথ্য দেখেই রাবির ব্যাপারে কঠোর মন্তব্য করে বসে। তাদের কেউ কেউ তো সিরাত ও ইতিহাসের মৌলিক সূত্রগুলোকেও মুনাফিক এবং অগ্নিপূজকদের কল্পকাহিনি বলে আখ্যা দেয়। আর কতিপয় লোক এ ধরনের কোনো তথ্য হাদিসের ভাণ্ডারে পেয়ে হাদিস পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে।

আলি তানতাবির দৃষ্টিতে মুসলিম ইতিহাসবিদের গুণাবলি

ইতিহাসের এসব ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে সতর্ক করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আলেম শায়েখ আলি তানতাবি বলেন, 'ঐতিহাসিকদের রেওয়ায়েত সাধারণ মানের হয়ে থাকে। ইলমি মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ কেবল মুহাদ্দিসদের রেওয়ায়েত। এ কারণেই আমাদের ইতিহাসের প্রথম সূত্র মুহাদ্দিসদের রেওয়ায়েতসমূহ। যে ব্যক্তি মুহাদ্দিসদের পরিভাষা ও বিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, তাকে ইতিহাসবিদ বলে গণ্য করা হবে না।'

এরপর তিনি লেখেন, যে গবেষক নিজের গবেষণাকর্মে 'তারিখুত তাবারি'র পৃষ্ঠানম্বর দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে সে নিজেই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, সে অন্ধকারে খড়ি সংগ্রহকারী; কোন্‌টা নিতে হবে আর কোন্‌টা ছাড়তে হবে কিছুই তার জানা নেই। মুসলিম ঐতিহাসিক কিংবা ইসলামি ইতিহাসের উসতাদ এমন ব্যক্তিই হতে

পারেন, যিনি রিজালশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী, তাদের পরিচিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত, ইলমে হাদিস ও তার উসুল জানেন, আরবিভাষায় পারদর্শী, আরবিভাষার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অর্থ ও মর্মের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন, তার ইশারা-কিনায়ার (ইঙ্গিত-রূপক) অর্থ বুঝতে পারেন, পক্ষপাতিত্ব এবং স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হন, এবং যিনি সত্যান্বেষী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারী হন।

তার মধ্যে যদি এসব গুণ না থাকে, তা হলে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাবেন তিনি; কিংবা তিনি ধোঁকাবাজ প্রমাণিত হবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা উচ্চ সার্টিফিকেটধারীই হোন না কেন। কারণ, সরকারি প্রতিষ্ঠান যেকোনো ব্যক্তিকেই তার ডিগ্রি দেখে অধ্যাপক নিয়োগ দিতে পারে এবং যেকেউ ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করতে পারে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্র মূর্খকে আলেম, পক্ষপাতকারীকে নিরপেক্ষ, ধোঁকাবাজকে সত্যবাদী করে দিতে পারে না।[৪৭]

[৪৭] কিসাসুন মিনাত তারিখ, আলি তানতাবি, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৩, ১৪ (দারুল মানারাহ, সাউদি সংস্করণ)

ইতিহাসের প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে ইতিহাস দুই প্রকার। সাধারণ ইতিহাস আর বিশেষ ইতিহাস। সাধারণ ইতিহাস হলো সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাস অনুসন্ধান করা। যেমন : তারিখে ইয়াকুবিকে আমরা সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থের আওতায় আনতে পারি। বিশেষ ইতিহাস নির্দিষ্ট কোনো জাতি, রাজা বা রাজ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে রচিত। যেমন : ইসলামের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, চীনের ইতিহাস, তুরস্কের ইতিহাস ইত্যাদি।

ইসলামের ইতিহাস নাকি মুসলমানদের ইতিহাস

বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের আলোচ্যবিষয় ইসলামের ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ইতিহাস। কেননা, বাহ্যত ইসলামের ইতিহাস শিরোনাম থেকেই যেমন বুঝা যাচ্ছে, তেমন নিছক কোনো মতবাদের ইতিহাস নয়।

মতবাদের ইতিহাস হলো, যেখানে মতবাদের সূচনা, তার প্রচার-প্রসার, সেই মতবাদের প্রবর্তকের জীবনী এবং তার গুরুত্বপূর্ণ অনুসারীদের আলোচনা, যারা মতবাদপ্রসারে অবদান রেখেছে। উপরন্তু এই মতবাদের প্রতি মানুষের বিমুখতা, তার গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যতা এবং এটি ফেরকায় রূপান্তরিত হওয়ার পর সেই মতাদর্শের অনুসারীদের আলোচনা সালভিত্তিক বিস্তারিত উল্লেখ করা। যেমন আল্লামা শাহরাস্তানি রচিত 'আলমিলাল ওয়ান নিহাল' কিতাবটি। এতে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সময়ে মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহুম) এর লিখিত 'ইসাইয়্যাত কেয়া হ্যাঁ?', খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

'মতাদর্শের ইতিহাস' মর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে সিরাতুন-নবী এবং সাহাবা-চরিতকে নিঃসন্দেহে মতাদর্শের ইতিহাস বলে অভিহিত

করা যায়। কিন্তু পরবর্তীযুগের মুসলমানদের ইতিহাসের উপর 'মতাদর্শের ইতিহাস' প্রয়োগ করা যায় না।

এটা স্বীকৃত যে, ইসলামের প্রসারের চেষ্টা, অমুসলিমদের দাওয়াত, মাদরাসা-মসজিদ ও খানকা নির্মাণ, ইলমি কীর্তি ও অবদানসহ পরবর্তীকালে বহু ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্য এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি কেবল পার্থিব মর্যাদাই রাখে। ফলে আমাদেরও উচিত ইতিহাসের মধ্যে পার্থিব উন্নতি-অগ্রগতি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা। তাই মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, অভ্যুত্থান, বংশীয় ঝগড়া-বিবাদ, পাপিষ্ঠ ও জালেম বাদশাহদের অবস্থা আমরা আমাদের ধর্মীয় ইতিহাস গণ্য করব না। এজন্য ন্যায়সঙ্গত হলো, এমন বলা যে, এটি ইসলামের অনুসারীদের ইতিহাস, যাদের মধ্যে উত্থান-পতন সবই আছে, ধর্মের প্রতি বিরাগ-বিমুখ লোকও আছে।

হিজরি চৌদ্দশ শতাব্দীতে ভালো-মন্দ যেই অবস্থার উদ্ভব হয়, কল্যাণ-অকল্যাণ যত কাজই মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়, আর যখন ইসলামি ইতিহাসের কোনো বইতে সেসব উল্লেখ হয়, তখন এটি মুসলমানদের ইতিহাস বলে সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসের জন্য সাধারণ গ্রন্থাদি, যেমন : তারিখুত তাবারি, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল-কামিল ফিত তারিখ ইত্যাদি কিতাবকে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস হিসেবে পড়া উচিত; ধর্মীয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

ইতিহাসের আরো কিছু প্রকার

ইতিহাসের আনুষঙ্গিক প্রকার অনেক। যেমন: তারিখুস সাহাবা, তারিখুল খুলাফা, তারিখুল মুলুক, তারিখুদ দুওয়াল, তারিখুল মুদুন।

বিভিন্ন ফেরকার দিকে লক্ষ করেও প্রকার বিভক্ত হয়। যেমন: তারিখুস সুন্নাহ, তারিখুশ শিয়া, তারিখুল খাওয়ারিজ, তারিখু কারামিতা, তারিখুল মুতাজিলা।

স্তর বিবেচনায়ও ইতিহাসের একাধিক প্রকার রয়েছে। যেমন: তাবাকাতে আহনাফ, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যা, তাবাকাতে মালিকিয়্যাহ, তাবাকাতুল হানাবিলা।

পদ এবং কর্মব্যস্ততা বিবেচনায়ও ইতিহাসের একাধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন: তারিখুল উযারা, তারিখুল ফুকাহা, তারিখুল কুযাত, তারিখুন নুহাত, তারিখুল আওলিয়া, তারিখুশ শুআরা, তারিখুল উদাবা।

ইতিহাসের নতুন কিছু বিষয় : ইসলামি বিশেষ হালচাল, ইসলামি সংগঠন, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি প্রচারমাধ্যম, প্রাচ্যবিদ্যার ইতিহাস, চিন্তা-নৈতিক আগ্রাসনের ইতিহাস।

ইতিহাস-গবেষকদের সূত্রসমূহ

ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত সর্বদা চার ধরনের সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

১. ঐতিহাসিকের প্রত্যক্ষদর্শন।
২. বংশপরম্পরায় চলে আসা রেওয়ায়েত।
৩. লিখিত তথ্য-উপাত্ত।
৪. প্রাচীন নিদর্শন।

ঐতিহাসিকের প্রত্যক্ষদর্শন

ইতিহাস-রচয়িতা যদি তার জীবদ্দশায় দেখা কিংবা তার যুগের চাক্ষুষ ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করে, একে প্রত্যক্ষদর্শন বলে অভিহিত করা হয়। যেমন : মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন বাবর লিখিত 'তুজুকে বাবরি', আফগান-শাসক আবদুর রহমানের 'তাজুত তাওয়ারিখ' তাদের স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলির উপর নির্ভর করে রচিত। এ ধরনের রচনা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে শর্ত হলো তৎকালীন ঐতিহাসিকদের তথ্য এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া।

বংশপরম্পরায় চলে আসা রেওয়ায়েত

ইতিহাস সংগ্রহের দ্বিতীয় প্রকার সূত্রকে 'আছারে মানকুলাহ' বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব তথ্য-উপাত্ত, যা ইতিহাসবিদ তার সমসাময়িক লোকদের থেকে শোনেন। তন্মধ্যে রাজদরবারের আমির, শাসক, দূত, ওলামা, সেনাকর্মকর্তা, সৈনিক, ব্যবসায়ী, পর্যটক, বয়োবৃদ্ধ এবং এমন সাধারণ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যে বর্তমান অবস্থা কিংবা নিকট অতীত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং সে নির্ভরযোগ্য।

লিখিত তথ্য-উপাত্ত

এটা পরিষ্কার কথা যে, একজন ঐতিহাসিক প্রতিটি জিনিস নিজের দেখা, প্রতিটি কথা রাবির থেকে শোনা সম্ভব নয়; তাকে এর তাফসিল জানতে হলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। বিশেষ করে তার পূর্ববর্তী জমানার ইতিহাস অন্যান্য মাধ্যম থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এই মাধ্যম যদি লিখিত থাকে, তা হলে একে 'আছারে মানকুলাহ' বলা হবে। হস্তলিপি, নির্দেশনামা, রসিদ, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সরকারি নথিপত্র এবং সবধরনের লিখিত তথ্য এর মধ্যে শামিল। ইতিহাস-লেখকদের জন্য পূর্ববর্তী জমানার কিতাবসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, অধিকাংশ সময় দীর্ঘ কাল ও সময়ের ব্যবধানের দরুন পূর্ববর্তী সময়কালের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো মাধ্যম থাকে না। বিগত যুগের কিতাবাদি থেকেই উপকৃত হতে হয়। যেমন ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম হিজরি শতাব্দীর ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনুল জাওযি, আল্লামা ইবনুল আসির, হাফেজ জাহাবি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) চতুর্থ হিজরি পর্যন্ত ঘটনাবলির তথ্য অধিক পরিমাণে তারিখুত তাবারি থেকে সংগ্রহ করেছেন। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. 'বিদায়া নিহায়া' গ্রন্থে সপ্তম শতাব্দীর তাতারি ফেতনার বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা ইবনে আছীরের 'আল-কামিল ফিত তারিখ' থেকে নিয়েছেন।

একজন উচ্চ মানসম্পন্ন ঐতিহাসিক সবধরনের লিখিত তথ্য-উপাত্তের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কেবল নিজের লাইব্রেরিতে বিদ্যমান কিতাবের উপর ক্ষান্ত থাকেন না। তবে তিনি উপকৃত-হওয়া সকল কিতাবের রেফারেন্স অবশ্যই উল্লেখ করেন।

প্রাচীন নিদর্শন

ইতিহাস সংগ্রহের চতুর্থ প্রকার মাধ্যম হলো প্রাচীন নিদর্শনাদি। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন মহল্লা, প্রাচীন দুর্গ, প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ, বইপুস্তক, আসমানি শাস্তির কারণে ধ্বংস হওয়া সভ্যতা-সংস্কৃতির পুরাকীর্তি। প্রাচীন নিদর্শন থেকে ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা একাধিক সম্ভাবনার মধ্য থেকে একটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে কোনো ঘটনার বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় না।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতি

ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

তারিখ বির রিওয়ায়াহ

ইতিহাসের ঘটনাবলি সনদসহ আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ নিজের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করেন না।

তারিখ বির রিওয়ায়াহ এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারী যে, এখানে ইতিহাসবিদের নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি করার কিংবা খেয়ানত করার আশংকা কম থাকে। তিনি কেবল অনুলিপিকারী সাব্যস্ত হন। ঘটনার ফল বের করা পাঠকের কাজ থাকে। এভাবে অতীতের ইলমি সম্পদ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরবর্তীপ্রজন্মের নিকট পৌঁছে যায়। প্রাচীন কিতাবাদির মধ্যে 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ', 'তারিখুত তাবারি', 'আনসাবুল আশরাফ', 'ফুতুহুল বুলদান' প্রভৃতি গ্রন্থ এই পদ্ধতিতে রচিত। এগুলোর মধ্যে সনদসহ কেবল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সনদ এবং ঘটনার গ্রহণযোগ্যতা এবং অগ্রাহ্যতার সিদ্ধান্ত পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ বির রিওয়ায়াহর দুর্বল দিক হলো, কখনো এখানে কিছু বিবেক ও যুক্তিবহির্ভূত কথাবার্তা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পাঠক যদি সুস্থ রুচিবোধসম্পন্ন না হয়, রিওয়ায়াহ ও দিরায়াহর মূলনীতি সম্পর্কে তার জ্ঞান না থাকে এবং সহিহ-দুর্বল পার্থক্য করতে না পারে, তা হলে তার গোমরাহ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তারিখুত তাবারি, আনসাবুল আশরাফ, তাবাকাত ইবনে সা'দ প্রভৃতিতে ডজন ডজন দুর্বল রেওয়ায়েত রয়েছে, যা অন্যান্য রেওয়ায়েতের সঙ্গে না মিলিয়ে পড়লে মারাত্মক ভ্রান্তি তৈরি হবে। এজন্য আলেমগণ সাধারণ মানুষকে এসব বড় বড় ইতিহাসগ্রন্থ পড়তে নিষেধ করে থাকেন। কারণ, এগুলো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জন্য; সাধারণদের জন্য নয়। যেমনিভাবে কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি সহিহ বুখারি কিংবা সহিহ মুসলিমের অনুবাদ পড়ে নিজে

নিজেই মনমতো ফল বের করা শুরু করে দেয়, তা হলে জায়গায় জায়গায় তার স্খলন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তদ্রূপ তারিখুত তাবারি, তাবাকাতে ইবনে সাদের মতো কিতাবের অনুবাদ পড়লেও সাধারণ মানুষ কঠিন দ্বিধা-সংশয়ের শিকার হবে।

তারিখ বিদ দিরায়াহ

এই পদ্ধতিতে ইতিহাসবিদ কিছু রেওয়ায়েত কিংবা লক্ষণ ঘটনার সঙ্গে মেলান। প্রাচীন নিদর্শন এবং অন্যান্য প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন।

তারিখ বিদ দিরায়াহর ইতিবাচক একটি দিক হলো, তার মধ্যে যুক্তিবহির্ভূত কথাবার্তা থাকার আশংকা নেই। নেতিবাচক দিক হলো, কখনো তার রচনাপদ্ধতি এমন হয় যে, তার কোনো মজবুত ভিত্তি থাকে না। সম্পূর্ণ কাজটাই ঐতিহাসিকের অনুমানের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়। তিনি যে রেওয়ায়েত ইচ্ছা গ্রহণ করবেন এবং যা ইচ্ছা পরিত্যাগ করবেন। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরা পুরাকীর্তি খনন করে মিসর, ব্যবিলন, হার্পা, টেক্সলা, মুইন, জুডর এবং যে প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেছে, সেখানে মানুষকে লাখো বছর পূর্বের সৃষ্টি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর সম্পর্ক তারিখ বিদ দিরায়াহর সাথে। তবে তার কোনো মজবুত ভিত্তি নেই।

যেহেতু মানুষ খুব কমই সাম্প্রদায়িকতা এবং পক্ষপাতমুক্ত হয়, তাই দিরায়াহ বা যুক্তিও খুব স্বল্পই ইনসাফের সঙ্গে ব্যবহার করে। সাধারণত দেরায়েতের নামে নিজের রুচি, ঝোঁক ও আকর্ষণ মোতাবেক পদ্ধতিই প্রাধান্য লাভ করে।

তাই আবশ্যক হলো, দেরায়েত এবং যুক্তিকে রেওয়ায়েতের উপর নিঃশর্তভাবে প্রাধান্য না দেওয়া। দেরায়েতকে শর্ত এবং নিয়ম-নীতির আওতায় আনতে হবে। যেমন : মুতাওয়াতির কিংবা সহিহ রেওয়ায়েতকে দেরায়েত বা যুক্তির দোহাই দিয়ে পরিত্যাগ করা যাবে না। তদ্রূপ যয়িফ রেওয়ায়েতকেও দেরায়েতের ভিত্তিতে কেবল ঐ সুরতে প্রত্যাখ্যান করা যাবে, যখন তাতে কোনো অসম্ভব কিংবা কোনো যুক্তিবহির্ভূত কথা উল্লেখ হবে। কোনো বিষয় বিস্ময়কর, মন্দ, স্বভাববিরোধী কিংবা অস্বাভাবিক হওয়ার দ্বারাই কোনো রেওয়ায়েত

প্রত্যাখ্যাত হয় না। কেননা ইতিহাসে সাধারণত বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক ঘটনাবলিই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

যদি রেওয়ায়েতকে দেরায়েতের ভিত্তিতে নিঃশর্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে ইতিহাসের একটি বড় অংশ পরিত্যাগ করার যুক্তির উপর নির্ভর করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্নমত থাকতে পারে। ফলে যুক্তিনির্ভর ইতিহাসের মধ্যে এ পরিমাণ মতানৈক্য সৃষ্টি হবে যে, যেকোনো ঘটনাকে কোনো একটি সুরতে প্রমাণ করা কেবল মুশকিলই হবে না; বরং অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তারিখ বির রিওয়ায়াহ ওয়াদ দিরায়াহ

তারিখ বির রিওয়ায়াহ ওয়াদ দিরায়াহ হলো, রেওয়ায়েত এবং যুক্তি উভয়টি একসঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হওয়া। মূলভিত্তি রেওয়ায়েতের উপরই থাকে; কিন্তু কোনো পরিত্যাজ্য রেওয়ায়েত নেওয়া হয় না। যেখানেই কোনো সংশয়পূর্ণ রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হবে, সেখানেই পাঠককে সতর্ক করে দেওয়া হবে। ইতিহাস রচনার এ পদ্ধতিটি উত্তম তরিকা। হাফেজ ইবনে কাসিরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া', হাফেজ জাহাবির 'তারিখুল ইসলাম' এবং আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুনের 'তারিখে ইবনে খালদুনে'র একটি বড় অংশ এই পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে।

ইতিহাস লেখার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

ইতিহাস নিয়ে গবেষণা অনেক বড় দায়িত্ব। এর জন্য ইতিহাসবিদ আলেমগণ একজন ঐতিহাসিকের গুণ ও শর্তাবলি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, ঐতিহাসিক যেন তার কর্তব্য পালনে ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দেন।

ঐতিহাসিকের গুণ

আলেমগণ বলেন, ইতিহাসবিদের লেখার আদব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা আবশ্যক। সময় এবং বর্ণনাশৈলীর ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন জরুরি। পক্ষপাতিত্ব, মিথ্যা, প্রতারণা, অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক। কবিতা সম্পর্কে এ পরিমাণ দক্ষতা আবশ্যক, যাতে করে কবিতার মূল অর্থ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন। কারণ, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা কেবল পদ্যাকারে পাওয়া যায়। একজন ঐতিহাসিকের জন্য জরুরি হলো বলা এবং লেখায় স্বচ্ছতার অধিকারী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বভাবের হওয়া, অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা। পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী হওয়া। রেওয়ায়েতের বিচার-বিশ্লেষণ এবং অন্বেষণের জন্য ত্যাগ স্বীকারের হিম্মত রাখা। পাশাপাশি ইতিহাসবিদকে ভূগোল, সভ্যতা, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, সামরিক বিষয়াদি এবং তাদের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

ইতিহাসবিদের একাধিক ভাষায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। বিশেষকরে ঐ জাতির ভাষা জানা জরুরি, যার ইতিহাস তিনি লিখতে চাচ্ছেন। যেমন: মুসলমানদের ইতিহাস সংকলন করার জন্য আরবিভাষা জানা আবশ্যক। মোগল সাম্রাজ্যের সময়ে হিন্দুস্থানের ইতিহাস রচনাকারীর জন্য ফারসিভাষা জানা আবশ্যক। অন্যথায় মূল সূত্রগ্রন্থ পড়া সম্ভব নয়।

ইতিহাসবিষয়ক রেওয়ায়েত উল্লেখ করার শর্ত

১. রাবির বর্ণিত হুবহু শব্দে উল্লেখ করা, ভাবার্থ নয়।
২. রাবির নাম পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা (আর যদি কোনো কিতাব থেকে সংগৃহীত হয়, তা হলে সুস্পষ্ট রেফারেন্স উল্লেখ করা)।
৩. এমন ভাষা ও শব্দে ঘটনা বর্ণনা করা, যেন পাঠকদের সামনে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৪. ঘটনার বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা। যেকোনো পক্ষপাতিত্ব থেকে বেঁচে থাকা।

৫. কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা যদি কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তা হলে কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করে অপরটি পরিত্যাগ করা। কারণ, কুরআন-হাদিস নিয়ে যে গবেষণা এবং ঘাম ঝরানো হয়েছে, তা ইতিহাসের বেলায় হয়নি।

৬. যেখানে পূর্ববর্তী গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের উপর আপত্তি, অপবাদ ও দোষারোপ করা হবে, সে রেওয়ায়েত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং চিন্তাফিকির ও তাহকিকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া। কেননা, যাদের সততা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত, তারা কোনো ব্যক্তির অপবাদের মাধ্যমে নিন্দিত হন না।[৪৮]

জীবনীকারদের জন্য শর্তাবলি

১. যার জীবনী আলোচনা করা হবে, তার ইলমি, দীনি, মতাদর্শগত অবস্থা এবং অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

২. তার ব্যাপারে প্রশংসা কিংবা নিন্দাসূচক শব্দ ও উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায়-নিষ্ঠা প্রদর্শন করা।

৩. জীবনীকারকে ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কেবল কারো প্রতি মহব্বত থাকার কারণে তার প্রশংসা করা, কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকার দরুন নিন্দা করার মানসিকতা না রাখা। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থাকা যাবে না, যার ফলে সর্বাবস্থায় তার পক্ষপাতিত্ব করবে এবং দূরত্বও থাকা যাবে না, যদ্দরুন তাকে অসম্মান করবে।

৪. জীবনীকারের প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক।[৪৯]

ইতিহাস ও হাদিসের রেওয়ায়েতের মাঝে পার্থক্য

ইতিহাস এবং হাদিস বর্ণনার কিছু যৌথ শর্ত রয়েছে। যেমন : রাবির আকেল বা বুদ্ধিমান হওয়া, স্মৃতিশক্তি ভালো থাকা, ধার্মিক হওয়া। তবে কিছু বিষয়ে ইতিহাস বর্ণনা ও হাদিস বর্ণনা থেকে পৃথক। যেমনঃ হাদিস

---

[৪৮] কাইদাতুন ফিল মুআররিখিন, আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকি, পৃষ্ঠা ৩, ৪ (দারুল বাশাইর, বৈরুত সংস্করণ)

[৪৯] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা ১৩০, কাইদাতুন ফিল মুআররিখিন, আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকি, পৃষ্ঠা ৭, ৬

বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের তাহকিকের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রেই কেবল সনদের তাহকিক করার প্রয়োজন রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের সনদের তাহকিক করা জরুরি, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. যেসব রেওয়ায়েত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কীর্তি এবং গুণাবলি সংশ্লিষ্ট।
২. যেসব রেওয়ায়েত ইসলামি ব্যক্তিত্ব, নেককার পূর্বসূরি এবং ইসলামের বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপর আপত্তি তোলার দ্বার উন্মুক্ত করে।
৩. যেসব রেওয়ায়েত আকিদা-বিশ্বাস ও হালাল-হারামের মাসআলার উপর আক্রমণ হয়।

উল্লিখিত তিন স্থান ছাড়া ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহ খুব ব্যাপকতার সঙ্গেই সংগ্রহ করা যায়। যয়িফ রেওয়ায়েতও গ্রহণ করা যায়, যেন অধিক পরিমাণে ঘটনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও সংরক্ষিত থাকে। ইতিহাসবিদ মানুষকে কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং মন্দের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যও দুর্বল রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে পারেন। তবে এসব রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পাশাপাশি তার দুর্বলতাও পরিষ্কার বলে দেবেন।[৫০]

তাই গবেষক আলেমগণ ওয়াকিদি ও মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মতো ইতিহাসের রাবিদের রেওয়ায়েত শরিয়তের মাসআলার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন না। তবে সিরাতুন-নবী এবং মাগাজির বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের রেওয়ায়েতের সাহায্য নেওয়া হয়।[৫১]

ঐতিহাসিক সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের থেকেও রেওয়ায়েত গ্রহণ করা যায়। হাদিস শরিফে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা বনি ইসরাইলের রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে পারো, এতে কোনো সমস্যা নেই।'[৫২]

---

[৫০] আলমুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ, আল্লামা কাফিজি, পৃষ্ঠা ৭১, দিরাসাত তারিখিয়্যাহ, ডক্টর আকরাম যিয়া উমারি, পৃষ্ঠা ২৭

[৫১] এজন্যই ইমাম বুখারি রহ. এর মতো এমন সতর্ক মুহাদ্দিস তার সহিহ বুখারিতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে ২৪টি স্থানে তা'লিকান রেওয়ায়েত এনেছেন এবং তার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণও পেশ করে থাকেন।

[৫২] সহিহ বুখারি: হাদিস নং ২৪৬১, কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া, বাবু মা যুকিরা আন বানি ইসরাইল)

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি এবং প্রখ্যাত ইতিহাসবিদগণ

ওয়াকিদির গ্রন্থাবলি

মুহাম্মদ বিন উমর আলওয়াকিদি ইতিহাসের বড় হাফেজ ছিলেন। নিম্নোক্ত কিতাবগুলো তার বিখ্যাত রচনা।

আল-মাগাজি, আস-সিরাহ, আযওয়াজুন নবী, আর-রিদ্দাহ, আখবারু মাক্কাহ, আত-তাবাকাত, ফুতুহুল ইরাক, ফুতুহুশ শাম, মাকতালুল হুসাইন, আলজামাল, সিফফিন।

ওয়াকিদি ১৩০ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফিয়ান সাওরির ছাত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় হাদিস ও ইতিহাসবিষয়ক রেওয়ায়েত সংকলন করেন। ১৭০ হিজরিতে তিনি বাগদাদ চলে যান। ইতিহাসের প্রতি তার অনুরাগ ছিল প্রচণ্ড। সেখানে গিয়ে ঐতিহাসিক স্থানগুলোর পরিচয় লাভের জন্য বিচরণ করতে থাকেন। হারুনুর রশিদ এমন একজন ব্যক্তির খোঁজ করছিলেন, যিনি সিরাত এবং নবীজির সময়ের নিদর্শনাবলি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। তখন উজির খালিদ বিন ইয়াহইয়া বারমাকি ওয়াকিদিকে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। এর ফলে ওয়াকিদির আব্বাসীয় রাজপ্রাসাদে আসার সুযোগ হয়। খলিফা মামুনের যুগে ওয়াকিদির পদোন্নতি ঘটে এবং বাগদাদের কাজি নিযুক্ত হন। ২০৭ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

ওয়াকিদির গ্রন্থাদি ভালো-মন্দ রেওয়ায়েতে ভরা। তার 'আলমাগাজি'-গ্রন্থে সিরাতের ঘটনাবলি, বিশেষ করে, যুদ্ধাভিযানগুলো তথ্যসমৃদ্ধ আকারে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থটির যতই প্রশংসা করা হবে কম মনে হবে। অপরদিকে 'মাকতালুল হুসাইন', 'আলজামাল' এবং 'কিতাবুস

عن عبد الله عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بين إسرائيل ولا حرج

সিফফিনে’ অধিক পরিমাণে অনির্ভরযোগ্য রাবিদের থেকে রেওয়ায়েত নিয়েছেন। এজন্য ওয়াকিদিকে দুর্বল রাবি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। বরং ইবনে নাদিম (যে নিজেই শিয়া মতাবলম্বী) তো ওয়াকিদিকে শিয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন; যদিও ইবনে নাদিমের এই বক্তব্য সঠিক নয় এবং গবেষক আলেমগণ তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো ওয়াকিদির বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাহাবায়ে কেরামের কীর্তি ও অবদানের অসমীচীন চিত্রায়ণ করে থাকে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ ওয়াকিদির সূত্রে হাদিস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাধারণত সতর্কতা অবলম্বন করেন। তবে তার যেসব রেওয়ায়েত সাহাবায়ে কেরামের দোষারোপমুক্ত, সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত তারা গ্রহণ করে থাকেন।

আল্লামা খাইরুদ্দীন যিরিকলির মত অনুযায়ী অধিকাংশ পুস্তিকার সম্বন্ধ তার দিকে করা ঠিক নয়। তবে ঐসব রেওয়ায়েত নিঃসন্দেহে তারই, যা তার একান্ত শিষ্য মুহাম্মদ বিন সাদ তাবাকাতে ইবনে সাদে উল্লেখ করেছেন।[৫৩]

আল-মাআরিফ

এই কিতাবের লেখক হলেন ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি। ২১৩ হিজরিতে তার জন্ম এবং ২৭০ হিজরিতে মৃত্যু। কোনো কোনো জীবনীকার তাকে কাররামিয়া ফেরকার লোক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু খতিব বাগদাদির মত অনুযায়ী তিনি সম্মানিত এবং নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

‘আল-মাআরিফ’ গ্রন্থে তিনি আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে নিয়ে নিজের যুগ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। পৃথিবী এবং আরবের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন।

আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ

আল-ইমামাহ ওয়াসসিয়াসাহর সম্বন্ধও ইবনে কুতাইবার দিকে করা হয়। এ গ্রন্থে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ঘটনার বিবরণ শুরু করেন। প্রত্যেক যুগের খলিফা সম্পর্কে রেওয়ায়েতগুলো একসাথে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।

[৫৩] আলআলাম, যিরিকলি: ৬/৩১১

আল-মাআরিফের মতো এই গ্রন্থেও প্রচুর যয়িফ রেওয়ায়েত রয়েছে। 'উয়ুনুল আখবার' নামে খ্যাত ইবনে কুতাইবার আরেকটি সাহিত্য ও ইতিহাসবিষয়ক রচনা রয়েছে।

তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত

এটি ইমাম খলিফা বিন খাইয়াত রহ. (মৃত্যু : ২৪০ হিজরি) এর রচনা। এতে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পর থেকে আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যুগ পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করেন। সালের বিন্যাসের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রেখে সংক্ষিপ্তভাবে ইতিহাস তুলে ধরা এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেখক অধিকাংশ রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য রাবিদের থেকে নিয়েছেন। এটিই মুসলমানদের সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসগ্রন্থ বলে পরিগণিত হয়।

আততাবাকাতুল কুবরা

এটি মুহাম্মদ বিন সাদ রহ. (মৃত্যু : ২৩০ হিজরি) এর রচিত গ্রন্থ। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ওয়াকিদির কাতেব হিসেবে থাকেন। তার বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসেবে 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ'র নাম উল্লেখ করা হয়। এখানে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস আলোচনা করা হয়নি। বরং কবিলা এবং স্তরভিত্তিক মনীষীদের জীবনী উল্লেখ হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের বিরাট সম্ভার সনদসহ সংকলিত হয়েছে। এজন্য কোনো ঐতিহাসিকই এই কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না।

ফুতুহুল বুলদান-আনসাবুল আশরাফ

এই কিতাব-দুটি আবু জাফর ইয়াহইয়া বালাযুরি লিখিত। তিনি দ্বিতীয় হিজরিশতাব্দীর শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ২৭৯ হিজরিতে ইনতেকাল করেছেন। আরবিভাষার পাশাপাশি তিনি ফারসিতেও পারদর্শী ছিলেন। তাই অনারব ঐতিহাসিকসূত্র থেকেও উপকৃত হয়েছেন। 'ফুতুহুল বুলদানে' তিনি অনেক সতর্কতা এবং সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে নিজের যুগ পর্যন্ত একেক নগরীর বিজয়াভিযানের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি

সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভূগোল, রাজনীতি এবং ব্যবস্থাপনাগত বিষয়গুলোর বর্ণনা দিয়েছেন।

আনসাবুল আশরাফ 'তাবাকাতে ইবনে সাদে'র পদ্ধতিতে রচিত। এটিও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের অনেক বড় ভাণ্ডার।

আল-আখবারুত তিওয়াল

আবু হানিফা দিনাওয়ারির রচনা। তিনি পারস্যবংশোদ্ভূত ছিলেন। ২৮২ হিজরিতে তার ইনতেকাল হয়। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে তিনি আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে ইরান এবং রোমান রাজাদের জীবনী আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অংশে মুসলমান এবং ইরানিদের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। কারবালা, জামাল, সিফফিনের আলোচনাও এনেছেন। তবে অধিকাংশ রেওয়ায়েতই শিয়া রাবিদের থেকে নিয়েছেন। শিয়া রাবিদের থেকে গৃহীত অংশটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

তারিখে ইয়াকুবি

আহমাদ বিন আবু ইয়াকুব (মৃত্যু : ২৯৫ হিজরি) এর রচনা। সংক্ষিপ্তভাবে তিনি পুরো দুনিয়ার ইতিহাস লিখেছেন। রোম, পারস্য, তুর্কিস্তান, চীন, গ্রিক, হিন্দুস্থান, ব্যবিলন, মিসর, আরব, হাবশা এবং আফ্রিকা সম্পর্কে যত রেওয়ায়েত রয়েছে, তা-ই তিনি উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন আবু ইয়াকুব শিয়া মতাবলম্বী ঐতিহাসিক ছিলেন। তার কিছু রেওয়ায়েত সংশয়পূর্ণ আর কিছু বানোয়াট।

ইতিহাস বিশ্বকোষসমূহ

ইতিহাসের কিছু গ্রন্থ 'বিশ্বকোষ'-এর মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ এগুলোর লেখকগণ তাদের হাতে থাকা ঐতিহাসিক তথ্য এবং গ্রন্থাদি থেকে বিশেষ এক বিন্যাসে তথ্য সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে পাঁচটি গ্রন্থ সর্বশীর্ষে :

১. তারিখুত তাবারি।
২. আল-কামিল ফিত তারিখ।
৩. তারিখুল ইসলাম।
৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।
৫. তারিখে ইবনে খালদুন।

নিম্নে আমরা উল্লিখিত কিতাব ও তার লেখকদের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর রচনাশৈলীও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

তারিখুত তাবারি

এর আসল নাম তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক। একে তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুকও বলা হয়। এর লেখক আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াজিদ আততাবারি। তিনি আহলে সুন্নাহর আলেম ছিলেন। তার নামে আরেকজন শিয়া মতাবলম্বী ইতিহাসবিদ রয়েছে। তার নাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তাম আততাবারি। নামের সাদৃশ্যের কারণে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সুন্নি তাবারিকে শিয়া তাবারি ধারণা করা হয়। উভয়কে চেনার জন্য মনে রাখবেন, যেই তাবারি ইয়াজিদ নামক আরব লোকের দৌহিত্র, তিনি সুন্নি; আর যে তাবারি পারসিক রুস্তামের বংশধর, সে শিয়া মতাবলম্বী।

মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াজিদ আত-তাবারি ২২৫ হিজরিতে তাবারিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। মিসর, শাম এবং অন্যান্য নগরীর বিভিন্ন আলেম থেকে হাদিস, কেরাত এবং ফিকহের ইলম অর্জন করেন। সর্বশেষ তিনি বাগদাদে আগমন করেন। এখানে তিনি হাদিসের দরস, ফতোয়া প্রদান এবং লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি লেখালেখি ও রচনায় নিমগ্ন হয়ে যান এবং উম্মাহকে অনেক উপকারী গ্রন্থ উপহার দেন। তাবারি রহ. উক্ত কর্মে এতই নিমজ্জিত হন যে, বিয়ে করারও সুযোগ হয়নি। ৩১০ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

ইবনে জারির তাবারি রহ. অনেক বড় মুত্তাকি, যাহেদ ও আবেদ ছিলেন। সারাজীবন তিনি সরকারি দায়িত্ব এবং শাসকদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে নির্জনে বসে ইলমি কাজে নিমগ্ন ছিলেন। জরাহ ও তাদিলের ইমামদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি তৎকালীন সেরা আলেম ও ফকিহ ছিলেন। তাফসির, হাদিস, ইলমে রিজাল, ফিকহ এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাফসিরে তার দক্ষতার দলিল হলো তাফসিরে তাবারি; ফিকহ, হাদিস এবং ইলম রিজালে তার অনবদ্য রচনা হলো 'তাহজিবুল আছার' আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার

গভীর জ্ঞানের প্রমাণ 'তারিখুল মুলুকি ওয়াল উমাম' থেকে পাওয়া যায়।[৫৪]

ইমাম তাবারি রহ. এই ইতিহাসগ্রন্থে নবী-রাসুল থেকে শুরু করে ৩০২ হিজরির ঘটনাবলি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে নববিযুগ, খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে বনু উমাইয়া ছাড়াও বনু আব্বাসের আট দশকের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেহেতু এই গ্রন্থ পরবর্তী অধিকাংশ ইসলামি ইতিহাসগ্রন্থে দ্বিতীয় হিজরি পর্যন্ত মৌলিক সূত্রগ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়িত হয়ে আসছে; তাই তাবারির সূত্রসম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক।

তারিখুত তাবারি আটটি অংশে বিভক্ত এবং এগুলোর ক্ষেত্রে তার সূত্র হলো নিম্নরূপ :

১. নবীদের জীবনচরিত : এর জন্য তিনি তাফসির, হাদিস এবং ইসরাইলি রেওয়ায়েত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
২. ইরান ও পারস্যের ইতিহাস : এর সূত্র হলো পারস্যবাসীর গ্রন্থাদি, ইবনে মুকাফফা এবং হিশাম কালবির রেওয়ায়েত।
৩. রোমানদের ইতিহাস : ইউরোপিয়ানদের রচিত গ্রন্থের আরবি অনুবাদ থেকে চয়িত।
৪. ইসলামপূর্ব আরবদের ইতিহাস : উবাইদ বিন শারিয়্যাহ, ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ, মুহাম্মদ বিন কাব কুরাযি এবং হিশাম কালবির রেওয়ায়েত।
৫. সিরাতুন-নবী : আবান বিন উসমান, উরওয়া বিন জুবাইর, ইবনে শিহাব, আসিম বিন উমর, মুসা বিন উকবা এবং ইসহাকের রেওয়ায়েত।
৬. মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং খেলাফতে রাশেদার যুগের বিজয়াভিযান : সাইফ বিন উমর ও আলমাদায়িনি থেকে অধিকাংশ রেওয়ায়েত নেওয়া হয়েছে।
৭. জঙ্গে জামাল ও সিফফিন : আবু মিখনাফ, সাইফ বিন উমর ও আল-মাদায়িনির রেওয়ায়েত সংকলিত হয়েছে।

---

[৫৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৬৭ (আর-রিসালা সংস্করণ)

৮. উমাইয়াদের ইতিহাস : উওয়ানা বিন হাকাম, আল-মাদায়িনি, ওয়াকিদি, হিশাম বিন কালবির রেওয়ায়েত।

৯. আব্বাসিদের ইতিহাস : আহমাদ বিন আবু খাইসামা, আহমাদ বিন যুহাইর, মাদায়িনি এবং হাইসাম বিন যুহাইর-এর রেওয়ায়েত।

তারিখুত তাবারির বৈশিষ্ট্য

১. প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থসমূহের মধ্যে তারিখুত তাবারির রচনাকাল নববিযুগ এবং সাহাবিদের অনেক নিকটতম।

২. এর মধ্যে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, পাঠক যেন তার স্তর নির্ণয় ও যাচাই করতে পারে।

৩. ইতিহাস-লেখক নিজেই বড় ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং মুফাসসির ছিলেন। তাই ঐতিহাসিক হিসেবে তার উপর অধিক নির্ভর করা যায়।

৪. তাবারি তার সূত্রগ্রন্থ থেকে পূর্ণাঙ্গ এবং কোনো পরিবর্ধন ছাড়া রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে থাকেন। এজন্য তারিখুত তাবারির পাঠক পূর্ববর্তী ইতিহাসগ্রন্থের আক্ষরিক অধ্যয়নকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

ত্রুটিসমূহ

ইমাম তাবারি রহ. কোনো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা ছাড়াই রেওয়ায়েত উপস্থাপন করেছেন। রাবি ও রেওয়ায়েতের ব্যাপারে কোনোরূপ আলোচনা করেননি। এজন্য কখনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যে, তাবারি রহ. তার গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল রেওয়ায়েতের সাথে একমত। অপরদিকে যেহেতু ইবনে জারির তাবারির নামেই আরেকজন শিয়া ঐতিহাসিক আছেন। পাশাপাশি তার তারিখুত তাবারিতে যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে; তাই তার ব্যাপারে কেউ কেউ ধারণা করে যে, তিনিও শিয়া ছিলেন। আর এজন্য তার উপর আপত্তিও আরোপ করা হয় যে, তিনি শিয়াদের সমর্থনে এই রেওয়ায়েতগুলো উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এই আপত্তি সঠিক নয়। হাফেজ জাহাবি রহ. উক্ত আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

هذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام والمعتمدين

এটি একটি মিথ্যা অনুমাননির্ভর অপবাদ। ইবনে জারির ইসলামের একজন বড় নির্ভরযোগ্য ইমাম।[৫৫]

সর্বোপরি ইমাম জাহাবি এটুকু স্বীকার করেছেন যে, তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে শিয়াদের প্রতি টান ছিল, যা ক্ষতিকর নয়। এর অর্থ হলো, রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ইমাম তাবারি রহ. আলাবিদের দিকে আকর্ষিত ছিলেন। তবে আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ থেকে বের হয়ে নয়; তার থেকে কোনো ভ্রান্ত আকিদা প্রমাণিত নয়। আর এই কারণেই ইমাম তাবারিকে একজন বড় আলেম এবং তার ইতিহাসগ্রন্থকে ইসলামের সকল যুগে ইসলামি ইতিহাসের মৌলিক সূত্রগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

তারিখুত তাবারি সংশ্লিষ্ট কিছু সংশয়ের জবাব

তবে কথা থেকে যায় যে ঐসব অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত সম্পর্কে, যেগুলো দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে ভ্রান্ত ফেরকাগুলো আপত্তি তুলে থাকে। এর উত্তর ইমাম তাবারি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার এই গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো পাঠকের মনে যদি সংশয় জাগে এবং তা মেনে নিতে কষ্ট হয় তা হলে তার জন্য এটা জেনে রাখা জরুরি যে, আমি উক্ত রেওয়ায়েত নিজ থেকে বানিয়ে লিপিবদ্ধ করিনি; বরং অন্যান্য বর্ণনাকারী থেকেই আমি সংগ্রহ করেছি। আর তাদের থেকে যেভাবে আহরণ করেছি, হুবহু পৌঁছে দিয়েছি।'[৫৬]

এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, লেখক রেওয়ায়েতগুলো সহিহ কিংবা গলদ নির্ণয় করার দায়িত্ব নেননি। তিনি উভয়প্রকারের রেওয়ায়েত জমা করে দিয়েছেন। আর যাচাই-বাছাইয়ের কাজ যোগ্য পাঠক এবং পরবর্তী আলেমদের কাছে সোপর্দ করেছেন। তারাই সহিহ-সাকিম (ভুল-শুদ্ধ) নির্ণয় করে নেবেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, ইমাম তাবারি রহ. তারিখ বির রিওয়ায়াহ তথা সনদসহ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন

---

[৫৫] মিযানুল ইতিদাল: ৩/৪৯৯ (দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত সংস্করণ)

[৫৬] তারিখুত তাবারি- ১/৭, ৮

(فما في كتابي هذا من خبر ليستنكره قارئه أو ليستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له رجها في الصحة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قِبَلنا، إنما أتي من قِبَل ناقليه، وأنا إنما أدّينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا.)

অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিসের এই তরিকা ছিল যে, তারা রেওয়ায়েত উল্লেখ করতেন; কিন্তু এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করতেন না।

কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য কিংবা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত পরবর্তীরা কীভাবে নেবে? এর জন্য তাবারি রহ. প্রতিটি রেওয়ায়েত সনদসহ বর্ণনা করেছেন। রাবিদের অবস্থা যাচাই করে নির্ণয় করা সম্ভব যে কোন্ রেওয়ায়েত কোন্ পর্যায়ের।

কেউ বলতে পারে যে, এমন দুর্বল রেওয়ায়েতের সমাহার না ঘটিয়ে তাবারি রহ. কিতাব না লিখলেই পারতেন। কিন্তু আমরা যদি ইমাম তাবারির ইতিহাস সংকলনের সময়কালের দিকে দৃষ্টি দিই, তা হলে আমাদের নিকট তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সে যুগে নিম্নোক্ত কারণে উক্ত ইতিহাস সংকলিত হয়েছে।

১. সময়টি ছিল হাদিস ও ইতিহাস সংকলনের। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণ তখন প্রত্যেকেই নিজের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করে অধিক পরিমাণে রেওয়ায়েত শোনা, সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার মধ্যে সময় ব্যয় করতেন। কেবলই সহিহ রেওয়ায়েত জমা করার ইচ্ছা অধিকাংশ মুহাদ্দিসেরই ছিল না। তদ্রূপ ইমাম তাবারি রহ. কোনো রেওয়ায়েত যেন বিনষ্ট না হয়, এজন্য একই মলাটে সব জমা করার চেষ্টা করেছেন।

২. সে যুগে রিজালশাস্ত্রে পণ্ডিত আলেমদের আধিক্য থাকায় সহিহ-জয়িফ এবং পরিত্যাজ্য রেওয়ায়েত নির্ণয় করা সহজ ছিল। ইমাম তাবারি রহ. এর সামনে আমাদের ইলমের চরম অবক্ষয়ের জমানা ছিল না। এ যুগে রাবিদের পরিচয় তো দূরের কথা, রেওয়ায়েত সম্পর্কেই কোনো জ্ঞান নেই। আর কারো যদি কোনো রেওয়ায়েত সম্পর্কে জানা থাকে, তা হলে সে কয়েক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করেই 'আল্লামা'য় পরিণত হয় এবং কখনো সাহাবা এবং পূর্বসূরি, কখনো-বা ইতিহাস ও সিরাত-লেখকদের উপর আপত্তি তোলার স্পর্ধা দেখায়।

৩. ঐ জমানায় শিয়া ঐতিহাসিক এবং ভ্রান্ত রাবিদের এমন রচনাও প্রসার লাভ করেছিল, যার মধ্যে দুর্বল রেওয়ায়েত তো ছিলই; কিন্তু তাদের মতাদর্শের বিপরীতে সহিহ রেওয়ায়েতও ছিল না। ইমাম তাবারি রহ. উভয় প্রকারের রেওয়ায়েত জমা করে অনুসন্ধানী আলেমদের সামনে রেখে দিয়েছেন, তারা সহিহ রেওয়ায়েত গ্রহণ

করবেন এবং ভুলটা পরিত্যাগ করবেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট সহিহ-জয়িফ রেওয়ায়েতের তুলনা করার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে কেবল এই গ্রন্থটিই রয়েছে। ইমাম তাবারি রহ. যদি এই গ্রন্থটি রচনা না করতেন, তা হলে আমরা সাহাবিযুগ এবং তাবেয়িদের জীবনী জানতে হলে শিয়াদের কিতাবাদিরই সাহায্য নিতে হতো। কারণ, সে সময় আহলে সুন্নাতের যেসব ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ এবং কলেবর তারিখুত তাবারির এক-চতুর্থাংশও হবে না।

শিয়া রাবিদের রেওয়ায়েত নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? এটা কখনো এজন্য করা হয়েছে যে, অমুক শ্রেণির লোকেরা এ ব্যাপারে কী বলে। কখনো-বা কেবল এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য থাকে যে, প্রতিপক্ষ লোকেরা এমনটি পর্যন্ত বলে থাকে। কখনো-বা রেওয়ায়েতের দুর্বল অংশটির সঙ্গে কোনোরূপ সহমত পোষণ না করে, তারই কিছু অংশ উপকারী বিধায় উদ্ধৃত করা হয়। যেমন : এমন কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা মূল ঘটনার বিক্ষিপ্ত অংশগুলো সুবিন্যস্ত করে। আসল উদ্দেশ্য থাকে আনুষঙ্গিক বিষয় উপস্থাপন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে সতর্কতার প্রমাণ দিতে এবং কাটছাট করার আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য তিনি পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করেন। পাঠকদের উপর আস্থাশীল থাকেন যে, তারা নিজেরাই উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য বুঝে নেবে, কোনোরূপ ভুল-স্খলনের দিকে কান দেবে না।

এ কথাটি একটি উদাহরণসহ বুঝুন। কয়েক বছর পূর্বে মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে হামলা হয়েছে। পত্রপত্রিকায় কয়েক সপ্তাহ ধরে এ সম্পর্কে সংবাদ ও রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় পাকিস্তানি কিছু পত্রিকায়ও ভারতীয় সাংবাদিকদের ভাষ্য ও কলাম প্রকাশিত হয়, যাতে এই হামলাকে সুস্পষ্টভাবে আইএসআইয়ের কারসাজি বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি হামলার বিভিন্ন তফসিল ও বিবরণও দেওয়া হয় যে, হামলাকারীদের নৌকা কীভাবে আসে, তাদের ফোন-রেকর্ড, হামলার পরিকল্পনা কীভাবে হয় ইত্যাদি। এটা তো স্পষ্ট যে, পাকিস্তানি পত্রিকাতে এমন সংবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, প পত্রিকা-সম্পাদকেরা এর মাধ্যমে দাবি করছেন আইএসআই-ই হামলা করিয়েছে। বরং প্রতিপক্ষ ভারতের

মিডিয়াগুলো তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কী বলে যাচ্ছে, তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

কখনো এমন সংশয়পূর্ণ কিংবা মিথ্যা কথা বর্ণনা করার ইতিবাচক দিক এটা হয় যে, মিথ্যার এমন সয়লাবেও দু'চারটি সত্য কথাও থাকে। পাঠকরা যেন এমন কিছু মৌলিক তথ্য জেনে নেয়, যা এতদিন আড়ালে ছিল। কখনো এই আংশিক তথ্য স্বয়ং প্রতিপক্ষ ফেরকার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো বিচক্ষণ ও চতুর সাংবাদিক এ ধরনের প্রতিবেদন এবং সংবাদ থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র তথ্যগুলোর মধ্যে গবেষণা করে প্রতিপক্ষের স্বীকৃত বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে থাকে। তখন প্রতিপক্ষ লজ্জিত হতে বাধ্য হয়।

এ কথা সকলেই জানে যে, এসব প্রতিবেদনের শুরুতে যদি সম্পাদক কোনো সংশোধনী নোট সংযুক্ত করে দেন যে, প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের সাথে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের একাত্ম হওয়া আবশ্যক নয়। এরপর সম্পাদকের প্রতি কারো আঙুল তোলার অধিকার থাকে না।

ইমাম তাবারি এবং অন্যান্য ইসলামি ঐতিহাসিক তাদের ইতিহাসগ্রন্থে দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

৪. শেষকথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব কাজ ও দায়িত্ব থাকে। সে নিজের গণ্ডিতে থেকেই কাজ আঞ্জাম দিয়ে যায়। আমাদের চারতলা বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে কখনো সময় ও সামর্থ্যের কারণে কেবল দোতলা নির্মাণ করার মওকা হয়। অবশিষ্ট কাজ আগত প্রজন্ম পূর্ণ করে। এমন বহু কাজ পরবর্তীদের দায়িত্বে থেকে যায়। সম্ভাবনা আছে ইমাম তাবারি রহ. রাবিদের অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সহিহ-জয়িফের স্তর নির্ণয় করার সময় পাননি। এখন উপর্যুক্ত সব দিক সামনে রাখলে বলা যায় যে, ইমাম তাবারিসহ অন্যান্য বরেণ্য আলেমের রচিত ইতিহাসগ্রন্থে এমন যয়িফ ও অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত আসার দ্বারা এই উদ্দেশ্য নয় যে, তারা এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়-নিষ্ঠতার বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন কিংবা গলদ পদ্ধতিতে দলিল উপস্থান করার প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন।

আল-কামিল ফিত তারিখ

'আল-কামিল ফিত তারিখ' আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আসির আলজাজারির রচনা। ৫৫৫ হিজরিতে তিনি মুসেলের নিকটবর্তী তিনদিক থেকে দজলা নদী-বেষ্টিত জাজিরায়ে ইবনে উমরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে আসির রহ. ইলমের জন্য মুসেল, শাম এবং কুদ্স সফর করেন। যৌবনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির সাথে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। হালাব যাওয়ার পর আল্লামা ইবনে খাল্লিকান রহ. এর সঙ্গে মোলাকাত হয়। এরপর তিনি মুসেলে ফিরে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই রচনা-সঙ্কলনে নিমগ্ন থাকেন। ৬৩০ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।[৫৭]

আল-কামিল ফিত তারিখ তার জগদ্বিখ্যাত কিতাব, যা প্রতিযুগেই আহলে ইলমদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে নিয়ে ইসলামি বিশ্বের উপর চেঙ্গিস খানের আক্রমণের পূর্ণ অবস্থা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তার পূর্বে বিগত শতাব্দীগুলোতে রচিত আরবি-ফারসি সূত্রগুলো থেকে তিনি পূর্ণরূপে উপকৃত হয়েছেন।

আল-কামিল ফিত তারিখের বৈশিষ্ট্য

১. উল্লিখিত ঘটনাবলি তিনি সনভিত্তিক উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এক বছরের ঘটনা তিনি একসাথেই উল্লেখ করেছেন, হোক তা আরব,

---

[৫৭] তার বড় ভাই মোবারক বিন মুহাম্মদও 'ইবনে আসির জাজারি' নামে মশহুর। তিনি তার অক্ষম অবস্থায় ঘরের কোণে বন্দি থেকে হাদিসশাস্ত্রে 'জামিউল উসুলে'র মতো বিশাল হাদিস সংকলন প্রস্তুত করেছেন।

জাজিরা ইবনে উমরে আরেকজন বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি আল্লামা জাজারি নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মুকাদ্দিমাতুল জাজারি, 'হিসনুল হাসিন'-এর লেখক মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলজাজারি। তিনি অষ্টম হিজরি শতাব্দীর মনীষী। পাঠক 'আলজাজারি' নামে বিখ্যাত তিন লেখকের মাঝে এই পার্থক্য লক্ষ রাখবেন।

পারস্য বা হিন্দুস্থানের। এরপর পরবর্তী বছরের ঘটনা তুলে ধরেছেন। এর একটি উপকারিতা হলো, কোনো ঘটনা পড়লেই পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তার সময়কাল সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত আমরা যদি কোনো ঘটনার সময়কাল জানি এবং আল-কামিল ফিত তারিখে তার বিস্তারিত বিবরণ পড়তে চাই, তা হলে খুব কম সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাব।

২. লিখিত সূত্রগ্রন্থ থেকে অধিক পরিমাণে তথ্য নিয়েছেন। হারুনুর রশিদের যুগ পর্যন্ত অনেক রেওয়ায়েতই তাবারি থেকে নিয়েছেন। এর পরবর্তী যুগের ঘটনাবলি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন। নিজের যুগের ক্ষেত্রে মৌখিক বক্তব্য বেশি পরিমাণে উল্লেখ করেছেন।

৩. পূর্ববর্তী ইতিহাসগ্রন্থসমূহে রেওয়ায়েতের আদ্যোপান্ত উল্লেখ করার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যার ফলে কলেবর বৃদ্ধি পেত এবং পাঠকরাও বিরক্ত হতো। ইবনে আসির রহ. তা পরিহার করে রেওয়ায়েতের সারনির্যাস উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনার জন্য ঐসব ঘটনা নির্বাচন করেছেন, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলির উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেছেন।

৪. প্রতিবছর মৃত্যুবরণকারী বড় বড় ব্যক্তিদের জীবনী উল্লেখের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

৫. বছরের শেষদিকে দুর্লভ ও বিস্ময়কর ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।

৬. গ্রন্থকে হৃদয়স্পর্শী করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে আলেম, দিগ্বিজয়ী এবং বাদশাহদের শিক্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন।

৭. শাসকদের ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাও উল্লেখ করেছেন।

আল-কামিল ফিত তারিখের ত্রুটি

১. আল-কামিল ফিত তারিখে সালের তারতিবে ঘটনাবলি উল্লেখ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কারণে আরব, পারস্য, হিন্দুস্থান, শাম ও মিসরের বিভিন্ন বাদশাহর ঘটনাবলির খণ্ডচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি ধারাবাহিকভাবে কেবল এক বাদশাহর সকল ঘটনা জানতে চায়, তা হলে দিশেহারা হয়ে পড়বে।

২. ইবনে আসির রহ. রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে এত উদার ছিলেন যে, কেবল যয়িফই নয়; বরং মনগড়া রেওয়ায়েতও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন এবং কোনো বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করেননি।

৩. কোথাও রেওয়ায়েতের সনদ উল্লেখ করেননি। এজন্য তাহকিক করা খুবই দুষ্কর যে, উল্লেখকৃত তথ্যটির বিশুদ্ধতা কোন্ পর্যায়ের।

৪. ইবনে আসির রহ. সমকালীন শাসকদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। এমনকি সালাহুদ্দীন আইয়ুবির মতো ব্যক্তিরাও তার সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। কিছু কিছু স্থানে তার সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত, আর কিছু জায়গায় একেবারেই অমূলক। এর থেকে প্রশংসা এবং নিন্দাজ্ঞাপনে তার ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এ থেকে বুঝা যায়, তিনি একজন নির্ভীক মানুষ ছিলেন। তিনি যা সত্য মনে করতেন, তা প্রকাশ করতে কোনো সরকার বা সালতানাতের পরোয়া করতেন না।

সার্বিক বিবেচনায় আল-কামিল ফিত তারিখ একটি উপকারী রচনা। যদি তার মধ্যে রেওয়ায়েতের মান আরেকটু উন্নত হতো, তা হলে আরও ভালো হতো।

তারিখুল ইসলাম

এই কিতাব রচনা করেছেন হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ জাহাবি রহ.। ৬৩৭ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুরকামান বংশোদ্ভূত। দামেশকে বসবাস করেন। এখানেই তার রচনা, সংকলন ও শিক্ষকতার জীবন কাটে। প্রায় একশ জটিল ও কঠিন বিষয়ে অনবদ্য রচনা রয়েছে তার। তাকে 'খাতিমাতুল হুফফাজ' (সর্বশেষ হাফেজে হাদিস) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আল্লামা সাখাবি রহ. বলেন, 'মানুষ হাদিস ও রিজালশাস্ত্রে চার ব্যক্তির পরিবারভুক্ত (তথা তাদের উপর নির্ভরশীল)। এক. মিযযি। দুই. জাহাবি। তিন. ইরাকি। চার. ইবনে হাজার (রাহিমাহুমুল্লাহু)।'

রিজালশাস্ত্রে সমালোচনাদৃষ্টির অধিকারী হাফেজ জাহাবি রহ. ইতিহাসশাস্ত্রে তারিখুল ইসলাম, দুওয়ালুল ইসলাম, সিয়ারু আলামিন নুবালা, আলইবার-এর মতো গ্রন্থ রচনা করে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। তার তারিখুল ইসলামের পূর্ণ নাম 'তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম'। এটি 'তারিখে দিমাশক'-এর পর ইসলামি ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহৎ সূত্রগ্রন্থ।[৫৮]

তারিখুল ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১. তারিখুল ইসলামে জমানা এবং জীবনীগুলোর স্তরবিন্যাস করা হয়েছে।

২. প্রতিটি তবকা (স্তরকে) এক জমানায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমে জমানার অবস্থা 'হাওয়াদিস' বলে বর্ণনা করেছেন, তারপর সেই

---

[৫৮] তারিখে দিমাশকে'র প্রচলিত সংস্করণ, যা দারুল ফিকর থেকে ৮০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তন্মধ্যে মূল মতন (পাঠ) ৭৬ খণ্ডে এবং বাকি চারখণ্ড সূচি এবং ইনডেক্স। হাফেজ জাহাবি রহ. এর 'তারিখুল ইসলাম'-এর প্রসিদ্ধ সংস্করণ ডক্টর আবদুল সালাম তাদমুরির তাহকিকে ৫৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

জমানার ব্যক্তি-মনীষীদের জীবনী 'ওফায়াত' শিরোনামে আলোচনা করেছেন। এভাবে তিনটি শাস্ত্রের সমন্বয় করেছেন: তারিখ, রিজাল এবং তাবাকাত।

৩. ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতগুলোর উপর প্রয়োজনমাফিক পর্যালোচনা পেশ করেছেন এবং ইতিহাসবিদ এবং রাবিদের সমালোচনা করেছেন।

৪. হাফেজ জাহাবি ভারসাম্যপূর্ণ এবং দূরদর্শী মানুষ। তাই রেওয়ায়েত এবং ব্যক্তিদের ব্যাপারে তিনি নেহায়েত সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং এমন পরিমিত শব্দে মত ব্যক্ত করেন, যা অধিকাংশ সময় অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে।

৫. হাফেজ জাহাবি রহ. রেওয়ায়েত নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের থেকে উত্তম এবং সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এজন্য তার ইতিহাসগ্রন্থে ভালো-মন্দ এবং মনগড়া কথাবার্তা থেকে প্রায় মুক্ত। গবেষকদের জন্য এটি অত্যন্ত মূল্যবান সূত্রগ্রন্থ।

তারিখুল ইসলামের ত্রুটি

১. বিশাল কলেবরের হওয়ার দরুন ক্রয় করা এবং উপকৃত হওয়া অনেক কঠিন।

২. এই গ্রন্থে 'ওফায়াত'-এর অংশ মূল ইতিহাসের তুলনায় অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। ফলে ইতিহাসের ঘটনাবলি ও তার মাঝে বিস্তর ব্যবধান তৈরি হয়।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

লেখক হলেন হাফেজ ইসমাইল বিন উমর বিন কাসির দিমাশকি রহ.। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, নাকিদ (সমালোচক), মুফাসসির এবং ফকিহ ছিলেন। ৭০১ হিজরিতে তিনি শামের বুসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪ হিজরিতে দামেশকে ইনতেকাল করেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার বৈশিষ্ট্য

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. যেসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি খেয়াল রেখে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' রচনা করেছেন, তা নিম্নরূপ :

১. সিরাতে নববি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত বিশদভাবে রেওয়ায়েত জমা করেছেন এবং তার সনদের সাথে সাথে নকদ ও নযর (সমালোচনা ও যুক্তির) প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেবল অন্যের বর্ণনার উপর ক্ষান্ত থাকেননি।

২. সাহাবিযুগ এবং ফিতনার সময়ের অধিকাংশ রেওয়ায়েত তাবারি কিংবা আল-কামিল ফিত তারিখ থেকে নিয়েছেন এবং প্রয়োজনে সমালোচনাও করেছেন।

৩. তাবারি কিংবা আল-কামিল ফিত তারিখ থেকে নেওয়া উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের অবস্থা, যা প্রায় ছয় শতাব্দীকাল পরিব্যাপ্ত, তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন, যেন পাঠক বিব্রতবোধ না করে। কেউ বিস্তারিত পড়তে আগ্রহী হলে উদ্ধৃত কিতাবসমূহ দেখে নিতে পারবে।

৪. তিনি তার যুগের ঘটনাবলি যেমন : বাগদাদে হালাকুখানের আক্রমণ থেকে নিয়ে মিসর ও শামে মামলুক সুলতানদের বিজয় পর্যন্ত অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেন। এইসব ঘটনা অন্যান্য বিস্তারিত ইতিহাসগ্রন্থেও এভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র ত্রুটি

১. সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত কোনো পর্যালোচনা ছাড়াই উল্লেখ করেছেন, যা এই কিতাবের একটি ত্রুটি।

২. ঘটনাবলি এবং জীবনী পৃথক পৃথক বছরে উল্লেখ করার দরুন ঘটনার ধারাবাহিকতা বার বার বিঘ্নিত হয়েছে।

৩. জীবনীর পারস্পরিক সামঞ্জস্য ঠিক থাকেনি। কোনো স্থানে অনেক দীর্ঘ, কোনো জায়গায় খুব সংক্ষিপ্ত। পূর্ববর্তী নবী-রাসুল, সিরাতুন-নবী এবং ইসলামি বিজয়াভিযানসমূহ (১৫ হিজরি পর্যন্ত) দীর্ঘ কলেবরে এবং তাহকিকের সাথে কয়েক ভলিয়মে লিখেছেন। এরপর আমরা যতই সামনে অগ্রসর হবো, ঘটনাবলি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। এমনকি শেষ পাঁচশতাব্দী তিন ভলিয়মেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। তবে একেবারে শেষের দিকে অর্থাৎ ৭০১ হিজরি থেকে ৭৬৮ হিজরি সময়কালের আলোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে এক ভলিয়মে সম্পন্ন করেছেন।

মূলত হাফেজ ইবনে কাসির রহ. পূর্ববর্তী নবী-রাসুল, সিরাতুন-নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনী এত গুরুত্ব, তাহকিক ও তাফসিলের সঙ্গে এজন্য বর্ণনা করেছেন, যাতে এ বিষয়ের গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহ একসাথে জমা হয়ে যায়। অপরদিকে বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের খলিফা ও সুলতানগণের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার কারণ হলো, এসব বিষয় অন্যান্য সূত্রগ্রন্থে (আল-কামিল ও তাবারি) বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

তারিখে ইবনে খালদুন

এর পূর্ণ নাম 'তারিখুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি আইয়্যামিল আরাবি ওয়াল আজাম ওয়াল বারবার'। এর লেখক হলেন আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুন রহ.। ৭৩২ হিজরিতে তার জন্ম এবং ৮০৮ হিজরিতে ইনতেকাল। ইসলামি সালতানাতের বিভিন্ন সরকারি ও বিচারালয়ের দায়িত্ব অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পালন করেছেন। ফলে রাজনৈতিক উত্থান-পতন কাছে থেকে দেখা এবং শাসকদের সংকেত ভালোভাবে বুঝার সুযোগ হয়েছে।

তারিখে ইবনে খালদুনের বৈশিষ্ট্য

তারিখে ইবনে খালদুন পূর্বোল্লেখিত কিতাবসমূহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. কিতাবের শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে, যাতে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজের বিভিন্ন চিত্র, উন্নতি ও অধঃপতনের কারণ, সভ্যতা তত্ত্বের এমন চমৎকার আলোচনা করেছেন যে, ইতোপূর্বে তার নযীর দেখা যায় না। তারিখে ইবনে খালদুন সেই ভূমিকার কারণেই খ্যাতি লাভ করেছে, এটিই 'মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন' নামে সুপরিচিত। ইলমের গভীরতার কারণে ইবনে খালদুনকে সমাজস্থপতিদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

২. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিন্যাস জমানার ধারাবাহিকতায় রাখেন নি, বরং শাসক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সকল ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে করে পাঠকদের মন বিক্ষিপ্ত হবে না।

৩. উপস্থাপনপদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্মোহ। সাবলীল এবং প্রামাণিক ভাষা। কারো সমালোচনা কিংবা আপত্তি নেই। নিজের পছন্দ-অপছন্দ এবং নিজ সত্তার কোনোরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না।

৪. ঘটনাবলি এমনভাবে একটি অন্যটির সঙ্গে গেঁথেছেন যে, পাঠক নিজে নিজেই বুঝতে পারবে। প্রতিটি ঘটনা পূর্বের প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী ঘটনাবলির কারণস্বরূপ হবে।

৫. রেওয়ায়েতের মধ্যে দেরায়েতের (বুদ্ধি ও যুক্তি মোতাবেক হওয়ার) প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এজন্যই তিনি ঐসব রেওয়ায়েত অধিক পরিমাণে পরিত্যাগ করেছেন যেগুলো পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করে আসছিলেন।

৬. রেওয়ায়েতের সারকথা উল্লেখ করেছেন এবং মূলভাষ্য উল্লেখ করার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

৭. সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দোষক্রটি উল্লেখ করা থেকে যথাসাধ্য বিরত থেকেছেন। কারণ, এ বিষয়ক রেওয়ায়েতসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুতা এবং সাম্প্রদায়িকতানির্ভর হয়ে থাকে।

৮. বড় বড় ঘটনার উৎপত্তি এত সংক্ষিপ্ত শব্দে ব্যক্ত করেছেন, যার দ্বারা ছোট কোনো একটি অংশও বাদ পড়েনি, আবার খুব স্বল্প সময়েই অধিক পরিমাণে ইতিহাসের জ্ঞান হাসিল হয়। অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থের পঞ্চাশ পৃষ্ঠার তথ্য আপনি তারিখে ইবনে খালদুনের দশ পৃষ্ঠায় পেয়ে যাবেন।

৯. এটি এমন এক ইতিহাসগ্রন্থ, যা অধ্যয়নের জন্য যে-কাউকে পরামর্শ দেওয়া যায়। এতে এমন রেওয়ায়েত খুবই কম যার ফলে পূর্বসূরি বিশেষ করে প্রথম তিনশতাব্দীর মনীষীগণের ব্যাপারে মন্দ ধারণ তৈরি হয়।

তারিখে ইবনে খালদুনের ক্রটি

৪. কিছু জায়গায় ইবনে খালদুনের পর্যালোচনা জমহুর ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন এবং দুর্বল। এর জন্য তাকে সমালোচিতও হতে হয়।

৫. বর্ণনাভঙ্গি শুষ্ক এবং নিরস। এজন্য 'আল-কামিল ফিত তারিখ' এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার' মতো চিত্তাকর্ষক মনে হয় না। কিন্তু দূরদর্শিরা ঠিকই বুঝেন যে, মূলত এটিই ইতিহাস গবেষকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তারা ব্যক্তিস্বার্থ, আবেগ, উত্তেজনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ঘটনাবলি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করে যান।

সামগ্রিকভাবে তারিখে ইবনে খালদুনকে ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অপূর্ব অবদান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগ্রন্থ, যাকে সাধারণত অবহেলা করা হয়

উল্লিখিত পাঁচটি গ্রন্থ ছাড়াও দুটি গ্রন্থ 'বিশ্বকোষের' মতো বিন্যস্ত হয়েছে। যদিও সাধারণত তাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তবে প্রকৃতপক্ষে তা অনেক উপকারী এবং গবেষকদের নিকট অন্তহীন মূল্যবান সূত্র হিসেবে বিবেচিত।

১. আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম
২. মিরআতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আ'য়ান

'আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম' ১৯ ভলিয়মে আল্লামা আবদুর রহমান ইবনুল জাওযি রহ. ((মৃত্যু : ৫৯৭ হিজরি) রচিত গ্রন্থ। আর 'মিরআতুয যামান ফি তাওয়ারীখির আ'য়ান' ইবনুল জাওযি রহ. এর নাতি আল্লামা সিবত্ব ইবনে জাওযি রহ. ((মৃত্যু : ৬৫৪ হিজরি) কর্তৃক রচিত।

'আল-মুনতাযাম' মানদণ্ডের বিচারে 'তারিখুত তাবারি' থেকে ভালো, তদ্রূপ 'মিরআতুয যামান' ইতিহাসশাস্ত্র বিবেচনায় 'আল-কামিল ফিত তারিখ' থেকে মানোত্তীর্ণ। তদুপরি আল্লাহর অপার কারিশমা যে, এই দুই কিতাবের সেই গ্রহণযোগ্যতা হাসিল হয়নি, যা 'তারিখুত তাবারি' ও 'আল-কামিল ফিত তারিখ' লাভ করেছে। হ্যাঁ মনিমানিক্য অনুসন্ধানকারীরা এই জহরতের কদর ঠিকই বুঝতে পারে। হাফেজ জাহাবি রহ. তার 'তারিখুল ইসলাম' এবং হাফেজ ইবনে কাসির রহ. তার 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' কিতাবে উক্ত দুই কিতাব থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের কুতুবখানায় এ দুটি কিতাব রাখা আবশ্যক।

'মিরআতুয যামান' কয়েক শতাব্দী যাবৎ দুর্লভ ছিল। বিগত শতকে তার কিছু অংশ হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিশেষে আরবের একদল গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে খোঁজাখুঁজি করে তার বাকি খণ্ডগুলো জমা করতে সক্ষম হন। তারা তাহকিক ও টীকা সংযোজন করে এই কিতাবের একটি পূর্ণাঙ্গ নুসখা প্রস্তুত করেন। আলহামদুলিল্লাহ ২০১৩ সালে দামেশকের আর-রিসালাতুল আলামিয়্যাহ প্রকাশনী থেকে বৃহৎ কলেবরে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

اے ہمالہ، داستاں اس وقت کی کوئی سنا
مسکن آبائی انساں جب بنا دامن ترا
کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا
داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا
ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو
دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

ওহে হিমালয়, শোনাও তো সেই সময়ের গল্প
যখন পূর্বপুরুষেরা তোমার আঁচলের নিচে বসতি গেড়েছিল।
কিছু বলো তাদের সেই
সাদামাটা, কৃত্রিমতাহীন অনাড়ম্বর জীবনাচার সম্পর্কে।
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও-
রাতদিনের আবর্তন, কালের বিবর্তন!
আর তুমি ফিরে যাও তোমার সেই সোনালি অতীতে!

পৃথিবীর সূচনা

দুনিয়া বড়ই বিস্ময়কর! বিস্ময়কর আমাদের জীবন, আমাদের রুহ-আত্মা, গোশত-চামড়ায় সুগঠিত আমাদের এই দেহ, যাতে অনুভব-অনুভূতি, কথা বলা ও নড়াচড়ার শক্তি আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি হৃৎপিণ্ড বয়ে বেড়াই, যা সারাক্ষণ অবিরাম স্পন্দিত হয়। মানবদেহে হাজার মাইল দীর্ঘ পশমের মতো একটি সূক্ষ্ম শিরা রয়েছে, যা প্রতিটি কোষে নির্বিঘ্নে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে থাকে। আমরা আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে ছিলাম না এবং পরেও থাকব না। আমরা যেমন নশ্বর, তেমনি এই দুনিয়াও ক্ষণস্থায়ী। এমন ক্ষণস্থায়ী হওয়ার পরেও পৃথিবীকে কত নৈপুণ্য, পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে! যতই অনুসন্ধান ও গবেষণা করা হয়, আকল-বুদ্ধি লোপ পেয়ে একপর্যায়ে আমাদের ভাবনার সীমানা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে শুরু থেকেই খুব জোর দিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে যে, এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্যই-বা কী? যারা এসব প্রশ্নের উত্তরে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করে না এবং অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে না, তারা সর্বদা দ্বিধা-সংশয়ে জর্জরিত থাকবে। কোনো রিসার্চ ও গবেষণাই তাদেরকে এই অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, রাসুলদের মর্যাদার প্রতি ঈমান রাখে এবং আসমানি শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে, তার কাছে এই প্রশ্নগুলো কখনো ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে থাকবে না; দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। কারণ, প্রত্যেক নবী তার দাওয়াত শুরু করেন এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই— এই দুনিয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র বিশ্বজাহান তারই সৃষ্টি, তিনি সর্বদা ছিলেন, সর্বদা থাকবেন, তাকে কেউ সৃষ্টি

করেনি, তার কোনো সন্তান নেই, তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, সব জিনিস তার নিয়ন্ত্রণে, তিনি মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়াকে তিনি পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন, দুনিয়ার পরীক্ষায় কৃতকার্য ব্যক্তিদের পুরস্কার হিসাবে তিনি জান্নাত তৈরি করেছেন আর অকৃতকার্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

মূলত এটিই জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্ব, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে তার বর্ণনা রয়েছে, সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ কুরআনুল কারিমেও আল্লাহ তায়ালা আরো স্পষ্টরূপে তা বর্ণনা করেছেন। যেহেতু ঐ বিষয়গুলো আকিদা-বিশ্বাসসংশ্লিষ্ট, আর তা পূর্ণরূপে অবগত হওয়া ছাড়া দিশেহারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে না, তাই তিনি তার ঐশীবাণীতে এইসব বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন।

কিছু কিছু প্রশ্ন তৈরি হয় মানুষের জানার কৌতূহল এবং সচেতনতার কারণে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার অনুসন্ধানী রুচি ও আগ্রহের কারণে জানতে চায় যে, তার পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন, কেমন ছিলেন? তাদের আগে কারা ছিলেন? পৃথিবী সূচনা কবে থেকে? কোন্ কোন্ গোত্রের আগমন ঘটেছিল? তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি কীরূপ ছিল? কেমন ছিল তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি?

এগুলো ইতিহাসবিষয়ক প্রশ্ন। কিছু প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থাবলি এবং তার রাসুলগণের বক্তব্যে সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। অতীত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা মানুষের জ্ঞান, দর্শন ও আমলের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এজন্য অহি এবং নবী-রাসুলদের বাণীতে অতীতসংশ্লিষ্ট বহু নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়। তবে অহি ও রিসালাতের উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা নয়; বরং মানুষকে পথ দেখানো। তাই অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এমন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক, যেখানে অতীতের প্রতিটি যুগের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হতে পারি। একেই বলে ইতিহাসশাস্ত্র।

ইতিহাসবিদদের মতে- 'ইতিহাস এমন শাস্ত্র, যাতে পূর্ববর্তী গোত্র, রাষ্ট্র, রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ব্যক্তিত্বের অবস্থা সময়ের ক্রমধারা অনুযায়ী সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা হয়।'

পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয়

পৃথিবী কখন সৃষ্টি করা হয় এবং মানবজাতির ক্রমবিকাশ কবে থেকে শুরু হয়—শুরু থেকেই এই নিয়ে মতানৈক্য চলে আসছে। বর্তমান ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূমির বয়স কোটি বছর এবং মানবজাতি লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে বসবাস করছে। তবে তাদের এই মত যুক্তিনির্ভর; তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ভারত উপমহাদেশের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. পৃথিবীর সূচনালগ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর এই মতটি তিনি প্রাধান্য দেন যে, পৃথিবীতে সৃষ্টির সূচনা হয় ছ' হাজার বছর পূর্বে। পাশাপাশি তিনি লেখেন যে, তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলা মুশকিল। কারণ, আমাদের ইলমের উপকরণ খুবই স্বল্প এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেও অপ্রতুল। তা ছাড়া প্রাচীন নিদর্শনাবলির সাহায্যেও নিশ্চিতভাবে কোনো ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মাঝে চীনা, ভারতীয় এবং মিসরীয়রা সবচেয়ে প্রাচীন জাতি। পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের দাবি হলো, ভূ-পৃষ্ঠে এইসব গোত্রের বসবাস ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়কাল হবে। আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, পৃথিবীর কোনো জনগোষ্ঠীর কোনোরূপ অস্তিত্ব দশ হাজার বছরেরও আগে পাওয়া যায় না।[৫৯]

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-এর বরাতে উল্লেখ করেন যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১২০০ বছর, হজরত নুহ আলাইহিস সালাম থেকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১০৪২ বছর, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৫৬৫ বছর, হজরত

[৫৯] নুরুল বাশার ফি সিরাতি খাইরিল বাশার গ্রন্থের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৮

মুসা আলাইহিস সালাম থেকে হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৫৭২ বছর, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১৩৫৬ বছর, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৬০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সে হিসেবে হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পর থেকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৫০২০ বছর হয়। আর দুনিয়াতে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জীবনকাল ৯৬০ বছরও যদি হিসেব করা হয়, তা হলে দুনিয়ার বয়সকাল আদম আলাইহিস সালামের আগমনকাল থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ৬২৯৫ বছর।[৬০]

হজরত আদম আলাইহিস সালাম

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটিই প্রথম মানব সৃষ্টি। তার সৃষ্টিতে মহান স্রষ্টা এমন অভিনব শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, যা অন্যকোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেননি। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তার মধ্যে অনুভব-অনুভূতি, বোধশক্তি, আবেগের বহিঃপ্রকাশ, সমস্যার উপলব্ধি এবং উপকরণের সঠিক ব্যবহারের যোগ্যতা সকল সৃষ্টি থেকে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

পৃথিবীর ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো কীরূপ প্রভাব রেখেছে, তা তো দৃশ্যমান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ফেরেশতাদের মতো তার ইবাদত করতে বাধ্য করেননি। জিনদের মতো মন্দের প্রতি একেবারে ধাবিতও করেননি। বরং ভালো-মন্দ উভয় কাজের শক্তিই তাকে দিয়েছেন। ফেরেশতারা মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডেরও পর্যালোচনা করে ফেলে। কারণ, ইতোপূর্বে জিনজাতি জমিনে কী ধরনের অনর্থ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছিল, তা ফেরেশতাদের স্মরণে ছিল। ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট বিনীত আবেদন করে যে, হে আল্লাহ, আপনার গুণকীর্তন করার জন্য তো আমরা সদাতৎপর আছি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

---

[৬০] তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, ১/৩১ (দারুল ফিকর, বৈরুত সংস্করণ)

إِنِّيْ أَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ

আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।[৬১]

মানুষকে ভালো-মন্দ উভয় কর্মের সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে পরীক্ষার ক্ষেত্র রূপে প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান। তার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় কর্মের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সে প্রভুর ভয়ে মন্দ থেকে বিরত থাকে এবং নেকআমল করে, তা হলে সে সফল। অপরদিকে সে যদি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মন্দের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে কাজে লাগায়, নেক আমলের সামর্থ্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তা হলে সে দুর্ভাগা, কপাল পোড়া; এই নিগূঢ় রহস্য ফেরেশতারা ধরতে পারেননি।

হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মাননা-সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন, যেন সমগ্র জগতের উপর মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গদানের জন্য মানবজাতির কোমলশ্রেণি নারীজাতি সৃষ্টির সূচনা হয় হজরত হাওয়া আলাইহাস সালামের সৃষ্টির মাধ্যমে। উভয়কে মেহমানদারির জন্য জান্নাতে পাঠানো হয়। দুনিয়ার প্রথম নারী-পুরুষ খুব স্বল্প সময়ই জান্নাতে অবস্থান করেছেন।

কিন্তু তারা ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনে এমন আরাম-আয়েশ, সুকুন ও প্রশান্তি লাভ করে যে, পরবর্তী প্রতিটি মানুষ নিজের ভেতরে জান্নাতের সেই আয়েশ-আকাঙ্ক্ষা লালন করতে থাকে। জান্নাতে খুশি আর খুশি। সেখানে নেই কোনো দুঃখ-দুর্দশা, নেই কষ্ট-ক্লেশের নাম-নিশানা। সেখানে সকল চাহিদা পূরণ হবে, সকল নেয়ামত সহজলভ্য হবে।

ঈমানদাররা রাসুলগণের মাধ্যমে অবগত হয়েছেন যে, তাদের আসল বাড়ি জান্নাত। সেজন্য অধিক পরিমাণে নেকআমল করতে হবে, যেন নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারে। যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনেনি, তারা যদিও জান্নাতকে কাল্পনিক বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সেই জান্নাতি ফিতরাত ও স্বভাবের কারণে ঠিকই স্বাধীন জীবনযাপন করে থাকে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ নিয়ে

[৬১] সুরা বাকারা, আয়াত ৩০

দৌড়ঝাঁপে তারা মশগুল। তারা জান্নাতি স্বাদ দুনিয়াতেই নিয়ে নেয়। ভোগ-বিলাসের প্রতি এমন আকর্ষণের কারণেই পৃথিবী ফেতনা-ফ্যাসাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে শয়তানের বড় ভূমিকা রয়েছে। শয়তানদের সরদার ইবলিস হলো জিনের বংশধর। ইবলিস হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বহু আগে ফেরেশতাদের সহচর এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যশীল বান্দা ছিল। কিন্তু হজরত আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদা তার থেকে অধিক হতে দেখে সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। নিজেকে সে আদম আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম মনে করে। কারণ, সে আগুনের তৈরি আর আদম আলাইহিস সালাম মাটির। তাই সে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে অস্বীকার করে। এই অপরাধে ইবলিসকে আল্লাহ তায়ালা তার দরবার থেকে তাড়িয়ে দেন।

শয়তান অবাধ্য ও জেদি হওয়ার দরুন আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চেয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ চায় হজরত আদম ও তার বংশধরকে পথভ্রষ্ট করতে পারার। আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুমতি দেন এবং সবধরনের সামর্থ্য তাকে প্রদান করেন। আদম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধর ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন। শয়তানের ছল-চাতুরী থেকে বাঁচতে পারলে এবং মহান স্রষ্টা ও মালিকের শরণাপন্ন হতে পারলে, তখনই সে হবে প্রকৃত সফল ও কৃতকার্য।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি শয়তানের শত্রুতা ও দুশমনি ষোলকলায় পূর্ণ হয়। এবার সে স্বয়ং হজরত আদমকেও আল্লাহর কাছে অপরাধী বানাবার চেষ্টা করতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে এমন যোগ্যতা প্রদান করেন যে, সে অপরের কল্পনা ও মস্তিষ্কের ভেতরে ঢুকে তার সবকিছু অবগত হতে পারে। সে তার এই যোগ্যতা ব্যবহার করে হজরত হাওয়া আলাইহাস সালাম এবং আদম আলাইহিস সালামকে এমন একটি গাছের ফল খাওয়ার জন্য ফুসলাতে থাকে, যার ফল খাওয়া হজরত আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

যখনই হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম ফল খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার

নির্দেশ আসে। তাদের জান্নাতি পোশাক খুলে নেওয়া হয়। ফলে তারা জান্নাতি গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতে থাকেন। খুব দ্রুত তাদেরকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়। এখানেই মানুষ ও শয়তানের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম নিজেদের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে থাকেন; অথচ শয়তান তার অবাধ্যতা ও হঠকারিতায় অবিচল ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের তাওবা কবুল করেন এবং সতর্ক করেন যে, শয়তান তোমাদের বংশধরদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব, তার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তিনি এ-ও বলে দেন যে, মানবজাতির হেদায়েত এবং শয়তানের গোমরাহি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পথনির্দেশের ধারা জারি থাকবে। যে ব্যক্তি ঐ নির্দেশনা অনুসরণ করবে, সে আখেরাতে শান্তিতে নিঃশঙ্ক থাকবে। আর যে তা এড়িয়ে যাবে, সে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। যেহেতু হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এবং দুনিয়াতে তার আগমনের ঘটনায় মানুষের প্রকৃত ঠিকানা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিষয় নিহিত রয়েছে, তাই কুরআন-হাদিসে এই ঘটনাগুলো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬২]

বুঝা গেল দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পাঠানোর পেছনে কারণ হলো, মানুষ তার পরিচয় লাভ করবে, আল্লাহ তায়ালাকে এক মানবে, তার দুয়ারে মাথানত করবে, শরিয়তের বিধান পালন করবে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবে ইত্যাদি। এসবই ছিল হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি, তাকে দুনিয়াতে প্রেরণ এবং তার বংশ-বিস্তারের প্রধান রহস্য।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পূর্বে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা ৪০ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬৩]

---

[৬২] দেখুন সুরা বাকারা, আয়াত ৩০-৩৯; সুরা আরাফ, আয়াত ১১-২৫; সুরা হিজর, আয়াত ২৬-৪২

[৬৩] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, আবুল ফিদা, ১-৯ (হুসাইনিয়্যাহ মিসরিয়্যাহ সংস্করণ)

এখানে আমাদের ভালো করে বুঝে নেওয়া জরুরি যে, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ঘটনা কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে বর্ণিত (তাওরাত ও ইনজিলের বর্তমান বিকৃত অবস্থাতেও যার সমর্থন পাওয়া যায়) হয়েছে এই বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য যে, সমগ্র মানবজাতি আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। সবার পিতা একজন। মানুষ হিসেবে সকলেই ভাই ভাই।

এ থেকে আরেকটি বিষয় উঠে আসে যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং বানর থেকে মানবজাতির সৃষ্টির দাবি আসমানি কিতাব ও ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং একদম যুক্তিপরিপন্থি। বিবর্তনবাদের দর্শন অনুযায়ী যদি আদি যুগ থেকে আসতে আসতে এক সময় বানর মানুষে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বর্তমান বানরগুলো কেন বানরই রয়ে গেল? এখন পর্যন্ত কেন মানুষে রূপান্তরিত হল না? বিড়াল কেন সিংহে পরিণত হল না? গাধা কেন আজও ঘোড়ায় পরিণত হলো না?

হজরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় অবতরণ করলেন। এখানে জান্নাতের মতো নেয়ামত ও সুখ-শান্তি ছিল না। তারপরও মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার মতো উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। খাওয়াদাওয়া, সতর ঢাকা, বাসস্থানের ব্যবস্থা সহজলভ্য ছিল। মহান স্রষ্টা মানুষকে এসব উপকরণের ব্যবহারবিধি আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম গমের দানা নিয়ে আসেন। আদম আলাইহিস সালাম তা জমিনে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করেন। আর সেই গম পিষে আটা বানিয়ে রুটি তৈরি করেন।[৬৪]

জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকেছিলেন। দুনিয়াতেও তা ভিন্ন একটি ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে, তা হলো দুম্বার পশম দিয়ে কাপড় তৈরি করা। দুম্বার পশম দিয়ে হজরত আদম আলাইহিস সালামের জুব্বা এবং হাওয়া আলাইহাস সালামের কামিজ ও ওড়না বানানো হয়।[৬৫]

---

[৬৪] তারিখুত তাবারি- ১/৯০; হজরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে); আলমুনতাযাম- ১/২১১, ২১২

[৬৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১০৩

হজরত আদম ও হাওয়ার সন্তান জন্ম নিলো। তাদের মাঝে বিয়ের রীতি চালু হলো। আর এভাবেই আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের বংশ-বিস্তার হতে থাকল।[৬৬]

বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা গবেষকরা, যারা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির বয়সকাল লাখো বছর বলে থাকে এবং দাবি করে যে, পৃথিবীর শুরুতে মানুষ বিবস্ত্র ছিল, কাঁচা গোশত চিবাত, বিবাহের কোনো ধারণাই ছিল না তাদের, পুরুষরা কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই নিজেদের যৌনচাহিদা মেটাত, মানুষ হাজার বছর পর রান্নাবান্না, কাপড় পরার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং বিয়েশাদিতে অভ্যস্ত হয়েছে; এইসব দাবি সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর; ইতিহাস যাকে প্রত্যাখ্যান করে।

দুনিয়াতে আসার কয়েকশ বছর পর আদম আলাইহিস সালামের সন্তানেরা স্রষ্টার মৌলিক সবক ও শিক্ষা ভুলে যায়, ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুগামী হতে থাকে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রাসুল পাঠানোর ধারা জারি করেন।

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম

আল্লাহবিমুখ মানুষদের তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রথম নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম। তিনি আদম আলাইহিস সালামের ইনতেকালের এক হাজার বছর পর প্রেরিত হন।[৬৭] এক হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ তাদের পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের দীন ও শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তাদের কিছু মৃত বুজুর্গের প্রতিকৃতি বানিয়ে ভক্তি দেখানো শুরু করে।

এমন কয়েকজন বুজুর্গের নাম হলো ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর। লোকেরা অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসের দরুন এই বুজুর্গদের কাছে প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার এবং সমস্যা সমাধান করার যোগ্য মনে করতে থাকে। তাদের প্রতিকৃতির উপাসনা করতে থাকে। এখান থেকেই

[৬৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১০৪
[৬৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১১৩

বান্দা ও তার রবের সাথে সম্পর্কছিন্নতার সূচনা। হজরত নুহ আলাইহিস সালাম বান্দা ও রবের মাঝে সেই সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্য আসেন। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি শত যাতনা সহ্য করেছেন। সাড়ে নয়শত বছর অনবরত দীনের দাওয়াত দেওয়ার পরেও যখন তার কওম গোমরাহি, অবাধ্যতা, হঠকারিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন মহাপ্লাবন আসে, যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেবল হজরত নুহ আলাইহিস সালাম এবং তার প্রতি ঈমান গ্রহণকারী মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালা নৌকাতে চড়িয়ে রক্ষা করেন।[৬৮]

প্লাবন থেকে বেঁচে-যাওয়া মুমিন নারী-পুরুষ মিলিয়ে কেবল ৪০ জন ছিলেন। এদের মাধ্যমেই পুনরায় দুনিয়া আবাদ হয়। তাদের সন্তান সাম, হাম, ইয়াফেসের বংশধরেরাই পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। সামের সন্তানাদি থেকে আরব, পারস্য, রোম (ইউরোপ) আবাদ হয়। ইয়াফেসের সন্তানদের থেকে তুর্কি (চীনা), ইয়াজুজ-মাজুজ জন্ম নেয়। ইয়াফেসের সন্তানদের থেকে জন্ম নেয় আফ্রিকান, হাবশি, সুদানি, কিবতি এবং বারবার জাতি।[৬৯]

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরও হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে প্রাপ্ত আকিদার উপরই রেখে যান। মানুষ তার আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত প্রশ্নমালার উত্তরও সেই আকিদায় পেয়ে যেত। সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ তার অবস্থান খুঁজে পেত। মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো? কে সৃষ্টি করলেন? আমি কীভাবে সৃষ্টি হলাম এবং কেন সৃষ্টি হলাম? আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? এত বিশাল বিশ্বব্যবস্থা তৈরির পেছনে কী উদ্দেশ্য? মৃত্যুর পর কী হবে? ভালো-মন্দের প্রতিদান পাওয়া যাবে কি না? যদি প্রতিদান পাওয়া যায়, তা হলে কোথায় এবং কীভাবে? বিশুদ্ধ আকিদা জানার মাধ্যমে উপর্যুক্ত সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। আর বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে মানবজাতি যখন এক আত্মায় পরিণত হয় তখন ভাষা, দেশ এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা পরস্পরের মধ্যে বিভেদের দেয়াল দাঁড় করাতে পারে না।

---

৬৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১১৮, ১২৫
৬৯ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১২৯

আদ ও সামুদ

কিন্তু হজরত নুহ আলাইহিস সালামের কয়েকশ বছর পর আবার মানুষ বিপথে চলতে থাকে। যেহেতু নবী প্রেরণের ধারা চালু হয়েছে, তাই একের পর এক নবী-রাসুল প্রেরিত হতে লাগলেন। জাজিরাতুল আরবের উপত্যকাজুড়ে বসবাসরত মূর্তিপূজারি আদজাতির কাছে হজরত হুদ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করা হয়। আদজাতি ছিল দৈহিক ও আর্থিক শক্তি-সামর্থ্যে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে উপমাহীন। নিজেদের এই দাপট-শক্তিমত্তার কারণে তারা ছিল চরম দাম্ভিক। ফলে হজরত নুহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তীব্র ঝড়োহাওয়া এসে তাদেরকে সমূলে উপড়ে ফেলে।

হিজাজ থেকে শামে যাওয়ার পথে ওয়াদি হিজর শহরে ছিল সামুদ জাতির বসবাস। নির্মাণশিল্পে তাদের যোগ্যতা ও নৈপুণ্য ছিল তুলনাহীন। পাহাড় কেটে মজবুত বাড়ি নির্মাণ করার কাজে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। তাদের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য হজরত সালেহ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়। তারা তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে। ফলে তাদেরকে বজ্রধ্বনি ও ভূ-কম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।[৭০]

আদ, সামুদ-সহ কিছু আরবজাতির নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; এদেরকে আরবে বায়েদা বলা হয়। তাদের আলোচনা আসমানি কিতাব, লোকমুখে প্রচলিত কিসসা-কাহিনি এবং প্রাচীন কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে নবী-রাসুলের আগমন ঘটতে থাকে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আসার পূর্বেই পৃথিবীতে বহু জাতি-গোষ্ঠী আবাদ হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিমে বহু সাম্রাজ্য এবং অনেক শহর-নগর অস্তিত্ব লাভ করে। তাই নবীগণের আগমনও অনেক বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে বিভিন্ন এলাকা, গোত্র এবং রাজ্যে অনেক নবী প্রেরিত হতে

---

[৭০] সুরা হুদ, আয়াত ২৫-৬৮; সুরা সাফফাত, আয়াত ৭৫-৭৮; আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১০-১৩; আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮২-৮৫

থাকেন। প্রত্যেকেই বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কিন্তু হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানি, আত্মত্যাগ, আল্লাহপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গ ছিল অনুপম।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইরাকের ব্যবিলন শহরের উপকণ্ঠে 'কুসা' এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর ইতোমধ্যে ১০৮১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সেই সময়ে ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে নমরুদ নামক এক জালেম ও প্রতাপশালী বাদশাহর শাসন চলতো। সে খোদা দাবি করেছিল। ব্যবিলনও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইরাকবাসী একদিকে তাকে খোদা মানতো, অন্যদিকে চাঁদ-সূর্য, নক্ষত্র এবং নানাবিধ প্রাকৃতিক কুদরতকেও তারা খোদা ভাবতো। পাশাপাশি তারা মূর্তিপূজা করত। স্বয়ং হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পিতা আজরও মূর্তিপূজক ছিল। শিরক ও ভ্রান্ত আকিদা গোত্রের সব লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৭১]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা সত্যসন্ধানী করে নবুওয়াত প্রদান করেন এবং নিজ কওমের লোকেদের ইসলাহ করার নির্দেশ দেন। তিনি লোকজনের সামনে চাঁদ-সূর্যের অস্থায়িত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন। তাদেরকে বুঝান যে, এগুলো নিজ ইচ্ছায় উদয়-অস্ত যেতে পারে না। তা হলে এগুলো কীভাবে রব হবে? লোকজন যখন তার কথা শুনল না, তখন একদিন তিনি তাদের মন্দিরে গিয়ে সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং তাদেরকে একেবারে নিরুত্তর করে দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করেন, 'ওরা যদি কথা বলতে পারে, তা হলে তাদের থেকেই জেনে নাও'। কওম নির্বাক হয়ে যায়, লজ্জিত এবং পেরেশান হয়ে তারা বলে, 'ইবরাহিম, তুমি তো জানো এরা কথা বলতে পারে না!'

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তা হলে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত কেন করো, যেগুলো তোমাদের কোনো উপকার-ক্ষতি, কিছুই করতে পারে না? তোমাদের এবং তোমাদের উপাস্যদের জন্য বড়ই আফসোস!'

---

[৭১] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৪-১৫; আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮৬

কওমের লোকেরা তার যুক্তির কোনো উত্তর দিতে না পেরে হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। তারা তাদের উপাস্যদের সম্মান বাঁচানোর জন্য দাবি তুলল যে, এই লোকটাকে গ্রেফতার করে পুড়িয়ে ফেলা হোক।'[৭২]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। নমরুদ তাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নির্বিঘ্নে আল্লাহ তায়ালার একত্বের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, আমার রব ঐ সত্তা, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন।'

নমরুদ বলে, 'আমিও তো জীবন দিতে পারি, মারতে পারি'। এই বলে সে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ডেকে এনে তাকে মুক্ত করে দেয়, আরেকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে এনে হত্যা করে। অথচ কাউকে ক্ষমা করে দেওয়ার দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না। তদ্রূপ কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে কেউ বান্দার জীবন-মৃত্যুর মালিক হয়ে যায় না। কারণ, এমন হলে তো যেকোনো হত্যাকারী জীবন-মৃত্যুর মালিক হয়ে নিজের কখনো মৃত্যুবরণ না করার কথা। কিন্তু কখনোই এমন হয় না। নমরুদের যে আকল-বুদ্ধি ছিল, তা এসব সূক্ষ্ম যুক্তি বোঝার মতো উপযুক্ত ছিল না। তাই হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কোনো নিগূঢ় তত্ত্বকথার দিকে না গিয়ে একটি সুস্পষ্ট বিষয় উত্থাপন করেন। বলেন, আচ্ছা, আমার প্রভু পূর্বদিক থেকে সূর্য উদিত করেন। তুমি যদি রব হয়ে থাকো, তা হলে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করে দেখাও। নমরুদ এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। লা-জবাব হয়ে যায়।'[৭৩]

পরিশেষে সেও অন্যান্য লোকের মতো হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়, যেন অন্যদের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকে। তারা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য গভীর গর্ত খুঁড়ে মিনজানিক দিয়ে তাকে তাতে নিক্ষেপ করে। এমন কঠিন মুহূর্তেও তার জবানে উচ্চারিত ছিল-

اللهم أنت الواحد في السماء، وأنت الواحد في الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل

[৭২] সুরা আমবিয়া, আয়াত ৫১-৬৮

[৭৩] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৮

হে আল্লাহ, আসমানে আপনিই একক সত্তা, জমিনেও আপনি একক সত্তা। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্যনির্বাহী।

এই সময় জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে, হুকুম করতে পারেন।'

জবাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের সামনে আমার প্রয়োজন পেশ করা ঠিক হবে না।'

সেই অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ এত প্রচণ্ড ছিল যে, আগুনের উপর দিয়ে উড়তে থাকা পাখিও কাবাব হয়ে নিচে পড়ে যেত; কিন্তু যখন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন-

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وسَلاَمًا على إِبْرَاهِيم

হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য আরামদায়ক ও শীতল হয়ে যাও।[৭৪]

সঙ্গে সঙ্গে আগুন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য জান্নাতে পরিণত হলো। ৪০ দিন তিনি এখানে থাকেন। তিনি বলতেন, এই দিনগুলোই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক ছিল।[৭৫]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতাকেও তাওহিদের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেন, 'আপনি এমন জিনিসের ইবাদত কেন করেন, যেগুলো শুনতে পায় না, দেখতে পারে না, আপনার কোনো উপকারেও আসে না?'

পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইবরাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের অস্বীকার করছো? তুমি যদি এর থেকে ফিরে না আসো, তা হলে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলব।'[৭৬]

সবশেষে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার কওম ও সম্প্রদায়কে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির চরম পর্যায় অতিক্রম করতে দেখেন, তখন তিনি

---

[৭৪] সুরা আমবিয়া, আয়াত ৬৯

[৭৫] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮৫-৮৬

[৭৬] সুরা মারয়াম, আয়াত ৪২-৪৮

স্বদেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ঐ সময়ে তার চাচাতো বোন সারা ঈমান এনেছিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে বিয়ে করে নেন। তিনি শামের উদ্দেশে রওনা দেন। সঙ্গে সারা এবং ভাতিজা লুতও ছিলেন। লুতও ঈমান এনেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুওয়াতের মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।[৭৭]

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল পথহারা মানুষ এবং বিক্ষিপ্ত জাতিকে ঐক্যের প্লাটফর্মে সমবেত করা। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তাওহিদ ও একত্বের দাওয়াত এতটাই ইখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির সাগরে জোয়ার সৃষ্টি হয়। দীনের দাওয়াতের লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি আপন পিতা, পরিবার-পরিজন এবং দেশ ত্যাগ করে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যে তাকে উম্মতে মুহাম্মদির পিতামহ নির্বাচন করতে চান, তিনি এই সম্মাননা ও ইজ্জতের উপযুক্ত। কিন্তু তখনও প্রেম-ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার কয়েক ধাপের পরীক্ষা রয়ে গিয়েছিল। আরো কিছু ইতিহাস গড়ার মতো বিষয় অবশিষ্ট ছিল।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাওহিদের দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত জমিন খোঁজার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে সফর করতে থাকেন। শামে কিছুদিন অবস্থান করার পর স্ত্রী সারাকে নিয়ে মিসর চলে যান। মিসরের তৎকালীন রাজা তুলিস (সিনান বিন ইলওয়ান) তাকে বুজুর্গ হিসেবে তার খেদমতের জন্য আপন কন্যাকে বিয়ে দেন।[৭৮]

সিনান বিন ইলওয়ান ছিলেন হাইকোস তথা রাখাল বংশের। এই বংশটি মূলত আরবীয় ছিল। রাজকন্যার সঙ্গে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বিয়ে হলো। তাকে নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পর তিনি 'হা গার'

---

[৭৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/১৬৮, ১৬৯

[৭৮] সহিহ বুখারি- হাদিস ৩৩৫৮; (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া); আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৩; আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৮৮

সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতে فأخدمها هاجر শব্দের কারণে ইতিহাসবিদগণ তার বাহ্যিক অর্থ অনুসারে বলেন, হাজেরা রা. বাঁদি ছিলেন। অপরদিকে কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি রহ. বিস্তারিত প্রমাণসহ উল্লেখ করে এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি বাঁদি ছিলেন না; বরং মিসরের রাজকন্যা ছিলেন। [রাহমাতুললিল আলামিন- ২/৩০৯-৩১১; মারকাযুল হারামাইন আলইসলামি সংস্করণ]

তথা বিদেশি স্ত্রী বলে পরিচিত হতে লাগলেন। এই 'হা গার'-ই আরবি ভাষায় 'হাজার' হয়েছে।[৭৯]

হজরত হাজেরার গর্ভে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। কিছুদিন পরই আল্লাহ তায়ালা তাকে হুকুম দেন- স্ত্রী হাজেরা আর শিশুসন্তান ইসমাইলকে মক্কার কোনো উপত্যকায় রেখে এসো। এই আদেশ ছিল তার জন্য আরেকটি বড় পরীক্ষা। এটা শুধু হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্যই পরীক্ষা ছিল না; বরং তার স্ত্রী হাজেরাকেও পরীক্ষা করছিলেন। কারণ, সর্বশেষ উম্মতের মুকুটধারিণী মা হওয়ার জন্য তো শত মুসিবতের মাঝেও অটল-অবিচল থাকা আবশ্যক।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সফর করে শাম থেকে জাজিরাতুল আরব পৌঁছেন। স্ত্রীকে মক্কার এক বৃক্ষ-তরুলতাহীন উপত্যকায় আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে রেখে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীর নিকট কেবল একটি পানির মশক, একটি খেজুরের থলে খোরাকি হিসাবে রেখে যান। তখন সীমাহীন পেরেশানি ও অস্থিরতা নিয়ে কাঁপা-কাঁপা স্বরে স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইবরাহিম, আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আপনি আমাদেরকে এমন বৃক্ষ-তরুলতাহীন উপত্যকায় কার হেফাজতে রেখে যাচ্ছেন?'

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম জানতেন এই পরীক্ষা শুধু তার জন্যই নয়, তার স্ত্রীর জন্যও। অবশ্য তার নিজ থেকে বুঝা উচিত ছিল যে, আমার স্বামীর স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে এমন স্থানে একা রেখে যাওয়ার রহস্য কী! কিন্তু হজরত হাজেরা বার বার একই প্রশ্ন করছিলেন। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামও নীরবে পথ চলছিলেন। তখন হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীর এই নীরবতা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করলেন,

---

[৭৯] তার হিব্রু নাম 'হাগার'। মিসরের ফেরাউন যখন সারা রা. এর কারামত দেখার পর হাজেরাকেও সাথে দিয়ে দেন, তখন তার নাম 'আজেরা' রাখা হয়, যার অর্থ এই কন্যা ঐ মুসিবতের প্রতিদান, যার মাধ্যমে বাদশাহর জুলুম দূর হয়ে যায়। এরপর যখন হিজরত করেন এবং মক্কাতে আবাদ হন, তখন তার নাম হাজেরা হয়ে যায়। [রাহমাতুললিল আলামিন- ২/৩০৮]

আচ্ছা, আপনাকে কি আল্লাহ তায়ালা এই হুকুম দিয়েছেন?' তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপারটা এমনই।

হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহার অস্থির মন প্রশান্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার পাক্কা মুমিন বান্দি ছিলেন তিনি। প্রশান্তচিত্তে স্বামীকে বললেন, 'আমি তার রেজামন্দির উপর সন্তুষ্ট'- এই বলে তিনি আপন স্থানে ফিরে আসেন।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মক্কার সীমানা অতিক্রম করার পর যখন স্ত্রী-সন্তান দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, তখন তাদের সেই উপত্যকার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান।[৮০] তিনি তো আল্লাহর নবী ছিলেন। তার জানা ছিল পর্বত-ঘেরা মক্কার এই উপত্যকা সৃষ্টিকুলের এক পবিত্র স্থান। এখানেই আল্লাহ তায়ালার প্রথম ঘরের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। শত শত বছর যাবৎ নবী-রাসুলগণ এই ঘরের বরকত হাসিল করার জন্য জিয়ারত করেন। একজন অনুগত বান্দা এবং স্নেহশীল পিতা হিসেবে তিনি আল্লাহর দরবারে দু-হাত তুলে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দোয়া করেন,

> رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
>
> হে আমাদের প্রভু, আমি আমার সন্তানদেরকে আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে এমন এক ময়দানে রেখে এসেছি, যার ফসল উপযোগী নয়। আপনি তা আবাদ করে দিন। হে আমাদের রব, যেন তারা নামাজ কায়েম করে। অতএব, আপনি কিছু মানুষের অন্তর ওদিকে ঝুঁকিয়ে দিন। আর তাদের খাওয়ার জন্য ফলফলাদি দান করুন, যেন তারা শোকর আদায় করে।[৮১]

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখা, তার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা, তার রেজামন্দির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং তার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য বড় বড় কুরবানি ও আত্মত্যাগের অপূর্ব ও বেনজির

---

[৮০] সহিহ বুখারি- হাদিস ৩৩৬৪; (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া)

[৮১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই একিন ও বিশ্বাসই ছিল মূলত সর্বশেষ উম্মতের অস্তিত্বে আসার প্রস্তুতি। হাজার বছর পূর্ব থেকেই তার গঠনপ্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

আল্লাহ তায়ালা হজরত হাজেরা ও ইবরাহিম আলাইহিমাস সালামের কুরবানিকে ফলবান করেছেন। হাজেরা যেমন বলেছিলেন 'তা হলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। সত্যিই আল্লাহ কেয়ামত অবধি তার নাম সংরক্ষণ করেছেন।

জমজম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চলে যাওয়ার পর হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছেলেকে দুধ পান করাচ্ছিলেন এবং নিজেও মশক থেকে পানি পান করে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু লতাপাতাহীন মরুভূমিতে কতদিনই-বা ছোট মশকের পানি দিয়ে চলা যায়। খুব দ্রুত পানি ফুরিয়ে যায়। মায়ের দুধ শুকিয়ে যায়। দুধের শিশু ক্ষুধা আর পিপাসায় কাতরাতে থাকে। হজরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা সন্তানের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। কারো সাহায্যের জন্য বার বার উপত্যকার দু'পাশে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে উঠে সীমাহীন পেরেশানির সঙ্গে এদিক-ওদিক মানুষের সন্ধান করতে থাকেন। ওদিকে বাচ্চার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। এমন সময় কারো আগমনধ্বনি শোনা গেল। হজরত হাজেরা আগন্তুককে না দেখেই বলতে লাগলেন, 'তোমার মধ্যে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তা হলে আমাদের সাহায্য করো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরেশতাদের সরদার হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হন। তিনি আচমকা উপত্যকার এক কোনায় নিজের ডানা ঝাপটা মারেন এবং মুহূর্তেই ক্ষুধা-পিপাসা মিটে যায়। দুধের শিশু ইসমাইলের জন্য জমজম ঝর্না প্রবাহিত হয়, যার মাধ্যমে তার মিঠা পানি, খাদ্য এবং চিকিৎসার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। জমজম আজ অবধি বিশ্ববাসীর নিকট অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ঝর্না হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।[৮২]

---

[৮২] সহিহুল বুখারি- হাদিস ৩৩৬৪ (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া);

ফেরেশতার সেই অলৌকিক কর্ম এবং জমজমের বরকতে মরুভূমির মধ্যেও বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা হয়। ইয়েমেনের এক যাযাবর কবিলা বনু জুরহুম সেখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় পানি ও থাকার জায়গার খোঁজ করছিল। কবিলার লোকেরা দূর থেকে আকাশে পাখি উড়তে দেখে বুঝতে পেরেছিল আশপাশের কোথাও হয়তো পানি পাওয়া যাবে। তাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পেরেশান হয়ে বলতে থাকে, 'আমরা তো আগেও এই এলাকা অতিক্রম করেছি, কিন্তু এখানে পানির নাম-নিশানাও ছিল না।' পানির নিকট পৌঁছলে তারা জমজম এবং তার পাশে হজরত হাজেরা এবং ইসমাইলকে দেখতে পেল। তারা বলে, আমাদেরকে এখানে থাকার অনুমতি দেবেন? হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনুমতি দেন। এভাবেই বনু জুরহুম এখানে আবাদ হয়। তারা ছিল বনু কাহতানের অন্তর্গত। তাদেরকে আরবে আরিবা বলা হয়। আর বনু কাহতান ছিল মূল আরব। তাদের জন্মভূমি ছিল ইয়েমেন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের ভাষা ছিল সুরিয়ানি। কিন্তু বনু জুরহুম এখানে অবস্থান করার কারণে তারাও আরবিভাষা শিখে ফেলেন। হজরত ইসমাইল থেকে যে বংশধারার সৃষ্টি হয়, তাদেরকে 'আরবে মুসতারিবা' (অন্য বংশের সাথে মিশে যারা আরব) বলা হয়।[৮৩]

ছেলের কুরবানি

তখনও হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের একটি পরীক্ষা বাকি ছিল। এই পরীক্ষা ছিল পূর্বের দুই পরীক্ষা থেকে বেশি কঠিন। কারণ, এখানে ছেলের সম্মতি নেওয়াও জরুরি ছিল। স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দেশ দেন যে, 'ইবরাহিম, তুমি তোমার ছেলেকে কুরবানি করো।' এভাবে হজরত ইবরাহিম, হাজেরা এবং কমবয়সি ইসমাইল—তিনজনই পরীক্ষার সম্মুখীন হন। আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে তারা সবাই তার নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু শয়তান সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সৃষ্টিকুলের এমন পবিত্র বান্দাদের সংকল্পে চিঁড় ধরানোর কাজে। তাদেরকে আল্লাহর মহব্বত থেকে সরিয়ে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করার চেষ্টায় রত হয়। কিন্তু মা-বাবা, ছেলে—সকলেই নিজ নিজ অবস্থানে

---

[৮৩] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৯০

অবিচল ছিলেন। শয়তানকে তারা কঙ্কর ছুঁড়ে হটিয়ে দেন। সর্বশেষে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পুত্র ইসমাইলকে মিনাপ্রান্তরে কুরবানি করার জন্য নিয়ে গিয়ে তার গর্দানে ছুরি চালান। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে, 'ইবরাহিম, তুমি তোমার পরীক্ষায় সফল।' তখন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দেখলেন ইসমাইলের স্থানে একটি দুম্বা জবাই হয়ে আছে।[৮৪]

সময়ের গতিবিধি কিছুটা থমকে গিয়েছিল। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর দিয়ে তিন তিনটি বড় পরীক্ষা অতিক্রম করেছে। এখন এত বড় নবীকে পুরস্কার প্রদানের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

কাবাঘর নির্মাণ

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে ঐ ইজ্জত-সম্মান দেওয়ার জন্য ফয়সালা করে রেখেছিলেন, যার জন্য ইতিহাস অপেক্ষমাণ ছিল। তা হলো দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার প্রথম ইবাদতখানা নির্মাণ। হজরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন তিনি দুনিয়াতে অবতরণ করান, তখনই তাকে এই ঘর নির্মাণ করার হুকুম দেন। হজরত আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের দিকনির্দেশনায় বাইতুল্লাহর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তারা আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তাওয়াফ করেন এবং হজের দ্বিতীয় রোকন আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। তারপর থেকে বাইতুল্লাহ একটি নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত মুমিনদের মাধ্যমে আবাদ ছিল। হজরত নুহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের সময় বাইতুল্লাহর ভবনটি ভেঙে যায়, কেবল তার ভিত্তি অবশিষ্ট ছিল।[৮৫]

কালের বিবর্তনে এই ভিত্তিও একসময় ভেঙে পড়ে এবং কাবাঘর সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করলেন। তিনি চাইলেন যে, তার এবং তার ছেলের হাতে এমনভাবে বাইতুল্লাহর পুনর্নির্মাণ করাবেন- মানুষের মনে কেয়ামত পর্যন্ত ইবরাহিম আ. এর প্রতি সম্মান ও ভক্তি বাকি থাকে। আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে

[৮৪] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা সাফফাত, আয়াত ১০৩-১০৭

[৮৫] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৫০, ৫১

বাইতুল্লাহর সীমানা বলে দেন এবং নির্মাণের নকশাও প্রদান করেন। কুরআনে এসেছে:

> وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
>
> যখন আমি ইবরাহিমকে বাইতুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার গৃহ পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাজে দণ্ডায়মান এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্য।[৮৬]

এখন বাইতুল্লাহ দ্বিতীয়বারের মতো তাওহিদের প্রসার এবং আল্লাহর খালেস ইবাদতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

এই মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একবার সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মক্কায় উপস্থিত হন। যুবক হজরত ইসমাইল তিরন্দাজিতে দক্ষ ছিলেন। তিনি জমজম কূপের পাশে বসে তির তৈরি করছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে তির ফেলে উষ্ণ স্বাগত জানান।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার আসার উদ্দেশ্য ছেলেকে বললেন, 'বৎস, আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি বিশেষ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা আপনি পালন করুন।'

এ কাজে তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে?

হ্যাঁ, আমি আপনাকে সহযোগিতা করব।

হজরত ইবরাহিম তখন সামনের এক একটি টিলার দিকে ইশারা করে বলেন, 'আল্লাহর হুকুম হলো তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা।'

পিতা-পুত্র মিলে আল্লাহর নির্দেশিত ছক ও সীমানায় ভিত্তি নির্মাণ করেন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম পাথর উঠিয়ে দিতেন আর হজরত

---

[৮৬] সুরা হজ, আয়াত ২৬

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পাথর গেঁথে দিতেন। দেওয়াল যখন কিছুটা উঁচু হলো, তখন এক কোনায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করলেন। উভয়ের বিশ্বাস ছিল তারা এমন পবিত্র ঘর ও কেন্দ্র নির্মাণ করছেন, যেখান থেকে লা-শরিক আল্লাহর তাওহিদ ও একত্বের বার্তা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে, এবং যে ঘর আল্লাহ-ভোলা অন্তর, পরস্পর বিদ্বেষী পরিবার, পথভ্রষ্ট লোকজনসহ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত জাতিগোষ্ঠী- সবাইকে তাওহিদের গণ্ডিতে একতাবদ্ধ করার কেন্দ্রস্থল হবে। এখানে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষ সকলকে এক উম্মাহর ঝান্ডাতলে সমবেত করবে।

কাবা নির্মাণের এমন মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখেই পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

> হে আমাদের রব, আমাদের আমল কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।[৮৭]

কাবা শরিফ নির্মাণ যখন পূর্ণ হয়, তখন মানব-ইতিহাসের এই দুই মহান নবী এই দোয়া করেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> হে আমাদের রব, তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন নবী প্রেরণ করুন- যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।[৮৮]

তাদের দোয়া কবুল হয়। শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর হবেন- এই ফয়সালা হয়ে গেল। সেই সাথে এরও ফয়সালা হলো যে, শেষনবী তার

---

[৮৭] সুরা বাকারা, আয়াত ১২৭; সহিহুল বুখারি- ৩৩৬৫ (কিতাবু আহাদিসিল আমবিয়া)

[৮৮] সুরা বাকারা, আয়াত ১২৯

বংশধর হওয়ার পাশাপাশি নবীকুল শিরোমণি হবেন, তার হাতেই পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বিপ্লব ঘটবে।

হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব (আলাইহিমাস সালাম)

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম শামে অবস্থানকালে অপর স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্ম নেন। ইরাক, শাম এবং মিসরের মতো বিশাল সাম্রাজ্যে অবস্থানরত সকল মানুষের ইসলাহ ও সংশোধনের দায়িত্ব তার সন্তানদের উপর অর্পণ করেন। তাদের মধ্যে বড় বড় রাসুল জন্ম নিয়েছেন; যেমন : হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত ইউশা, হজরত দাউদ, হজরত সুলাইমান, হজরত উজাইর, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালাম।

হজরত মুসা এবং তার পরবর্তী সকল নবীকে বনি ইসরাইলের নবী বলা হতো। কারণ, তারা হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো ছেলের বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম ছিল ইসরাইল (আল্লাহর বান্দা)। তাই তার বংশে জন্ম নেওয়া নবীদের বনি ইসরাইলের নবী বলা হতো।

হজরত লুত আলাইহিস সালাম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর সর্বপ্রথম যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের মধ্যে তার ভাতিজা লুতও ছিলেন। তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে হিজরত করে জর্ডানের সাদুম গোত্রে বসবাস করতে থাকেন।[৮৯]

কওমে সাদুম আল্লাহ তায়ালার নাফরমানিতে লিপ্ত ছিল। অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তারা তাদের যৌনচাহিদা মেটাত। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য লুত আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেন। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু এই নির্লজ্জ জাতির মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। তারা তাদের গোমরাহি ও বেহায়াপনায় অবিচল ছিল। পরিশেষে

---

[৮৯] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/১০৫, ১০৯

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেন। সাদুম গোত্রের বসতি উলটে দেওয়া হলো। আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হলো। হজরত লুত আলাইহিস সালাম গুটিকয়েক মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর নির্দেশে বসতি থেকে বের হয়ে যান। সেই আজাব থেকে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারেনি।[৯০]

কওমে সাদুমের বস্তি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যে, আজও বিস্বাদ পানির একটি সমুদ্র ছাড়া তার কোনো কিছুই দেখা যায় না। একে মৃতসাগর বলা হয়। এই সাগরে কোনো প্রাণী জন্মাতে পারে না।

হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অপর ছেলে ইসহাক আলাইহিস সালাম শামে পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম নিজের সন্তানদের মিল্লাতে ইবরাহিমে অবিচল রাখার এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত রাখার প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। তার সন্তানদের মধ্যে ইসরাইল এবং ঈস খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈসের বংশধরদের মধ্যেই হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করা হয়। তিনি খুব বিত্তবান ছিলেন। বাগ-বাগিচা, গবাদিপশু, প্রাসাদ সবই তার ছিল।

হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করছিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ধীরে ধীরে পরীক্ষায় ফেলেন। ভীষণ কষ্টদায়ক ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। পরিবার-পরিজনও বিভিন্ন মুসিবতের শিকার হয়। তার দেখভাল করার মতো কেউ ছিল না। কেবল তার স্ত্রী ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর সেবা করেন। আঠারো বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন। তিনি সুখময় জীবনে শোকর এবং মুসিবতের সময় সবরের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।[৯১]

---

[৯০] সুরা হুদ, আয়াত ৭০-৮৩; আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৫
[৯১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/২৪৫-২৪৯

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম

হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ তায়ালা নবুওয়াতের নেয়ামত দান করেছিলেন। হজরত ইয়াকুবের বারোজন ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ইউসুফ ছিলেন সবার ছোট এবং নেককার। আল্লাহ তাকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছিলেন। ভাইয়েরা হিংসাবশত তাকে মেরে ফেলার ইচ্ছায় এক নির্জন কূপে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করেন। কূপের নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী একটি কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিয়ে মিসরের দাসবাজারে বিক্রি করে দেয়। মিসরের জনৈক মন্ত্রী (তাকে আজিজ বলা হয়) তাকে ক্রয় করে ঘরের চাকর বানিয়ে দেন।

আজিজের স্ত্রী তার প্রতি আসক্ত হয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন তার জালে আটকা পড়া থেকে বিরত থাকেন, তখন সেই মহিলা বিফল হয়ে চক্রান্ত করে তাকে কারাবন্দি করে। জেলখানায় তিনি চৌদ্দ বছর কাটান। মিসরের বাদশাহ রাইয়ান বিন ওয়ালিদ আশ্চর্য একটি স্বপ্ন দেখে, যার ব্যাখ্যা দিতে সকলেই ব্যর্থ হয়। হজরত ইউসুফ তার ব্যাখ্যা বলে দিলে বাদশাহ তার প্রতি কেবল মুগ্ধই হননি, বরং তাকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগদান করেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাসন-ক্ষমতা লাভ করার পর পিতা ও আপন ভাইদের মিসর নিয়ে আসেন।[৯২]

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একশ' দশ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। তার চৌষট্টি বছর পর বনি ইসরাইলের সবচেয়ে বড় নবী হজরত মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।[৯৩]

মিসর এবং মিসরের ফেরাউনরা

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো মিসরীয় সভ্যতা। হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পৌত্র বিসর বিন হাম প্লাবনের পর নিজ বংশের ত্রিশজন লোক নিয়ে নীলনদের পারে ওঠেন এবং বর্তমান কায়রো থেকে বারো মাইল (উনিশ কিলোমিটার) দূরে 'মান্‌ফে' বসতি স্থাপন করেন।

---

[৯২] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/১২৩-১৩৭

[৯৩] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/১৭, ১৮

বিসরের ছেলে মিসর দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং কবিলাকে সুবিন্যস্ত করে। তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তারই নামে দেশের নামকরণ করা হয়। মিসরে বসতি স্থাপনকারীরা অধিকাংশই ছিল ভিনদেশি। তাদের মধ্যে কিবতি, আমালিকা, গ্রিসের লোকজন ছিল। তবে কিবতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

এই অঞ্চলটি ভিনদেশিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণ নিরাপত্তা এবং নীলনদের পানির মাধ্যমে চাষাবাদ করার মধ্য দিয়ে জনজীবনে সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে আসে। মিসরবাসী রসায়নবিদ্যা, নির্মাণশিল্পসহ বিভিন্ন পেশায় দক্ষ হয়ে ওঠে। মতাদর্শের দিক থেকে তারা পথনির্দেশকের শূন্যতায় ভুগছিল। তারা সূর্যের পূজা করত। তাদের মাঝে বিভিন্ন শয়তানিশাস্ত্রের প্রচলন ঘটে। মিসরীয় জাদু-টোনা পৃথিবীবিখ্যাত ছিল।

মিসরের হুকুমত মিসর বিন বিসরের সন্তানদের মাঝেই বদল হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল সিনান বিন ইলওয়ান (তুলিস)। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন মিসর আসেন তখন এই তুলিস মসনদে আসীন ছিল এবং তার কন্যা হাগার (হাজার) এর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সিনানের মৃত্যুর পর তার বংশে পতন শুরু হয়। একে একে দুজন নারী মসনদে আসীন হয়। তাদের দুর্বলতার সুযোগে শামের আমালিকা সম্প্রদায় মিসর দখল করে নেয়।

মিসরে আমালিকাদের প্রথম বাদশাহ ছিল ওয়ালিদ বিন দুমাগ। সে গরুর রাখাল ছিল। সে-ই প্রথম ফেরাউন উপাধি ধারণ করে। পরবর্তীতে মিসরের মসনদে আসীন-হওয়া সকল বাদশাহকেই ফেরাউন বলা হতো। কিছু কিছু ঐতিহাসিক তো মিসরের পূর্ববর্তী বাদশাহদেরও ফেরাউন বলে উল্লেখ করে থাকেন; অথচ তারা এই উপাধিধারী ছিলেন না। ওয়ালিদের ছেলে রাইয়ান তার শাসনামলে মিসরে খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো ব্যক্তিকে পেয়েছিল।[৯৪]

---

[৯৪] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৫৭, ৫৮, ৯৮

মিসরের অধিকাংশ ফেরাউন মুসলমান ছিল না ঠিক; কিন্তু তারপরও তাদের কেউই খোদা দাবি করেনি। জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়নি। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও তাদের অনুসরণ করেননি। রাইয়ানের ছেলে 'দারুম'-এর শাসনামলে তিনি ইনতেকাল করেন। মিসরের লোকেরা তো এই মহান নবীর বদৌলতে আর্থিক দীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে সুখী জীবন লাভ করেছে; কিন্তু তার আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকে তারা কেউ মনোযোগ দেয়নি। বরং তার ইনতেকালের পর তারা বুঝে নেয় যে, ঈমানের এই ঝর্নাধারা হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। তারা বলতে থাকে, তারপর আল্লাহ তায়ালা আর কোনো রাসুল প্রেরণ করবেন না।'[৯৫] এর পাশাপাশি মিসরবাসী পার্থিব জীবন এবং নির্মাণশিল্পে আত্মনিয়োগ করে এবং আল্লাহর পথ থেকে অনেকদূরে চলে যায়।

মিসরের প্রথম খোদা দাবিদার ফেরাউন : ওয়ালিদ বিন মুসআব

মানুষের আমল ও আকিদা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় মিসরে রাজনৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। কিবতি বংশের এক লোক, নাম ওয়ালিদ বিন মুসআব, পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিল। সে-ই আমালিকাদের হুকুমতের অবসান ঘটিয়ে নিজে মসনদে বসে। যেহেতু কিবতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তাই ওয়ালিদের নেতৃত্বে তারা সন্তোষ প্রকাশ করে। তাদের জানা ছিল না যে, একদিন এ-ই চরম অহংকারী ও দাম্ভিকে পরিণত হবে। ক্ষমতা কিবতিদের হাতে হস্তান্তর হওয়ার মাধ্যমে মিসর বাহ্যিকভাবে মজবুত হয়। ওয়ালিদ বিন মুসআব মিসরের সবচেয়ে শক্তিমান ও প্রতাপশালী ফেরাউনে পরিণত হয়। সে অনেক স্থাপনা নির্মাণ করে। সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। অবশেষে সে তার বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য এবং জনগণের সমর্থন দেখে খোদা দাবি করে বসে।[৯৬]

এদিকে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের সন্তানেরা বড় হতে হতে ১২টি কবিলায় রূপান্তরিত হয়। তাদেরকেই বনু ইসরাইল বলা হতো। তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দীনের উপর অবিচল ছিল এবং মিসরের শিরকি সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে মুক্ত ছিল। তবে পূর্ববর্তী

---

[৯৫] সুরা মুমিন, আয়াত ৩৪

[৯৬] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৫৭

ফেরাউনরা তাদেরকে বিশুদ্ধ আকিদা থেকে সরানোর জন্য মাঝেমধ্যেই তাদের উপর নির্যাতন চালাত। তাদেরকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক আখ্যা দিয়ে জোরপূর্বক শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু যখন ওয়ালিদ বিন মুসআব দম্ভ ও অহংকারে সীমালংঘন করে খোদা দাবি করে এবং জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন বনি ইসরাইল গোলামের মতো বেগার খাটতে থাকে।[৯৭]

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

এমন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। তিনি বনি ইসরাইলেরই একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের পূর্বে ফেরাউন একটি স্বপ্ন দেখে। জ্যোতিষীরা তার ব্যাখ্যা করে যে, বনি ইসরাইলে এমন সন্তান জন্ম নেবে, যে ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস করে ফেলবে।

ফেরাউন সেই বাচ্চাটিকে মেরে ফেলার জন্য বহু পদ্ধতি অবলম্বন করে। বনি ইসরাইলের নতুন ভূমিষ্ঠ কোনো শিশুকেই সে জীবিত রাখত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বিস্ময়কর উপায়ে হেফাজত করেন। বাচ্চাকে সিন্দুকে ভরে নীলদরিয়ায় ফেলে দেওয়ার কথা মায়ের দিলে আল্লাহ তায়ালা ঢেলে দেন। ঐ সিন্দুক ভাসতে ভাসতে নীলনদের ঐ পাশে চলে যায়, যা ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে গিয়ে লেগেছে। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সিন্দুক খুলে তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। আর এভাবেই ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংসকারী শিশুটি স্বয়ং বাদশাহর ঘরেই প্রতিপালিত হতে থাকে।

যুবাবয়সে একদিন অনিচ্ছায় এক কিবতিকে হত্যা করে ফেলার কারণে তিনি দেশ ছেড়ে মাদয়ান চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে শুয়াইব আলাইহিস সালামের খেদমতে থেকে তার তরবিয়ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তার মেয়ের জামাই হন। এরপর তিনি যখন তুর-পর্বতে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন, তখন

---

[৯৭] প্রাগুক্ত, তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বাকারা, আয়াত ৪৯

নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এখানেই তাকে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম হুকুম মোতাবেক ফেরাউনের দরবারে গিয়ে তাওহিদের পয়গাম শোনান এবং বনি ইসরাইলকে গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবি করেন। ফেরাউনকে তিনি সুস্পষ্ট মুজিজাও দেখান। কিন্তু তারপরও সে তার বিরোধিতা এবং হঠকারিতায় অটল থাকে। ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনি বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিসর ও সিনাই উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত কয়েক মাইলব্যাপী বিস্তৃত লোহিতসাগর। মুসা আলাইহিস সালাম তার কওমকে নিয়ে অলৌকিকভাবে তা গোপনে পাড়ি দেন। ফেরাউন তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সদলবলে সমুদ্রে ডুবে মরে।

ফেরাউন থেকে মুক্তি পেয়েই বনি ইসরাইল মুসা আলাইহিস সালামের নাফরমানি করতে শুরু করে। কারণ, শত শত বছর ধরে কিবতিদের সংস্পর্শে থেকে বনি ইসরাইলের ভেতরে মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আচরণ-উচ্চারণে বাহ্যিক ও জাগতিক বস্তুর প্রতি এমন অনুরাগ সৃষ্টি হয় যে, তারা বার বার দৃশ্যমান খোদাকে খুঁজতে থাকে।

লোহিতসাগরে ওঠার পর তারা এক কওমকে মূর্তিপূজা করতে দেখে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালামের নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য এমন একজন খোদা বানিয়ে দিন, যাকে দেখা যাবে। তার সামনে আমরা মাথানত করব। মুসা আলাইহিস সালাম তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তোমরা অত্যন্ত মূর্খ'।[৯৮]

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত আনার জন্য তুরপর্বতে গমন করেন, তখন তার অনুপস্থিতিতে সামেরি নামের এক দুষ্টলোক বনি ইসরাইলকে মাটির বাছুরের পূজার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। হাজার হাজার বনি ইসরাইল এই ফেতনার শিকার হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই নাফরমানির কারণে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিস্বরূপ তারা একে অপরকে হত্যা করে।

---

[৯৮] সুরা আ'রাফ, আয়াত ১০৩-১৩৮; তাফসিরে ইবনে কাসির দ্রষ্টব্য

মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে আসেন, তখন কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সন্দেহ পোষণ করে যে, অদেখা খোদার লিখিত বিষয়ের উপর কেন ঈমান আনব? অথচ ইতোপূর্বেও তারা আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখার দাবি জানিয়েছিল, তখন বজ্রপাতে তারা মারা যায়। মুসা আলাইহিস সালামের কাতর দোয়ার বদৌলতে তারা পুনরায় জীবন ফিরে পায়। তারপরও বনি ইসরাইল শোধরায়নি।

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের বাকি জীবন বনি ইসরাইলের আদর্শ ও আখলাক বিশুদ্ধ করার মধ্যেই কেটে যায়। তার দাওয়াতি কার্যক্রমে আপন ভাই হারুন আলাইহিস সালামও সহযোগী হিসেবে ছিলেন। উভয়কেই বার বার কওমের অবমূল্যায়ন এবং নির্বুদ্ধিতার শিকার হতে হয়েছে। বনি ইসরাইল তাওরাতের বহু বিধান কঠিন বলে অস্বীকার করে। এসব কারণে তাদেরকে বহুবার আসমানি হুঁশিয়ারির সম্মুখীন হতে হয়।[৯৯]

মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে তাদের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ফিলিস্তিনে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সেখানে আমালিকা নামে একটি মুশরিক কওম শাসন করত। আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে ঐ মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দেন। মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই হুকুম শোনালে তারা বলে, 'তুমি আর তোমার প্রভু মিলে তাদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো'।[১০০]

বনি ইসরাইলের এই গোঁড়ামি ও হঠকারিতার দরুন আল্লাহ তায়ালা কিছুদিন তাদেরকে দেশের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখেন এবং মিসর ও শামের মাঝে অবস্থিত 'তীহ' প্রান্তরে ঘুরাতে থাকেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তাদের সংশোধনের জন্য সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। এই অবস্থাতেই তিনি ইনতেকাল করেন।[১০১]

বনি ইসরাইলের নবীগণ : কাজি ও রাজাদের যুগ

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের অফাতের পর হজরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম নিজ বংশের ইসলাহ ও সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ

---

[৯৯] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বাকারা, আয়াত ৪৯-৬০

[১০০] সুরা মায়েদা, আয়াত ২৪

[১০১] সুরা তহা, সুরা কাসাস, সুরা শুআরা, আলকামিল ফিত তারিখ- ১/১৬৯-১৭২

করেন। বনি ইসরাইল অতীতের ত্রুটি সংশোধন করে হজরত ইউশার ঝান্ডাতলে সমবেত হয় এবং কওমে আমালিকার সঙ্গে জিহাদ করে তাদের রাজধানী 'আরিহা' বিজয় করে। আমালিকা পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের বহুলোক আফ্রিকায় পাড়ি জমায় আর তাদেরকেই বারবার জাতি বলা হয়।[১০২]

হজরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালামের ইনতেকালের পর চারশ' বছর পর্যন্ত বনি ইসরাইলের শাসনভার তাদের আলেমদের হাতে ছিল। এই যুগকে 'কাজিদের যুগ' বলা হয়। এরপরের যুগকে 'রাজা-বাদশাহদের যুগ' বলা হয়। এই যুগের মধ্যে ছিলেন হজরত শামউয়িল, হজরত দাউদ, হজরত সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম। তারা ছিলেন নবী ও বাদশাহ। তালুতের নেতৃত্বে জালুতের মতো পরাক্রমশালী দুশমনকে পরাস্ত করে বনি ইসরাইল জর্ডান সাগরের উপকূলীয় এলাকা দখল করে নেয়।

হজরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের শাসনামল ছিল বনি ইসরাইলের স্বর্ণযুগ। তাদেরকে তৎকালীন সময়ে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের শাসন জিন, পক্ষী ও বাতাসের উপরও চলতো। সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে সিংহাসনে দরবার বসাতেন, তা নিয়েই তিনি হাজার হাজার মাইল চোখের পলকে উড়ে যেতে পারতেন। শেষবয়সে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাইতুল মাকদাসে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ শুরু করেন। জিনরা এ কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। নির্মাণকাজ চলাকালেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইনতেকাল হয়ে যায়।[১০৩]

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর একবার বনি ইসরাইলের মধ্যে আকিদা এবং চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দেয়। তারা জাবুরের বিষয় বিকৃত করে। তাদের মধ্যে চরিত্রহীন লোকেরা শয়তানি শাস্ত্র, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যায় বড় গর্বের সঙ্গে দীক্ষা নিতে থাকে এবং দাবি করে যে,

---

[১০২] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ১৭৪-১৭৬

[১০৩] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ২০০-২১০

হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামও জাদুর মাধ্যমে জিনদের কাবু করে রেখেছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)।[১০৪]

আকিদা ও মতাদর্শের বিভেদ বনি ইসরাইলকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, এবং তাদের চিন্তার মধ্যে বৈপরীত্য আসার সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক ঐক্যও বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনারব রাজাগণ

সেই সময়ে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অনারব রাজা-বাদশাহরা সীমাহীন শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করছিল। ইরানি হুকুমতের পরিধি তো দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

অনারব রাজাদের চার স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তরকে ফিশদাযিয়া বলা হয়। এই স্তরের সকল বাদশাহর উপাধি ছিল ফিশদায। তার অর্থ ন্যায়পরায়ণ। তাদের প্রথম বাদশাহ ছিলেন 'উ শুহাঞ্জ'। বাকিদের মধ্যে তাহমুরুস, জামশিদ, বিওয়ারাসিপ (যাহহাক) আফরিদুন, মিনুচেহের এবং আফরাসিয়াব প্রসিদ্ধ ছিলেন। মিনুচেহের হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সমসাময়িক ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তরকে কায়ানি বলা হয়। এই স্তরের সকল বাদশাহর নামের শুরুতে 'কায়' শব্দটি যুক্ত করা হতো। তার অর্থ পবিত্র। কায়ানি রাজাদের মধ্যে 'কায়কুবায' (কায়কোবাদ), কায়কাউস, কায়খসরু, লাহুরাসেপ ও দারাবাড়ি বিখ্যাত ছিলেন। কায়কোবাদ হজরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালামের সমসাময়িক ছিলেন। সম্রাট দারা বাদশাহ সিকান্দারের কাছে পরাজিত হয়ে নিহত হন।

তিন স্তরে ছোট ছোট অঞ্চলের রাজাদের (মুলুকুত তাওয়াইফ)। এ স্তরে ডজন ডজন বাদশাহ ছিল। কায়ানি সালতানাত বিলুপ্তির পর গ্রিকদের তত্ত্বাবধানে ঐ রাজারা ছোট ছোট অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতে থাকে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ খান্দান ছিল আশগানি। এই বংশের জনক হলো 'আশগা' (আশ্‌ক), বাদশাহ সিকান্দারের ২৪৬ বছর পর সে মসনদে আসীন হয়। দ্বিতীয় আশগানি বাদশাহর নাম ছিল শাপুর।

---

[১০৪] সুরা বাকারা, আয়াত ১০২

বাদশাহ সিকান্দারের ৩১৬ বছর পর তার ক্ষমতার অবসান। তার কিছুদিন পরই হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। আশগানিরা প্রায় ৩০০ বছর শাসন করে। সর্বশেষ সাসানি যুদ্ধবাজ সরদার আর্দ শিরিন বাবাক আশগানি হুকুমত ধ্বংস করে ফেলে।

চতুর্থ স্তরকে সাসানি বলা হয়। আশগানিদের পতনের মধ্যদিয়েই সাসানি হুকুমতের যুগ আরম্ভ হয়। এই হুকুমতের প্রত্যেক বাদশাহকে 'খসরু' (কিসরা) বলা হতো। সাসানিদের প্রথম শাসক আয্দ শির বিন বাবাক এবং শেষ-শাসক ছিল ইয়াযদিগারদ। শেষ-রাজার মুকুট ও সিংহাসন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানদের দখলে আসে।[১০৫]

বনি ইসরাইলের পতনযুগ এবং দেশান্তর

আমরা এখানে বনি ইসরাইলের ঐ সময়ের কথা আলোচনা করব, যখন তাদের আকিদা-বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে শুধু তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্তই হয়নি, বরং তাদের ক্ষমতার মধ্যেও বিভক্তি চলে আসে। একদল বাইতুল মাকদাসকে কিবলা মানে। তারা ফিলিস্তিনের দক্ষিণে ইহুদা নামে একটি হুকুমত কায়েম করে। আরেকদল 'সা মুররা পর্বত'কে কিবলা মানে। তারা ফিলিস্তিনের উত্তরে 'ইসরাইল' নামে পৃথক হুকুমত কায়েম করে। এই যুগটাকে বলা হয় 'বিভক্তির যুগ'।

বনি ইসরাইলের মধ্যে তখনও অন্যের গোলামি করার রীতি অবশিষ্ট ছিল। এই সময় হজরত ইরমিয়া আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের সংশোধনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাদেরকে আসন্ন বিপদ সম্পর্ক সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে তার কথার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পরিশেষে তাদের বিক্ষিপ্ততার কারণে পারস্য সম্রাট 'লাহুরাসেপ'-এর অধীনস্থ ইরাকের শাসক বুখতু নাসার (প্যারিচাদ নেজার) শামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জাজিরাতুল আরবের সীমানায় প্রবেশ করার পর বুখতু নাসার আরব কবিলাগুলোর সরদারদের

---

[১০৫] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৪৭-৫২

থেকে সহায়তা পায়, তাদের মধ্যে কুরাইশের সম্মানিত প্রপিতামহ মাআদ বিন আদনানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুখতু নাসার ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে বাইতুল মাকদাস বিরান করে দেয়, তাওরাতের কপি পুড়িয়ে ফেলে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের ইবাদতখানা ধ্বংস করে দেয়, হাজার হাজার ইসরাইলিকে হত্যা করে, প্রায় ৭০ হাজার লোককে গ্রেফতার করে ব্যবিলন নিয়ে যায়। আরব কবিলাগুলোর সহযোগিতার প্রতিদান হিসেবে কিছু কবিলাকে ইরাকের সীমান্তে বসবাসের সুযোগ দেয়। এটি মুসা আলাইহিস সালামের ইনতেকালে ৯৯৯ বছর পরের ঘটনা।[১০৬] এই ঘটনার পাঁচশো পঁচাশি বছর পর হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন।

সত্তর বছর পর্যন্ত বাইতুল মাকদাস বিরান থাকে। তারপর যখন বাহ্মান (কুর্শ) পারস্যের সম্রাট হয়, তখন সে নির্বাসিত বনি ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়। পাশপাশি বাইতুল মাকদাসও পুনঃনির্মাণ করে। ব্যবিলন থেকে আগত লোকদের মধ্যে হজরত উজাইর আলাইহিস সালামও ছিলেন। তারা নিজেদের স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিয়ে পুনরায় তাওরাত লিপিবদ্ধ করায়। এভাবেই ইহুদিদের শরিয়তের উৎস দ্বিতীয়বার পুনরুদ্ধার হয়।

ইহুদিরা বহুদিন পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে। এমনকি গ্রিক-বিজেতা গ্রেট সিকান্দার এশিয়া-অভিমুখী হয় এবং বুখতু নাসার ফিলিস্তিন আক্রমণের ৪৩৫ বছর পর শাম, ইরাক ও ইরান দখল করে কায়ানি সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান। এভাবে ইহুদিরা গ্রিক বাদশাহদের গোলামে পরিণত হয়, যাদেরকে ফিলিস্তিনে 'হিরুডোস' বলা হয়। এমন লাঞ্ছনা এবং অপমানকর সময়েও বনি ইসরাইলের মধ্যে নবী-আগমনের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা কোনো ফল বয়ে আনেনি। ইহুদি আলেমরা তাওরাতকে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী বিকৃতির মাধ্যমে নবীগণের হেদায়েত এবং দাওয়াতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। উপরন্তু নবীগণকে ইউরোপের শাসকদের নিষেধাজ্ঞা এবং নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছিল।

---

[১০৬] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৩১-৩২

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের চৌষট্টি বছর পূর্বে রোমান শাসক পাম্পেই গ্রিকদের পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। তখন ইহুদিরা গ্রিকদের থেকে রোমানদের গোলামিতে চলে আসে। রোমানদের যুগে হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম আগমন করেন। উম্মতের প্রতি অতিশয় দরদি নবীগণ নিজ কওমের হেদায়েত এবং সংশোধনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। কিন্তু হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের উপর ইহুদিরা অপবাদ আরোপ করে তাকে করাত দিয়ে চিঁড়ে ফেলে। আর হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে রোমান শাসক এই অপরাধে শহিদ করে দেয় যে, সে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের ভাতিজিকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল, আর তিনি বাধা দিয়েছিলেন।[১০৭]

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম

হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের ছ'মাস পর হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার কুমারী মা হজরত মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভ থেকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তিনি ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর-নগর ঘুরে বনি ইসরাইলকে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহ তাকে ইনজিল শরিফ দান করেন। এই আসমানিগ্রন্থ প্রজ্ঞা ও নসিহতে ভরপুর ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদি ইনজিল অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং হজরত ঈসাকে জাদুকর পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছে এবং স্থানীয় রোমান সরকারের সাথে মিলে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছে। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ তাকে তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যান। ওদিকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সন্ধানদাতা 'ইহুদা' আল্লাহর আদেশে অবিকল নবীর চেহারাকৃতি পেয়ে যায়, ফলে ইহুদিরা তাকেই নবী ভেবে গ্রেফতার করে নিয়ে যথারীতি মামলা পরিচালনা করে। তারপর আদালতের ফয়সালা অনুযায়ী শূলে চড়ানো হয়।[১০৮]

---

[১০৭] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৩৩-৩৪

[১০৮] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ২৭৪-২৮৬

ইহুদিরা সে সময় থেকেই ভুল ধারণায় আছে যে, তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে; অথচ কুরআন কারিমে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি।'[১০৯]

ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর ইহুদিদের হঠকারিতা এবং অবাধ্যতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। তারা অন্যদের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে আসার জন্য এবং রোমানদের পরাজিত করার জন্য মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হতো। তাদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে ৭০ ঈসাব্দে রোমান শাসক টিটুস ইহুদিদের গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে সুলাইমানি ইবাদতখানা ধ্বংস করে দেয়। ৫১৩ ঈসাব্দে আরেক শাসক এডরিয়ান তাদের উপর আরো অধিক আক্রোশ ঝাড়ে এবং বাইতুল মাকদাস থেকে তাদেরকে বের করে দেয়। ইহুদিরা তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। তন্মধ্যে কিছু লোক জাজিরাতুল আরবে এসে হিজাজের 'ইয়াসরিব' শহরে বসতি স্থাপন করে।

খ্রিষ্টবাদে ফাটল

ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার মুষ্টিমেয় অনুসারীর অনেকেই মারা যায়। আর যারাও বেঁচে ছিল, তারা রোমান শাসকদের অত্যাচার ও নজরদারির কারণে খ্রিষ্টবাদের খুব বেশি প্রচার-প্রসার করতে সাহস পায়নি। অনেক অনুসারী তাদের দীন বাঁচিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বৈরাগ্যের জীবন বেছে নেয়।

এক ব্যক্তি জোরেশোরে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছিল। তার আসল নাম সাউল। কিন্তু সে পল নামে খ্যাতি লাভ করে। সে ছিল কট্টর ইহুদি। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তার শক্ত বিরোধিতা করত। কিন্তু হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই সে তার উপর ঈমান আনয়নের দাবি করতে থাকে। তারপর সে এমন কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করে, যা ঈসা

---

[১০৯] সুরা মায়েদা, আয়াত ১৫৭

আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও শরিয়তের পরিপন্থি। সেই প্রথম হজরত ঈসা, জিবরাইল এবং আল্লাহ মিলে তিন খোদার মতবাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহকে পিতা এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে তার সন্তান বানায়। ইহুদিদের মতাদর্শ অনুযায়ী সেও হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের শূলে চড়ানোর মতবাদ প্রচার করে। হজরত ঈসার প্রকৃত অনুসারীরা তার কথা বিশ্বাস করতেন না। পুলিস এই আকিদা প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সঙ্গে এ কথাও চাওড় করে যে, খোদা তার ছেলেকে শূলে চড়িয়ে তার অনুসারীদের পূর্বের সকল গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

ঈসা আলাইহিস সালামের সত্যিকার হাওয়ারি তথা সাথিরা পুলিসের মতবাদের ঘোর বিরোধিতা করেন। এভাবে খ্রিষ্টধর্ম একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পুলিসের মতবাদ সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। সে নিজেই ইউরোপ গিয়ে তার মতবাদের প্রসার করে। তার মতাদর্শ যেহেতু রোমান ও গ্রিকদের ধারণার কাছাকাছি ছিল, ফলে গোপনে গোপনে মানুষ এই মতাদর্শ গ্রহণ করতে থাকে।

পুলিসের পর তার ভক্তরা প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখে। ধীরে ধীরে এই মতবাদই খ্রিষ্টধর্মের স্থান দখল করে। এটিই খ্রিষ্টধর্মের নামে শাম, মিসর, এশিয়া, কনস্টান্টিনোপল এবং রোমে প্রসার লাভ করে।

চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে নতুন সৃষ্ট খ্রিষ্টধর্ম রোমসম্রাট কুস্তানতিন বিন কুসতানস-এর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে। এই সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের কর্ণধাররা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আরেকজন শাসক খুঁজতে থাকে। তখন বাদশাহ কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ফলে গোপনে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ-করা লাখো মানুষ বৃদ্ধ সম্রাটকে বাঁচাবার জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। তখন তিনি সেসব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করেন, যারা প্রাচীন গ্রিক কল্পকাহিনিতে বিশ্বাসী ছিল। তাদেরকে পরাজিত করে নতুন ধর্মের পাল্লা ভারি করেন।[১১০]

৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকিয়াতে (বর্তমান তুরস্কের একটি নগরী) এই নতুন ধর্মের আলেমদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ত এবং খোদা ও ঈসার মাঝে পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে খ্রিষ্টধর্মের

---

[১১০] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/ ২৯৮-২৯৯

মৌলিক আকিদা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। পাশাপাশি ইনজিলের বিকৃত কপিগুলোকেই আসমানি কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অথচ তার মৌলিকত্বের কোনো ভিত্তি নেই।

এভাবেই খ্রিষ্টধর্ম আল্লাহর তাওহিদ ও একত্ববাদ থেকে দূরে সরে শিরকি আকিদার সমষ্টিতে রূপ নেয়। শুধু নাসিরিয়া (Nazarenes) নামক একটি ছোট্ট দল রয়ে যায়, যারা রোম সরকারের জবরদস্তি, পাদরিদের বিভ্রান্তি এবং ইহুদিদের চালবাজির পরেও নিজেদের মূল আদর্শে অটল থাকে। তা ছাড়াও কিছু খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী ও বুজুর্গ ব্যক্তিও বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে তারা নিজেদের চিন্তাধারা গোপন রাখতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নাজরানের জনৈক বুজুর্গ, যিনি আবদুল্লাহ বিন তামির নামক এক যুবকের হেদায়েতের মাধ্যম হন। আর আবদুল্লাহ বিন তামিরের প্রচেষ্টায় গোত্রের সকল লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় ইহুদি শাসক ইউসুফ যু-নাওয়াস ঐসব নতুন মুসলমানকে আগুনের পরিখায় পুড়িয়ে শহিদ করে দেয়। এই ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্তর বছর পূর্বের।[১১১]

এরপর বিশুদ্ধ খ্রিষ্টধর্ম একেবারেই নিভে যায়। হ্যাঁ, মক্কাতে খ্রিষ্টান আলেম ওরাকা বিন নাওফেলের মতো এক-দুজন খ্রিষ্টান ছিলেন, যারা অন্তরে হেদায়েতের আলোকরশ্মির বদৌলতে একটি আলোকিত ভোরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন।

---

[১১১] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বুরুজ

হজরত ঈসা আ. ও নবীজির মধ্যভাগে আরবের অবস্থা

জাজিরাতুল আরব এই পুরো সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্যতা থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে বিভিন্ন মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না বহিঃশক্তির ঠিকাদারি। আরব মরুভূমিতে বসবাসকারীরা প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে সাদাসিধা জীবনযাপন করত। তারা কোনো বিদেশি শক্তির কর্তৃত্ব পছন্দ করত না। অন্য কারো সভ্যতা ও মতাদর্শ গ্রহণেও তাদের আগ্রহ ছিল না।

জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থানও ছিল এমন যে, বহিঃশক্তির প্রভাব খুব কমই অনুভূত হতো। আরবের পূর্বে পারস্য-উপসাগরীয় তীর, এটিই ইরান থেকে আরবকে আলাদা করে রেখেছে। পশ্চিমে আছে লোহিতসাগর, এটি আফ্রিকাকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রেখেছে। দক্ষিণে আছে বিশাল ভারতসাগর, এটি পাড়ি দিয়ে ভারত উপকূলে ভেড়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্তই বটে। জাজিরার উত্তর দিকে রয়েছে একটি শুষ্ক ভূমি ও চতুর্দিকে পানি। শাম এবং রোমসাগরের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হিসেবে আছে এই শুষ্কভূমি। এর ফলে ইউরোপের কোনো জাহাজ সরাসরি আরব উপকূলে ভিড়তে পারত না।

এই জাজিরাতে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কোনো নবী প্রেরিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে নবী ও রাসুলগণের আগমন অব্যাহত ছিল। এ সময় আরব মরুভূমিতে বসবাসকারীরা (যদিও শিরকি কথাবার্তা ও কল্পকাহিনি তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ার কারণে পরিবর্তন হওয়াটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র) হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের দীনের কিয়দংশ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ইয়েমেন ও শামের মাঝামাঝি মরুভূমিতে বিচরণকারীরাও তা প্রত্যক্ষ করত।

আরব সম্প্রদায় হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ছেলে সামের বংশধর। এদের সবচেয়ে প্রাচীন সম্প্রদায় হলো 'আরবে বায়িদা', যারা হাজার বছর পূর্বেই বিলীন হয়ে যায়। তাদের বংশধর আদ-সামুদ, তাস্‌ম এবং জাদিসের মতো কয়েকটি সম্প্রদায় ছাড়া ইতিহাসে কারো নাম সংরক্ষিত নেই। আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছিল 'আরবে আরিবা'। এরা কাহতান বিন আবির-এর বংশধর। বিশুদ্ধ ভাষা, বাগ্মিতা ও অলংকারিত্বের কারণে তাদেরকে 'আরিবা' তথা সুস্পষ্টভাষী হিসেবে অভিহিত করা হতো।

তাদের মূল আবাস ছিল ইয়েমেন ও তার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে। জাজিরাতুল আরবের প্রকৃত ও প্রাচীন বাসিন্দা মূলত এই লোকগুলোই। আরব হওয়ার কারণে তাদের বংশগুলোই সবচেয়ে সংরক্ষিত ছিল। তারা বড় বড় হুকুমত এবং নগরী আবাদ করেছিল, যেগুলোর আচার-স্বভাবের বর্ণনা প্রাচীন আরব-ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। আরবের তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল মুসতা'রিবা (মুতাআররিবা)। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর ছিল।[১১২]

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর

হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম কাহতানি কবিলার বনু জুরহুমের সরদার মুদাদ-এর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তার বারজন পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। তারমধ্যে নাবিত এবং কাইদার অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল। নাবিত হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরে কাবা শরিফ এবং জমজম ঝর্না দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করত। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অনেক বরকত দেন। জনসংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, মক্কার ভেতরে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় তাদের বাইরে এসে বসতি স্থাপন করতে হয়। এই বংশে আদনানের জন্ম হয়। আদনান আরব-ইতিহাসে খ্যাতি ও যোগ্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন। তার বংশধারা সর্বাধিক সংরক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। আদনানের পরই আরবের মধ্যে বনু কাহতান এবং বনু আদনান আলাদা আলাদা কবিলা হিসেবে পরিগণিত হয়। সময়ের

---

[১১২] নিহায়াতুল আরাব ফি মা'রিফাতি আনসাবিল আরাব- কালকাশানদি- পৃষ্ঠা ১১-১৩ (দারুল কিতাব আললুবনানিয়য়িন' সংস্করণ)

আবর্তনের সাথে সাথে তাদের মাঝে বিভাজন মজবুত হতে থাকে। এমনকি পারস্পরিক শত্রুতাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রত্যেকের যুদ্ধসাজও ভিন্ন ছিল। কাহতানিরা হলুদ পতাকা এবং হলুদ পাগড়ি ব্যবহার করত আর আদনানিরা লাল পতাকা এবং লাল পাগড়ি পরত।[১১৩]

আদনানের সন্তানদের মধ্যে মাআদ বিন আদনান অনেক সুনাম কুড়িয়েছেন। তার যুগেই শামদেশে বুখতু নাসারের আক্রমণ হয়। এতে আরবরাও অনিচ্ছায় তার সহযোগী হয়। মাআদের ছেলেদের মধ্যে মুযার-এর নাম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তার বংশে ফিহ্‌র বিন মালিক জন্ম নেয়। তার সন্তানেরাই কুরাইশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১১৪]

জাজিরাতুল আরবের মধ্যভাগে বসবাসরত আরবদের পরিচালনা-পদ্ধতি সর্বোচ্চ গোত্রপতি কেন্দ্রিক ছিল। কোনো সময় বিশেষ উদ্দেশ্যে একাধিক কবিলাও একতাবদ্ধ হয়ে যেত। নিয়মতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থা জাজিরাতুল আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ আরবে ইয়েমেনের হুকুমত, উত্তর-পূর্বে হেরাতের শাসন এবং উত্তর-পশ্চিমে গাসসানের হুকুমত চলত। এই হুকুমতগুলো কিছু বিশেষ গোত্রের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। যেমন : ইয়েমেন কাহতান বংশের সাবাগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হচ্ছিল। কবিলাগুলো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিছু প্রসিদ্ধ বংশের অধীনে ছিল। যেমন বনু আদনানের নেতৃত্ব কুরাইশের হাতে ছিল।[১১৫]

কওমে সাবা, হিময়ারের রাজা এবং তাবাবিয়া

জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণে সাবাগোষ্ঠীর রাজত্ব আট শতাব্দীকাল (৯৫০-১১৫ খ্রিষ্টপূর্ব) পর্যন্ত বহাল থাকে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাহতান বিন আবির। নুহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইয়েমেন আবাদ করে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[১১৩] ফাজরুল ইসলাম, আহমাদ আমিন- পৃষ্ঠা ৬; (দারুল কিতাবিল আরাবি সংস্করণ)

[১১৪] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৯০-৯৫; (আলবাবি আলহালাবি সংস্করণ), আত-তারিখুল ইসলামি আলআম- আলি ইবরাহিম হাসান- পৃষ্ঠা ২৫ (মাতবাআতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ সংস্করণ)

[১১৫] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৬৬, ৬৭

পরবর্তীতে তার প্রপৌত্র 'সাবা' এসে ধারাবাহিক বিজয়ের মাধ্যমে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনিই মাআরিবে জীবিকার জন্য এক আশ্চর্য বাঁধ নির্মাণ করেন, যার থেকে সত্তরটি নদী বয়ে যেত। আর এটা খুব সুপ্রশস্ত এবং ফলবান প্রমাণিত হয়। যার ফলে সাবা রাজ্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির জোয়ারে ভাসতে থাকে।

সাবার ছেলে হিময়ার ছিল পিতার স্থলাভিষিক্ত। তার ঔরসেই সাবার কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাদশাহর জন্ম হয়। সাবার একটি ছোট গোত্রের প্রথম তুব্বা হারেস অনেক খ্যাতি অর্জন করে। তুব্বারই ছেলে সুআব পূর্ব-পশ্চিমের বড় বড় সাম্রাজ্য জয় করে যুলকারনাইন উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত অনুযায়ী তিনিই পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন।

ধীরে ধীরে কওমে সাবার রেনেসাঁ ও অগ্রগতি হতে থাকে। চাষাবাদের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জলে-স্থলে ইয়েমেন থেকে শাম পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যকাফেলা দিয়ে ভরে যায়। হিন্দুস্থান এবং পূর্বাঞ্চল থেকে মালপত্র এসে ইয়েমেনের উপকূলে ভিড়ত। সেখান থেকে ইয়েমেনি ব্যবসায়ীরা পণ্য সামগ্রী শামে নিয়ে খুব লাভজনক ব্যবসা করত।[১১৬]

সাবার রাজবংশের নবম পুরুষে গিয়ে বিলকিস বিনতে শুরাহবিল সাবা-রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং পূর্ণ বিশ বছর খ্যাতির সঙ্গে রাজত্ব করে। কওমে সাবা সূর্যপূজারি ছিল। কিন্তু বিলকিস হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআনে তার ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।[১১৭]

কওমে সাবা সামগ্রিকভাবে নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসে অটল থাকে। সম্পদের প্রাচুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির ফলে তারা গাফলতি ও অকৃতজ্ঞতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সাবাগোষ্ঠীর প্রবাস-নিবাসে আরাম-আয়েশের উপকরণ এত সহজলভ্য ছিল যে, তারা অকৃতজ্ঞতাবশত আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে যে, সকল নেয়ামত তারা কষ্ট ও পরিশ্রম করে অর্জন

---

[১১৬] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৬৬, ৬৭

[১১৭] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা নামল, আয়াত ২০-৪৪

করবে। পরিশেষে তাদের উপর এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি আপতিত হয়। তাদের বিখ্যাত মাআরিব বাঁধ ভেঙে যায়। সাম্রাজ্যের রাজধানী মাআরিব পানিতে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বাঁধভাঙা বন্যা সাবা সাম্রাজ্যের বসতি, ক্ষেত-খামার তছনছ করে ফেলে। ফলে লোকজন দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। এভাবেই সাবা সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১১৮]

সাবা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ইয়েমেনে সাবাগোষ্ঠীর বিভিন্ন সরদার ছোট ছোট দুর্গ এবং বস্তিতে পৃথক পৃথক হুকুমত কায়েম করে। তন্মধ্যে 'তাবাবিয়া সাম্রাজ্য' ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টপূর্ব একশ' পনেরো বছর পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য অটুট থাকে। এই হুকুমতের বাদশাহদের 'তুব্বা বলা হতো। লোহিতসাগর থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে তার পরিধি ইয়ামামা, হিজাজ এমনকি ইরান, খোরাসান এবং মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সাবার রাজাদের বিপরীতে তাবাবিয়া রাজাদের দেশজয় এবং সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল।

তাবাবিআ শাসকদের মধ্যে শিমর, আবু কারিব, তুব্বা (মধ্য তুব্বা), তুব্বা বিন হাসসান (কনিষ্ঠ তুব্বা) এবং হারিস বিন আমর অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। হারিস বিন আমর ইহুদিধর্ম গ্রহণ করায় ইয়েমেনের রাষ্ট্রধর্ম ইহুদি করা হয়। আর এজন্যই তার বংশের রাজা ইউসুফ যু-নাওয়াস হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সহিহ আকিদায় বিশ্বাসী নাজরানের হাজার হাজার নগরবাসীকে আগুনের পরিখায় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়। এই ভয়ানক নিপীড়নই হিময়ারের রাজত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হাবশিদের আক্রমণে রাজা ইউসুফ যু-নাওয়াসের রাজত্ব উলটে যায়। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের প্রায় সত্তর বছর পূর্বের ঘটনা।[১১৯] সে হিসেবে বনু হিময়ারের শাসনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১১৫ সাল থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয়শ' পনেরো বছর হয়। এ সময়ে ছাব্বিশজন বাদশাহ রাজত্ব করে।[১২০]

[১১৮] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা সাবা, আয়াত ১৫-১৯

[১১৯] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৩৮৮-৩৯২

[১২০] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৬৮

ইয়েমেনে হাবশিদের কর্তৃত্ব এবং সাইফ বিন যি-ইয়াযানের আজাদি আন্দোলন

বনু হিময়ারের পর ইয়েমেনে ৭২ বছর হাবশিদের হুকুমত চলে। তাদের চারজন রাজা রাজত্ব করেন। প্রথমজন- আরিয়াত, দ্বিতীয়- কাবাশরিফ আক্রমণকারী আবরাহা; এই দু'জনের শাসনকাল অনেক দীর্ঘ হয়। আবরাহার পর তার দুই ছেলে ইয়াকসুম এবং মাসরূক পালাক্রমে শাসক হয়। উভয়ই স্বল্পসময় রাজত্ব করে। স্মর্তব্য, ইয়েমেনের এই হাবশি শাসকদের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ক্ষমতায় আরোহণের কোনো সুযোগ ছিল না। বরং তারা হাবশার রাজাকর্তৃক নিয়োজিত ইয়েমেনের গভর্নর ছিল। হাবশার বাদশাহ খ্রিষ্টান হওয়ায় তাকে কায়সারের অধীনস্থ অঙ্গরাজ্য বলা হতো।

অবশেষে ইয়েমেনের এক গোত্রপতি সাইফ বিন যি-ইয়াযান হাবশিদের বিরুদ্ধে আজাদি আন্দোলন গড়ে তোলে। আরবরা তাকে সমর্থন জানায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দু'বছর পর সাইফ বিন যি-ইয়াযানের হাতে হাবশি-শাসনের সমাপ্তি ঘটে।[১২১]

---

[১২১] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৩৯৪; তারিখে ইবনে খালদুন- ২৭৩

জাহিলিযুগে বিভিন্ন আরব রাজত্ব

হেরাত রাজ্য

প্রাচীন কুফার দক্ষিণে তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত বর্তমান নাজাফ-ই 'হেরাত' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গ্রেট সিকান্দারের আক্রমণের পর 'তানুখি' আরবরা নিজেদের হুকুমত কায়েম করে নিতে সক্ষম হয়। তানুখি আরব হলো ইয়েমেন থেকে হিজরতকারী বাহরাইন শরণার্থী। সেখানে তারা তানুখি নামে পৃথক পৃথক কবিলা গড়ে তুলে খ্যাতি লাভ করে।

গ্রেট সিকান্দারের আক্রমণের পর যখন ইরাক ও পারস্যে তাওয়ায়িফুল মুলুকির রাজত্ব শুরু হয়, তখন এই আরবরা সুযোগ পেয়ে জাজিরাতুল আরবের সীমান্তে অবস্থিত ইরাকের নগরীগুলো কব্জা করার চেষ্টা চালায়। এভাবে শুধু হেরাত নয়, আনবার থেকে নিয়ে ফুরাত নদী পর্যন্ত তারা দখল করে নেয়। আরব হেরাত যেহেতু পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত-ঘেঁষা ছিল, তাই এই দুই পরাশক্তির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব তাদের উপর থাকে। ফলে কিছু তানুখি আরব খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা নামের সাথে আবদ যুক্ত করত। যেমন : আবদুল মাসিহ, আবদু ইয়ালিল, আবদুল্লাহ ইত্যাদি। এজন্য তাদেরকে 'উব্বাদ'ও বলা হতো।[১২২]

ঐ হুকুমতের প্রতিষ্ঠাতা দাওস গোত্রের একজন উঁচু হিম্মতওয়ালা ব্যক্তিত্ব ছিল মালিক বিন ফাহম। সে নিজের বাসভবন এবং বাগবাগিচা সবই করে হেরাতে; কিন্তু হুকুমতের রাজধানী বানায় আনবারকে।[১২৩]

তারই ছেলে জাজিমা আল-আবরাশ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার বদৌলতে আরবদের নিকট প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়। সে ষাট বছর

---

১২২ আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৬১

১২৩ মুজামুল বুলদান- ২/৩২৮ (দারু সাদের, বৈরুত সংস্করণ)

হেরাতে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই জাজিমা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সমরকুশলী এবং দূরদর্শী আরব বাদশাহ ছিল।[১২৪]

আল-জাজিরায় আরব শাসক আমর বিন যারিবের সঙ্গে জাজিমার যুদ্ধ খুব প্রসিদ্ধি পায়। এ যুদ্ধে আমর নিহত হলে তার কন্যা 'যাব্বা' পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি কৌশল গ্রহণ করে। সে জাজিমার সাথে সন্ধি স্থাপন এবং তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে 'যাব্বা'র কাছে আসার আহ্বান জানায়। জাজিমা সেখানে গেলে তাকে হত্যা করে।[১২৫]

জাজিমার পর তার ভাতিজা আমর বিন আদি ইরাকি আরবদের শাসক হয়। সেই প্রথম হেরাত পদানত করে। আমর জাজিমার বন্ধু কুসাইরকে যাব্বা থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করে। কুসাইর নাক কেটে যাব্বার নিকট উপস্থিত হয়ে তার প্রতি আমর বিন আদির জুলুম-অত্যাচারের কপট গল্প বলে। এভাবে সে মজলুম সেজে যাব্বার আস্থা অর্জন করে। এরপর সে সুযোগবুঝে যাব্বার শহরে নিজের বাহিনী প্রবেশ করায় এবং যাব্বাকে কতল করে শহর গুড়িয়ে দেয়।[১২৬]

আমর বিন আদির পর তার স্থলাভিষিক্ত ইমরাউল কায়েসের শাসনামলে হেরাতের রাজাদের দৃঢ়তা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ইমরুউল কায়স সাসানি বাদশাহদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজেকে সুরক্ষিত করে নেয়। এটি চতুর্থ খ্রিষ্টশতাব্দীর গোড়ার কথা। ইমরুউল কায়সের দৌহিত্র প্রথম নুমান হেরাতের রাজাদের সুনাম-সুখ্যাতি বিপুল পরিমাণে উচ্চকিত করে। তার শাসনামলেই আরব-ফরাসি সৈন্যরা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাহিনী হিসেবে ছিল। এদের মাধ্যমে বড় বড় আরব কবিলাগুলোকে বশে আনতে সক্ষম হয়।

নুমানের পর তার ছেলে মুনজির বিন নুমান সিংহাসনে বসে। তার উপর পারস্যের বাদশাহর এ পরিমাণ আস্থা ছিল যে, বাদশাহ খসরু ইয়াযদিগারদ আসিম তার ছেলে বাহরাম গোরের দীক্ষার জন্য মুনজিরের

---

১২৪ তারিখুত তাবারি- ১/৬১৩

১২৫ আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৩১৪-৩১৭

১২৬ প্রাগুক্ত- ১/৩১৮-৩২০

নিকট পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে মুনজির বাহরামকে পিতার সিংহাসনে বসানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে।[১২৭]

মাজদাকিয়াত এবং হেরাত রাজ্য

পঞ্চম খ্রিষ্টশতাব্দীর শুরুতে ইরানে এক নতুন মতাদর্শের আবির্ভাব হয়। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল মাযদাক। সে নারী, টাকাপয়সা এবং জমিজমা- সবকিছু উজাড় করে লোকদেরকে তার মতবাদের প্রতি আহ্বান করে। প্রবৃত্তিপূজার প্রতি আহ্বানকারী এই নতুন মতাদর্শ ইরানি রাজা কিসরা কুবাযের পছন্দ হলে সে তা গ্রহণ করে এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে। এমনকি কেউ যদি তা অমান্য করত, তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত করা হতো। এভাবে এই নতুন মতবাদ রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

হেরাতের শাসক মুনজির বিন মাউস সামা 'মাযদাকি' মতবাদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে কিসরা শক্তিপ্রয়োগ করে তার থেকে মসনদ ছিনিয়ে নিয়ে আরেক আরব শাহজাদা হারিস বিন আমরকে অর্পণ করে। সে মাযদাকি মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিসরা কুবায মারা যাওয়ার পর নওশেরওয়াঁ মাযদাকি মতবাদ বিলুপ্ত করে এবং হেরাতের শাসন-ক্ষমতা পুনরায় মুনজির বিন মাউস সামা'র কাছে ফিরিয়ে দেয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় হেরাতের শাসক মুনজিরের ছেলে আমর ছিল। রাষ্ট্রপরিচালনায় কঠোর নীতির কারণে তাকে 'কঠিনপ্রকৃতির মানুষ' বলা হতো।[১২৮]

বনু গাসসান

হেরাতের রাজারা যেমন আরবের পূর্বসীমান্ত এলাকাগুলো পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালনা করত, তেমনি জাজিরাতুল আরবের শাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো বনু গাসসান রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে পরিচালনা করত।

---

[১২৭] প্রাগুক্ত- ১/৩৬৫-৩৭০

[১২৮] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৭০, ৭১

বনু গাসসান বনু কাহলানের শাখাগোষ্ঠী আজদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তারা মাআরিব বাঁধ-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইয়েমেন থেকে শামের সীমান্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত গাসসান নামের একটি ঝর্নার পাশে আশ্রয় নেয়। এজন্য তাদের নাম বনু গাসসান পড়ে যায়। তাদের প্রথম নেতা ছিল জাফনা বিন আমর। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪০০ বছর পূর্বেই গত হয়ে যায় সে। জাফনার বংশধররা দীর্ঘসময় শামের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো শাসন করে। ডজনখানেক শাসক রাজ্য-পরিচালনার দৃশ্যপটে আগমন করে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল হারিস বিন জাবালা ইয়াকুবি ফিরাকি। সে ছিল খ্রিষ্টানধর্মের অনুসারী। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে স্বীকৃতি দেয় আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও বড় ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে হারিস হেরাতের আরব শাসক মুনজির বিন মাউস সামা'র বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রোমান সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তারপর ৫৪১ সালে রোমানদের সহায়তায় দজলা নদী পার হয়ে ইরাকে আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করে। এভাবে গাসসান রাজ্যও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রোমানদের অধীনস্থ হওয়ার কারণে গাসসানি আরবরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং সময়ের ব্যবধানে অধিকাংশ লোকই পাক্কা খ্রিষ্টান হয়ে যায়। গাসসানিদের সর্বশেষ শাসক ছিল জাবালা বিন আয়হাম। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সে মুসলমান হয়। কিছুদিন পর মুরতাদ হয়ে যায়।[১২৯]

বহিঃশত্রুর আক্রমণের টার্গেটে আরব

জাজিরাতুল আরব পারস্য ও লোহিতসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের সাথে সংযুক্ত থাকায় পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক মূল্যবান এলাকা ছিল। প্রতিবেশী দেশগুলো এসব শুষ্ক ও সবুজ-শ্যামল ভূমি দখল করার উপকারিতা ভালো করেই জানত। কিন্তু আরবরা স্বভাবতই ছিল স্বাধীনচেতা। এজন্যই তারা সমসাময়িক বিশ্বপরাশক্তির কাছে কখনো পরাজয় বরণ করেনি। মিসরের ফেরাউন, ইরাক-পারস্যের কিসরাই কেবল আরবভূমি নিজেদের দখলে রাখতে চায়নি; বরং ইউরোপও

---

[১২৯] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৮৩-৮৮

তাদেরকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করার স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

গ্রিকবিজেতা গ্রেট সিকান্দার যখন ইরান, ভারতবর্ষ দখল করে ফেরার পথে জাজিরাতুল আরব জয় করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখন তার আকস্মিক মৃত্যু আরবদের এক রক্তক্ষয়ী লড়াই থেকে বাঁচিয়ে দেয়। মৃত্যুর সময় সিকান্দারের বয়স হয়েছিল মাত্র ছত্রিশ বছর। এর মধ্যে তেরো বছর সে দেশ শাসন করে।[১৩০]

সিকান্দারের পর গ্রিক হুকুমত দুর্বল হতে থাকে। অপরদিকে ইরানের কায়ানি খান খান্দানের সর্বশেষ সম্রাট দারা নিহত হবার পর (সিকান্দার তাকে হত্যা করেছিল) তার সামাজিক অবকাঠামো একদম ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে প্রাচ্যের গির্জাখ্যাত কনস্টান্টিনোপলের রোমান সাম্রাজ্য খুব দ্রুত উদ্ভাসিত হতে থাকে।

খ্রিষ্টপূর্ব চব্বিশ সালে রোমান সম্রাট অগাস্টাস জাজিরাতুল আরব দখল করার জন্য বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু মরুভূমির উত্তাপ এবং পানির স্বল্পতার কারণে রোমান বাহিনী পথিমধ্যেই হিম্মত হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়।

প্রায় তিনশো বছর পর যখন রোমান রাজ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করে, তখন আরবদেরকে নিজেদের আয়ত্তে নেওয়ার জন্য আরেকবার প্রচেষ্টা চালায়। আর এজন্য ধর্মপ্রচারের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। রোমান গির্জার পাদরি এবং সন্ন্যাসীদেরকে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে পাঠানো হয়। ইতোপূর্বে লোহিতসাগরের তীরে বসবাসকারী হাবশা রোমানদের দখলে এসে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা খুব ঘটা করে খ্রিষ্টানধর্মের প্রচার-প্রসার শুরু করে দেয়।

কিন্তু জাজিরাতুল আরবে রোমানদের প্রচার-প্রসার তেমন সফলতা পায়নি। ইয়েমেনে হিময়ারি রাজারা খ্রিষ্টানধর্মের অন্তরালে রোমানদের অগ্রসরতাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। তাদের রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য ইহুদিধর্ম গ্রহণ করে নেয়।

---

[১৩০] আলমুখতাসার ফি আখবারিল বাশার- ১/৪৫, আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৪৪

উপরন্তু ইয়েমেনের কিছু লোক খ্রিষ্টধর্ম কবুল করে। নাজরানে একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন তামের নামের এক যুবক তার ভক্ত হয়ে যায়। তার কারামতি দেখে নাজরানের বাসিন্দারা তাওহিদের কালিমা পাঠ করে নেয়। হিময়ারের বাদশাহ ইউসুফ যু-নাওয়াস তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে সমগ্র নাজরানবাসীকে আগুনের পরিখাতে নিক্ষেপ করে।[১৩১] এই ঘটনা কেবল হিময়ারেই নয়, জাজিরাতুল আরবের রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

রোমান রাজা জাস্টিনাস এই মর্মান্তিক সংবাদ পেয়েই হাবশার প্রশাসক নাজাশিকে ইয়েমেনের উপর আক্রমণ করে বনু হিময়ার থেকে নাজরানবাসীর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। তখন নাজাশি তার সেনাপ্রধান আরিয়াতকে সত্তর হাজার হাবশি সৈন্য দিয়ে ইয়েমেন-অভিমুখে পাঠায়। ফলে ইয়েমেন থেকে হিময়ারি বংশের হুকুমতের ইতি ঘটে এবং রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে খ্রিষ্টধর্মের সরকার কায়েম হয়। এই এলাকার ব্যবস্থাপক নির্বাচিত হয় আরিয়াত। উক্ত ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সত্তর বছর পূর্বেকার।

আরিয়াত থেকে আরেক হাবশি সরদার আবরাহা আল-আশরাম ইয়েমেনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। আবরাহা ছিল কট্টর খ্রিষ্টান। কাবা শরিফের প্রতি আরবদের সীমাহীন ভক্তি ও মহব্বত সে দু'চোখে সহ্য করতে পারত না। তাই সে ইয়েমেনে একটি জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা নির্মাণ করে আরবদের আহ্বান জানায় এই ঘরে হজ করতে আসার জন্য। কিন্তু আরবরা তার আহ্বানে মোটেই পাত্তা দেয়নি। তখন সে কাবা শরিফ ধ্বংসের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে মক্কানগরীতে চড়াও হয়। পরিণতিতে সে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে পুরো বাহিনীসহ ধ্বংস হয়ে যায়।[১৩২]

মক্কা উপত্যকা

শাম ও ইয়েমেনের ব্যবসার রাজপথে মক্কা হলো হিজাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত পাহাড়-টিলায় ঘেরা একটি নিম্নভূমি। মক্কা উপত্যকার উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল (সোয়া তিন কিলোমিটার) দৈর্ঘ্য এবং অর্ধমাইল (৮০০ মিটার) প্রস্থ।

---

[১৩১] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা বুরুজ

[১৩২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১/৫৬৪; সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪১-৪৬

নিম্নভূমির হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি টিলা থেকে নেমে সরাসরি উপত্যকা ভাসিয়ে দেয়। এ কারণে শহরবাসীকে বহুবার বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। উষ্ণ আবহাওয়ার এই নগরী হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্মৃতিবিজড়িত হওয়ার কারণে আরবদের নিকট ছিল অনেক মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এখানে হজের মৌসুমে আরবের সকল কবিলা একত্রিত হয়ে হজ পালন করত।

মক্কার নেতৃত্ব বনু জুরহুমের হাতে ছিল। কাবা শরিফের চাবি এবং তার বিভিন্ন খেদমতের দায়িত্ব বনু ইসমাইলের উপর ছিল। এই দায়িত্ব হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বড় ছেলে নাবিত পালন করত। নাবিতের পর বনু জুরহুমের কিছু লোভী লোক বনু ইসমাইলকে এই দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করে।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বনু জুরহুম মক্কা এবং কাবার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু তারা কাবার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেনি। অনেক পরিমাণে খেয়ানত করে বসে।

ইয়েমেনের মাআরিব বাঁধ যখন ভেঙে বন্যা বয়ে যায় এবং বিভিন্ন কাহতানি কবিলা উত্তরদিকে হিজরত করে, তখন তাদের একটি কাফেলা প্রবীণ সরদার আমর বিন আমিরের নেতৃত্বে মক্কায় আসে। কিন্তু বনু জুরহুম তাদেরকে জায়গা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর আমর বিন আমিরের দুই ছেলে আউস ও খাযরাজ তাদের সন্তানদের নিয়ে ইয়াসরিব (মদিনা) চলে যায়। আমরের তৃতীয় দৌহিত্র রবিয়া বিন আরিসা মক্কাতে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। তার সন্তানদেরকেই বনু খুজাআ বলা হয়।[১৩৩]

বনু জুরহুমের দখলমুক্তি এবং বনু খুজাআর কর্তৃত্ব স্থাপন

বনু খুজাআর শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা বনু জুরহুমকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মসজিদে হারামের কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। বলা হয়ে থাকে এটি ২০৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।[১৩৪]

---

[১৩৩] আখবারু মক্কা ওমা জাআ ফিহা মিনার আছারি, ইবনুল ওয়ালিদ আলআজরাকি- ১/৮০-৯০ (দারুল আন্দালুস সংস্করণ)

[১৩৪] আত-তারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ৯২; তারিখু মাকাতাল মুশাররাফাহ, ইবনে যিয়া- পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

বনু জুরহুম নিজেদের দুর্বলতা সত্ত্বেও কাবা শরিফকে সীমাহীন মহব্বত করত। মক্কা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর আপন পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ইয়েমেন চলে যাওয়ার পূর্বে তারা কাবা শরিফের জন্য সঞ্চিত অর্থকড়ি জমজম কূপে নিক্ষেপ করে তা মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়। এই অবস্থায় তাদের কবি আমর বিন হারেস নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করে:

كأنْ لَمْ يكُن بين الْحَجُون إلى صَفَا * أنِيسٌ ولم يَسْمُر بمكَّة سامِرُ

بل نحنُ كنا أهلُها فَأَزَالَنا * صُروفُ اللَّيَالي والجُدُود العَواثِرُ

وكنَّا وُلَاةُ البيت من بعدِ نَابتٍ * نَطُوفُ فما تَحظى لدينا المَكَاثِرُ

মনে হচ্ছে জায়হুন থেকে সাফা পাহাড় পর্যন্ত কোনো বন্ধু নেই
এবং মক্কাতেও গল্প শোনাবার জন্য কেউ বেঁচে নেই।
আমরাই তো ছিলাম এ নগরীর বাসিন্দা। কিন্তু রাতের দুর্বিপাক
এবং ভাগ্যের লিখন আমাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।

নাবিত বিন ইসমাইলের পর আমরাই বাইতুল্লাহর দেখভাল করেছি।

আমরা যখন তাওয়াফ করতাম, আমাদের কাছে আমাদের ধনদৌলতের কোনো মূল্য থাকত না।[১৩৫]

বনু জুরহুমের ক্ষমতাচ্যুতি এবং বনু খুজাআর দখলের কারণে ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ, বনু খুজাআ এই ঘরের দেখাশোনা করার পাশাপাশি শিরকের কেন্দ্রে পরিণত করে। অভিশপ্ত শিরকি কর্মকাণ্ডের সূচনা বনু খুজাআর সরদার আমর বিন লুহাই'য়ের হাতে সম্পন্ন হয়। এই ব্যক্তিকে আরবে উঁচুমাপের নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। তাকে বাদশাহদের মতো সম্মান জানানো হতো। ধনদৌলতে সমসাময়িক সরদারদের অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। তার উটের সংখ্যা বিশ হাজার বলা হতো। এই শান-শওকত এবং ভাবগাম্ভীর্যের কারণে তার যেকোনো কথা ও সিদ্ধান্ত চোখ বুজে মেনে নেওয়া হতো।[১৩৬]

মূর্তিপূজার সূচনা

আমর বিন লুহাই শাম থেকে ফেরার পথে সেখানকার লোকজনকে মূর্তিপূজা করতে দেখে। মূর্তিপূজকরা বিশ্বাস করত যে, মূর্তি রিজিক দেয়, বৃষ্টি দেয়, এদের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার

---

[১৩৫] ইবনে খালদুন- ২/৩৯৭ (দারুল ফিকর, সংস্করণ)

[১৩৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ইবনে কাসির- ১/৫৮৪ (দারু হিজর সংস্করণ)

আবেদন করা যায়, আর তারা পূর্ণও করে দেয়। শয়তানও তাদের এই শিরকি ধারণার কিছুটা বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। আমর বিন লুহাই 'হুবল' নামক মূর্তিটা সাথে নিয়ে এসে কাবা শরিফের সাথে যুক্ত করে মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করতে থাকে। অধিকাংশ লোকই তার অন্ধ অনুসরণ করে। এরপর খুব দ্রুত কাবা শরিফ মূর্তিতে ভরে যায়। আর আরবরা মূর্তিপূজাতে এত মত্ত হয়ে পড়ে, যে দীনে ইবরাহিম তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট প্রাণপ্রিয় ধর্ম ছিল, ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।[১৩৭]

হ্যাঁ, কিছু লোক শুরু থেকেই মূর্তিপূজাকে ধ্বংসাত্মক কাজ মনে করত। বনু জুরহুমের এক কবি শুহনাহ বিন খালাফ আমর বিন লুহাই'য়ের এই কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বলেন-

يا عَمرُو إنك قد أحدثتَ آلِهةً * شتَّى بمكة حولَ البيت أَنْصابَا

وكان للبيت ربٌّ واحدٌ أبدًا * فقد جعلتَ له في الناس أَرْبَابَا

لَتَعْرِفَنَّ بِأَنَّ اللهَ فِي مَهَلٍ * سَيَصْطَفِي دُونكُم للبيت حُجَّابَا

রে আমর, তুই তো বাইতুল্লাহর পার্শ্বে উপাস্য হিসেবে কত মূর্তি স্থাপন করলি!

এই ঘরের রব তো সর্বদা একজনই। কিন্তু তুই লোকদেরকে একাধিক উপাস্যের পরিচয় করালি।

জেনে রাখবি, আল্লাহ তায়ালা তোকে কেবল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। তিনিই তোদের ছাড়া অন্যদেরকে কাবা শরিফের রক্ষক হিসেবে মনোনীত করবেন।[১৩৮]

কুরাইশের উদ্ভব

বনু খুজাআ প্রায় ৩০০ বছর পর্যন্ত কাবা শরিফ দেখাশোনা করে। এই সময় ইসমাইল বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তি আদনানের সন্তানদের মধ্যে রবিয়া এবং মুযার প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় বড় কবিলায় পরিণত হয়েও কিছু কিছু শাখাগোত্রে বসবাস করছিল। মুযারের এক প্রপৌত্র খুযাইমার ছেলে কিনানা খুব খ্যাতি অর্জন করে। কিনানার বংশ তার ছেলে নজর থেকে

১৩৭ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ইবনে কাসির- ১/৫৮৪ (দারু হিজর সংস্করণ)

১৩৮ আলমুফাসসাল ফি তারিখিল আরাব- ডক্টর জাওয়াদ আলি- ১১/৮০

চলতে থাকে এবং অনেক বড় হয়। কিনানার প্রপৌত্র ফিহর বিন মালিকের জমানায় তারা বনু কিনানা নামে পৃথক কবিলায় পরিণত হয়। কিন্তু বনু কিনানার কয়েক পুরুষ পর্যন্ত কারো এমন সাহস হয়নি যে, বনু খুজাআ থেকে কাবা'র কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করবে। অবশেষে ফিহরের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষে এসে বিখ্যাত সরদার কুসাই বিন কিলাবের আবির্ভাব হয়। তিনিই তার সম্মানিত পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য কোমরবেঁধে লেগে যান।

কুসাইয়ের শৈশবকাল কাটে এতিম অবস্থায়। পিতা মারা যাওয়ার পর তার মা বনু উযরায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ফলে তার শৈশব বনু উযরায় কাটে। যৌবনে পদার্পণ করার পর নিজের আসল বংশের সম্মান এবং মুরব্বিদের সম্পর্কে জানতে পারে। তখন সে হিজাজ চলে আসে। এখানে এসে দেখতে পায় যে, কবিলার লোকেরা এখানে বড় বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করছে। তাদের জীবনের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। তারা কেবল নজর বিন কিনানার বংশধর হিসাবে বিক্ষিপ্ত কিছু গোষ্ঠীর মর্যাদা রাখত। কুসাই এদের সবাইকে একীভূত করে। তার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল যে, বনু খুজাআর সরদার তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখে তার নিকট নিজ কন্যাকে বিয়ে দেয় এবং মৃত্যুর পূর্বে কাবা শরিফের চাবিও তার হাতে সোপর্দ করে যায়। এর ফলে শত শত বছর পর বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বনু ইসমাইলের নিকট ফিরে আসে।[১৩৯]

কুসাই মক্কার একজন বড় সরদারে পরিণত হন। তিনিই মক্কার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর নিজ গোত্র বনু কিনানাকে সাথে নিয়ে বনু খুজাআ থেকে হারামের সীমানা দখলমুক্ত করেন। তারপর বনু কিনানার লোকদের মক্কা ও হিজাজের বিভিন্ন স্থান থেকে জমা করে মক্কায় স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়ে দেন। সবাইকে একত্রিত করার পর একটি সুবিন্যস্ত কবিলায় পরিণত করেন। এই কবিলার নামই 'কুরাইশ' দেওয়া হয়।

কুরাইশ নামকরণের একাধিক কারণ বর্ণনা করা হয়। কেউ বলে- কুরাইশ শব্দটি 'তাকাররুশ' থেকে নির্গত। তার অর্থ হলো বিক্ষিপ্ততার পর একত্রিত হওয়া। নজর বিন কিনানার বংশধরদের যেহেতু বিভিন্ন জায়গা

---

[১৩৯] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১১৭, ১১৮

থেকে একত্রিত করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; তাই এই নতুন একতাবদ্ধতাকে কুরাইশ বলা হয়।

কেউ বলে, নজরই কুরাইশ। তাই তার সন্তানরাও এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারো মতে ফিহর বিন মালিকের উপাধি 'কুরাইশ' ছিল। মূলত কুরাইশ একটি শক্তিশালী সামুদ্রিক প্রাণীকে বলা হয়। আর এরপরই যেহেতু কিনানার সন্তানদের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এসেছে, সে হিসেবে কুরাইশ বলা হয়ে থাকে।[১৪০]

কুসাইয়ের নেতৃত্বে মক্কায় ছোট একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল। সে মক্কার ব্যবস্থাপনাগত বিষয়গুলোকে ধর্মীয়, আইন এবং সামরিক বিষয়ে বিভক্ত করে। কাবা শরিফ, মসজিদে হারাম এবং হাজিদের সেবার পাশাপাশি নগরীর সেবা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমকে উন্নত করে। নগরীর সেবাগুলো ছয়ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. হিজাবাহ বা সিদানাহ : তথা কাবা শরিফের চাবি সংরক্ষণ করা। এর দায়িত্বের অধিকারীদের কাছে বাইতুল্লাহর চাবি সংরক্ষিত থাকত। তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না।
২. সিকায়াহ : হজের দিনগুলোতে হাজিদেরকে পানি পান করানো।
৩. রিফাদাহ : হাজিদের আহার করানো।
৪. লিওয়া : পতাকা স্থাপন করা, যার তলে সৈন্যরা একতাবদ্ধ হবে।
৫. কিয়াদাহ : রণাঙ্গনে সৈন্যদের নেতৃত্ব দেওয়া।
৬. নাদওয়াহ তথা পরামর্শসভা : মসজিদে হারামসংলগ্ন একটি উন্মুক্ত জায়গায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। এই জায়গাটিকে 'দারুন নাদওয়াহ' বলা হতো। কুরাইশি নেতারা এখানে বসেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। সৈন্যদের যুদ্ধের ময়দানে রওনা হওয়া এবং ব্যবসায়ী কাফেলার যাত্রা এখান থেকেই হতো। বিবাহানুষ্ঠানও এখানে হতো। ছেলেমেয়েদের বালেগ হওয়ার সত্যায়নও এখান থেকেই করা হতো, যেন আদমশুমারিতে যুবকদের নাম সংরক্ষণ করা যায়।

---

[১৪০] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১২৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ২/২০১

কুরাইশ হুকুমতের এই ছয়টি বিভাগ ছিল ছয়টি মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে। এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পারা অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করা হতো। কুসাইয়ের জীবদ্দশাতেই তার দুই ছেলে আবদুদ দার এবং আবদু মানাফ উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয়ে যুক্ত হয়।

কুসাই হাজিদের পানি পান করানো, আহার করানো, যুদ্ধপরিচালনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আবদু মানাফকে দেন। আর বাইতুল্লাহর চাবি সংরক্ষণ, দারুন নাদওয়ার তত্ত্বাবধান এবং পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব আবদুদ দারকে অর্পণ করেন।[১৪১]

বনু আবদুদ দারের অধীনে আজও পর্যন্ত কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে। মক্কাবিজয়ের সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বংশের সন্তান হজরত উসমান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চাবি সংরক্ষণের তার পূর্ববৎ দায়িত্বে বহাল রেখেই কেবল ক্ষান্ত হননি; বরং এই সুসংবাদও দেন যে, সর্বদা তার বংশের মধ্যেই এই দায়িত্ব থাকবে। কেউ যদি এই অধিকার ছিনিয়ে নেয়, তা হলে সে জালেম বিবেচিত হবে।১৪২

হাশিম

আবদু মানাফের দুই ছেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়: হাশিম এবং আবদু শামস। আবদু শামস যদিও দরিদ্র ছিল, কিন্তু কর্মতৎপর এবং নির্ভীক ছিল। তার সন্তানও কয়েকজন ছিল। তাই সে কুরাইশের যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। আবদু শামসের পর তার ছেলে উমাইয়া কুরাইশের সেনাপতি হয়। এরপর উমাইয়ার ছেলেদের মাঝেই দীর্ঘসময় পর্যন্ত এই দায়িত্ব ঘুরতে থাকে। আর উমাইয়ার ছেলেরাই বনু উমাইয়া নামে খ্যাতি লাভ করে।

আল্লাহ তায়ালা হাশিমকে সম্পদের প্রাচুর্য এবং নিশ্চিন্ততার নেয়ামত দিয়েছিলেন। তারই শোকর আদায়স্বরূপ তিনি নিরলসভাবে হাজিদের পানি পান ও আহার করানোর খেদমত আঞ্জাম দিতেন। তার নাম

---

[১৪১] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১২৫, ১২৯, ১৩০; আররাওযুল উনুফ- ২/৩৩, ৩৪ (দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি সংস্করণ)

[১৪২] আখবারু মক্কা, ইবনুল ওয়ালিদ আলআজরাকি- ১/২৬৫ (দারুল আন্দালুস সংস্করণ)

'হাশিম' রাখার কারণ ছিল, তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে অভাবীদের খাওয়াতেন।[১৪৩]

কুরাইশের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকাতে তারা ব্যবসা পরিচালনা করত। কিন্তু হাশিম তাদের ব্যবসার পরিধি আরো বিস্তৃত করেন। বহিঃদেশেও ব্যবসায়িক কার্যক্রম ছড়ানোর দুঃসাহস দেখান। তিনি নিজে শামের 'কায়সারিয়া' নগরীতে যান। এখানে রোমান কায়সারের অবস্থান ছিল। সেখানে গিয়েও হাশিম দৈনিক একটি বকরি জবাই করে আশপাশের লোকদের মেহমানদারি করতেন। কায়সার তা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হয়ে বলেন-

'মহামান্য বাদশাহ, আমরা আরব। ব্যবসা আমাদের পেশা। আপনার যদি মর্জি হয় তা হলে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দিন, যেন আমাদের লোকেরা হিজাজের পণ্যসামগ্রী এনে এখানে বিক্রি করতে পারে। এতে করে আপনি এসব পণ্য স্বল্পমূল্যে পেয়ে যাবেন।'

কায়সার তখনই নিরাপত্তাপত্র লিখে দেন। এরপর থেকে কুরাইশ-কাফেলা নির্ভয়ে ও নিরাপদে শাম আসা-যাওয়া করতে থাকে। এভাবে তাদের অবস্থা দিন দিন উন্নতি লাভ করে।[১৪৪]

কুরাইশের উত্থান

এটিই ছিল কুরাইশের উত্থানকাল। মক্কা শরিফ শাম ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক পথ হওয়ার কারণে সারা বছর তা জমজমাট ছিল। কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে শাম আর শীতকালে ইয়েমেন সফর করত। কারণ, শীতের মৌসুমে ইয়েমেনের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো আর গ্রীষ্মকালে শামের পার্বত্য এলাকাগুলো নাতিশীতোষ্ণ ছিল। এভাবে পুরো বছরই তাদের ব্যবসায়ের বাজার সরগরম থাকত।

বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী এবং তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর দিকে কেউ বাঁকাচোখে তাকাত না। তাদের কাফেলার পণ্যসামগ্রী বহন করার জন্য মাঝেমধ্যে আড়াই হাজারেরও

---

[১৪৩] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৩৬

[১৪৪] আলআওয়াইল, আবু হিলাল আসকারি, পৃষ্ঠা ২৬; আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০১

অধিক উটের প্রয়োজন হতো। আর তার সাথে শ' দু'শ লোক অবশ্যই থাকত।[১৪৫]

ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ মক্কায় আসা-যাওয়া করত। বিশেষত হজের মাসগুলোতে হাজিদের ভিড় লেগে থাকত। কুরাইশরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হাজিদের সেবা করত। এই সময় ব্যবসায়ে মুনাফাও হতো অনেক। নিজেদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, ব্যবসায়ের মুনাফার পাশাপাশি সমর ও কূটনীতির ক্ষেত্রেও তাদের দক্ষতা ছিল।

কুরাইশরা বনু গিফারকে অনেক বিপজ্জনক মনে করত। বনু গিফরের বসবাস ছিল হারামের নিকটবর্তী শাম যাওয়ার পথে। তাদের আকিদা-বিশ্বাসও কিছুটা ভিন্ন ছিল। কুরাইশের মূর্তিপূজা, কাবাঘর এবং হারামের প্রতি তাদের কোনো ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল না। তাই তারা শুধু ব্যবসায়ীই নয়; হাজিদের কাফেলাও লুটপাট করত। এভাবে একসময় তাদের উপর সুররাকুল হাজিজ (তথা হাজিদের চোর) লকব পড়ে যায়।[১৪৬]

কুরাইশ তাদের এই ভয়-ভীতি মোকাবেলার জন্য এক দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত বনু কিনানা এবং বনু মুদরিকার সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়। আর তাদেরকেই ইতিহাসে 'আহাবিশ' বলা হয়ে থাকে।[১৪৭]

তা ছাড়া গোলামদের সমন্বয়ে একটি পৃথক বাহিনী গঠন করা হয়, যাদের নামকরণ করা হয় 'উবদান'।[১৪৮]

ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন

মক্কার পর জাজিরাতুল আরবের দ্বিতীয় বড় শহর ছিল ইয়াসরিব। এটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল ছিল। এখানে বাগান ও কূপ অধিক পরিমাণে ছিল।

---

[১৪৫] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০১

[১৪৬] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০৬; আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, ডক্টর আলি সাল্লাবি- পৃষ্ঠা ১/৫৭১

[১৪৭] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১০৮

[১৪৮] সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/৬৭ (যিকরু মা'রাকাতি উহুদ)

খেজুর, আঙুর এখানকার প্রধান উৎপাদিত ফসল। মক্কাতে গরম ও শীত উভয়টাই বেশি, অন্যদিকে ইয়াসরিব আবহাওয়ার দিক থেকে অনেক ভালো এবং স্বাভাবিক। ইয়াসরিবের অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজ এবং বাগান পরিচর্যা-পেশায় লিপ্ত ছিল। কিছু লোক ব্যবসাও করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদিরা ছিল সবচেয়ে অগ্রসর। তারা শিল্প ও বিভিন্ন পেশায় অনেক বিখ্যাত ছিল। অস্ত্র ও গহনা তৈরিতে খুব দক্ষ ছিল। ইহুদিদের এক মহল্লা 'বনু কায়কা' ছিল গহনা তৈরির মূলকেন্দ্র।[১৪৯] তবে ইহুদিদের মধ্যে খুব কম বংশই ছিল বনু ইসরাইলি। তাদের অধিকাংশই আরব ছিল। তারা 'জুযাম' কবিলার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই জুযাম গোত্রের লোকেরা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল। এরপর তারা কওমে আমালিকার (এরা ছিল ইহুদিদের শত্রু এবং মূর্তিপূজারি জাতি) সংখাধিক্যে আতঙ্কিত হয়ে শামের কল্যাণময় ভূমি ছেড়ে হিজাজে পাড়ি জমায়।[১৫০]

বনি ইসরাইলের ইয়াসরিবে আসার পূর্ব থেকেই ইয়াসরিব আবাদ ছিল। তাদের পূর্বে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা ছিল বনু সা'দ, বনু আযরাক এবং বনু মাতরুফ। তারা কওমে আমালিকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। আমালিকা সে সময় মক্কাসহ হিজাজের বিভিন্ন এলাকাতে বসবাস করত। জুযাম গোত্রের আরব বংশীয় ইহুদিরা যখন ইয়াসরিবে আসে, তখন এখানকার আমালিকাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করত; ইয়াসরিবে আরব ইহুদিদের আগমনের একটি উদ্দেশ্য এটাও ছিল।

ইহুদি আলেমরা তাওরাতে পড়ে যে, শেষনবী হিজরত করে এমন খেজুরময় স্থানে আসবেন, যার দু'পাশে ঝলসে যাওয়া উঁচুভূমি।

---

১৪৯ আলমুফাসসাল ফি তারিখিল আরাব- ডক্টর জাওয়াদ আলি, ৭/২৬৪
(আরবিতে 'قين' মানে হলো কামার, আর 'قاع' অর্থ স্থান। সে হিসেবে 'قَيْنُقَاع' এর অর্থ হয় 'কামারপল্লী'।)

১৫০ আত-তাম্বীহ ওয়াল ইশরাফ, মাসউদি, পৃষ্ঠা ২১৩, তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৩৪৩। [তবে তাদের মধ্যে মূল বনি ইসরাইল বংশেরও লোক ছিল, যেমন- উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া রা. এর মা-বাবা বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত ছিলেন। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি নবীর কন্যা, তোমার চাচাও নবী (অর্থাৎ হজরত হারুন ও মুসা আলাইহিমাস সালাম)।' সুনানে তিরমিজি- বাবু ফাজলি আযওয়াজিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।]

ইয়াসরিব সেসব নিদর্শনের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এজন্য বহু ইহুদি এখানে বসতি গাড়ে। আর এটিই ছিল ইয়াসরিবে ইহুদিদের প্রথম পদার্পণ।[১৫১]

একটা সময় পর্যন্ত ইয়াসরিবে ইহুদিদের কর্তৃত্ব টিকে ছিল। কয়েক শতাব্দী পর যখন ইয়েমেনের সুপ্রসিদ্ধ বাঁধ ভেঙে যায় এবং সাবার বিশাল সালতানাত তছনছ হয়ে যায়, তখন সেখানকার কাহতানি আরবদের দুটি কবিলা ইয়াসরিবে স্থানান্তর হয়। এরা ছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্র। আওসের লোকেরা কৃষি এলাকায় ইহুদিদের বসতির নিকটে বসবাস শুরু করে। আর খাযরাজ ইয়াসরিবের মধ্যস্থলে বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে আউস এবং খাযরাজের অনেক বড় বসতি গড়ে ওঠে এবং ইয়াসরিবের এক বড় শক্তিতে পরিণত হয়। উপরন্তু ইহুদিরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহাল থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-সাহিত্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে। মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, ধূর্তামিতে তারা খুব পারঙ্গম হওয়ায় কখনো আউস এবং খাযরাজকে তাদের উপর বিজয়ী হতে দেয়নি। এই দুই শক্তির মাঝে সর্বদা যুদ্ধ, সন্ধি, আলোচনা এবং রাজনৈতিক দাঙ্গা লেগেই থাকত।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা যখন শামের ইহুদিদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে দেশত্যাগে বাধ্য করে, তখন ইহুদিদের বহু গোষ্ঠী ইয়াসরিবে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে বনু নাযির এবং বনু কুরাইযার লোক ছিল বেশি। এ দুটি গোষ্ঠী ছিল আরববংশোদ্ভূত ইহুদি ধর্মমতের অনুসারী এবং জুযামের শাখা গোত্রভুক্ত।[১৫২]

এটা মূলত আরবজাতীয়তাবাদেরই প্রভাব ছিল। তারা ইহুদি হওয়ার পরেও ইবরাহিমি রীতি-নীতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিল। মক্কা এবং কাবা শরিফের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। ইসরাইলি বংশোদ্ভূত হওয়ার দরুন সামগ্রিকভাবেই তাদের মধ্যে ধূর্তামি এবং কাপুরুষতা ছিল। কিন্তু এই আরব ইহুদিরা চতুর হওয়ার পাশাপাশি ছিল যুদ্ধবাজও। তাদের

---

[১৫১] মু'জামুল বুলদান- ৫/৮২ (মাদিনাতু ইয়াসরিব)

[১৫২] তারিখে ইয়াকুবি- পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০; বাবু মুলুকিশ শাম- পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩; বাবু বনু নাযির, বনু কুরাইযা

নামও আরবি ছিল। পরবর্তীতে আউস এবং খাযরাজের কিছু লোকও ইহুদি ধর্মমত গ্রহণ করে।[১৫৩]

যুদ্ধবাজ এই ইহুদিরা ইয়াসরিবে তাদের বস্তির চারপাশে প্রাচীর এবং দুর্গ তৈরি করে তাদের বসতিকে সামরিকভাবে মজবুত করে নেয়।[১৫৪] তারা ইয়াসরিবের উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের শিকার হয়। ইয়েমেনে যখন তুব্বা বাদশাহদের উত্থান হয়, তখন তাদের সর্বশেষ তুব্বা আসআদ আবু কারিব (তাকে হাসসান তুব্বাও বলা হয়) ইয়াসরিবের উপর চড়াও হয়। ইয়াসরিববাসী জানবাজি রেখে তাদের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে খাযরাজের বনু নাজ্জার সর্বাধিক বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবেলা করে।

হাসসান তুব্বা ইয়াসরিবকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু নগরীর প্রতিরক্ষায় ইহুদি এবং আরব একতাবদ্ধ ছিল। ওদিকে দুই ইহুদি আলেম হাসসানকে সতর্ক করেন যে, 'এমন (ইয়াসরিবকে ধ্বংস) করতে যাবেন না। কারণ, এই নগরী শেষনবীর হিজরতের স্থান হবে।' এ কথা শোনার পর হাসসান নিজের সংকল্প থেকেই কেবল ফিরে আসেনি, বরং নিজ গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার পথে মক্কায় অবস্থান করে সেখানকার ইহুদি আলেমদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাবা শরিফ তাওয়াফ করে, তাকে নতুন গিলাফ পরিয়ে দেয়।[১৫৫]

হাসসান তুব্বা কাবা শরিফের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক বনু জুরহুমকে এ মর্মে সতর্ক করে যায়, তারা যেন বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে হারামের প্রতিটি জায়গা নাপাকি-আবর্জনা থেকে পবিত্র রাখার ব্যাপারে যত্নবান হয়।[১৫৬]

ইয়াসরিবের আউস-খাযরাজ এবং ইহুদিদের বিরোধ

ইহুদি এবং আরবদের মাঝে গোড়ার দিকে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল; কিন্তু তা এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। এর বড় কারণ ছিল

---

[১৫৩] নবিয়ে রহমত- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২৩৩

[১৫৪] তারিখে ইবনু খালদুন- ২/৬১, ৩৪৩; নবিয়ে রহমত- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২২২ (তারিখুল ইয়াহুদ ফি বিলাদিল আরব ওয়া ফিলাস্তিন, পৃষ্ঠা ৯)

[১৫৫] তারিখে ইবনু খালদুন- ২/৬১

[১৫৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১২৬

আউস-খাযরাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তারা নিজেদেরকে ইয়াসরিবের একমাত্র শক্তিশালী গোত্র হিসেবে বেছে নেয়। ইহুদিরা তাদের বস্তি ও দুর্গে স্বাধীন এবং সুরক্ষিত হওয়ার পরেও আরবদের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকত। এতে করে উভয়ের মাঝে শত্রুতা তৈরি হয়। ফলে ইহুদিরা সর্বদা আরবদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এক সময় তারা তা পেয়েও যায়। কারণ, আউস-খাযরাজ প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। প্রত্যেক আরব গোষ্ঠীই যখন নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য মশগুল হয়ে যায়, তখন তাদের ঐক্যশক্তি ভেঙে পড়ে। সময়ের ব্যবধানে উভয়পক্ষ ছোট ছোট সংঘাতেও লিপ্ত হতে থাকে। অন্য আরব কবিলাগুলোও একজোট হয়ে তাদের এই সংঘাতে ইন্ধন দেয়।

বংশপরম্পরা ধরে তাদের মধ্যে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। তাদের প্রথম যুদ্ধ ছিল সাফিনাযুদ্ধ, এরপর হয় ইয়াউমে হাতিব, ইয়াওমুল বাকি, ইয়াওমুদ্দারযুদ্ধ। এসব যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার পেছনে ইহুদিদের কলকাঠি নাড়ার কথা সবারই জানা। তাদের কিছু গোত্র সংঘাতে লিপ্ত উভয় দলের সঙ্গ দিত।

মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন, মদিনার বাসিন্দা আউস-খাযরাজ এবং ইহুদিদের মাঝে সম্পর্ক ব্যক্তিস্বার্থ এবং পরস্পর থেকে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে ছিল। ইহুদিরা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য উভয় গোত্রের লড়াইয়ের মাঝে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। যেমন আউস-খাযরাজের মধ্যকার বিভিন্ন লড়াইয়ে তারা অর্থলগ্নি করেছিল। যার ফলে এই দুটি সম্প্রদায় ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এইসব পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ইহুদিদের অর্থলগ্নির উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে মদিনায় তারা তাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।[১৫৭]

তায়েফ

মক্কা-ইয়াসরিবের পর জাজিরাতুল আরবের তৃতীয় বড় শহর ছিল তায়েফ। মক্কার দক্ষিণে প্রায় ৭৫ মাইল (১২০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। এখানে বনু সাকিফ বসবাস করত। সমুদ্র থেকে সাড়ে পাঁচ

[১৫৭] নবিয়ে রহমত- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২৩১

হাজার ফিট উপরে অবস্থিত নির্মল ও স্বচ্ছ আবহাওয়া, তাজা সব্জি ও ফল-মূলের জন্য বিখ্যাত শহর ছিল তায়েফ। মক্কার বহু সরদার তায়েফে বাগান ক্রয় করে রেখেছিল এবং গ্রীষ্মকাল এখানেই কাটাত। সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের কারণে এই নগরীকেও মক্কার সমপর্যায়ের গণ্য করা হতো।[১৫৮]

আরবদের মাঝে শহরে দুর্গ ও প্রাচীর নির্মাণের রেওয়াজ ছিল। মক্কা এবং ইয়াসরিব যদিও নগরপ্রাচীর ও দুর্গমুক্ত ছিল; কিন্তু তায়েফে দুর্গ ও প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।[১৫৯] অপরদিকে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার দিক থেকেও সকল আরব নগরী থেকে অধিক সুরক্ষিত ও শক্তিশালী ছিল।

---

[১৫৮] মুজামুল বুলদান- ৪/৮, ৯, তায়েফ

[১৫৯] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬০৬

পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

খ্রিষ্ট ষষ্ঠশতাব্দীর মাঝামাঝি। আমোদ-প্রমোদ এবং চাকচিক্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষ পথহারা ও হেদায়েতশূন্য ছিল। কোথাও ঐশী-পথনির্দেশের নাম-নিশানা ছিল না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা ইহুদিধর্ম-সবই নগণ্য কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দীনের বিধান মানার আগ্রহ, খোদাভীতি এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে তারা বেখবর ছিল। যেসব মতাদর্শ পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নাতের প্রতিনিধিত্ব করত, তা আমূল বিকৃত হয়ে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। নবীদের আনীত আসমানি গ্রন্থ ও সহিফাগুলোর আসল আকৃতি সংরক্ষিত নেই।

হিন্দুধর্ম

তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ধর্মমতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সম্ভবত হিন্দুধর্ম। প্রাচ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এই ধর্ম বিস্তৃত ছিল। এটি এমন দুর্বোধ্য ধর্ম, যার মূলতন্ত্র বুঝা এবং বুঝানো দুষ্কর ছিল। হিমালয় থেকে ভারতসাগর উপকূল পর্যন্ত ৩৩ কোটি দেবতার পূজা করা হতো। বানর, সাপ থেকে শুরু ধরে ইঁদুরের পর্যন্ত পূজা করা হতো। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা এমনকি প্রতিটি গলিতে পৃথক পৃথক দেবতা ছিল।

এক হিন্দু ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, ভারতের ঘরবাড়ি থেকেও প্রতিমার সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। এক দেবতাপূজারি অন্য দেবতার উপাসনা করাকে লাঞ্ছনাকর মনে করত। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মই পরিষ্কারভাবে বুঝা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হতো, 'হিন্দু কাকে বলে' তা হলে সে সম্ভবত উত্তর দিত যে, প্রত্যেক মূর্তিপূজকই হিন্দু। অথচ এই উত্তরও অশুদ্ধ মনে হবে, যখন দেখবে হিন্দুপণ্ডিতরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদেরও 'নাস্তিক' নাম দিয়ে হিন্দুধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। শূদ্রকেও তারা হিন্দু বলে; অথচ তাদের মন্দিরে আসার অনুমতি ছিল না।

বিশ্বাসের চরম অধঃপতনের পর হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ-বিভেদ তাদের জন্য আরেক মর্মান্তিক ট্রাজেডি ছিল। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ হলো খোদার সন্তান, তারা গুনাহ করে না। তারা নিষ্পাপ। সবকিছুই তাদের মালিকানাধীন। কারণ, তারা ধর্মপ্রচারক, পুরোহিতশ্রেণি।

দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়, তারা যোদ্ধা ও রাজনীতিক শ্রেণি। তারা ব্রাহ্মণদের জীবিকা অন্বেষণের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। কওমকে জুলুম ও শোষণ করাই তাদের পেশা।

বৈশ্য তাদের তৃতীয় শ্রেণি। এরা কৃষি, বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি। এসব পেশার মাধ্যমে উপর্যুক্ত দুই শ্রেণির জন্য সম্পদ উপার্জন করে তাদের সন্তুষ্ট রাখার দায়িত্ব ছিল এই শ্রেণির লোকেদের উপর।

চতুর্থ শ্রেণি হলো শূদ্র। এরা পশুর চেয়েও অধম ছিল। তারা উঁচু শ্রেণির সাথে বসবে দূরের কথা, তাদের স্পর্শ করতেও পারবে না। তারা জন্মগতভাবেই পাপী, চিরন্তন অপরাধী এবং দেবতার অভিশাপপ্রাপ্ত ছিল। প্রত্যেক শূদ্রকেই জন্ম থেকে উঁচুশ্রেণির লোকেদের সেবক হিসেবে থাকতে হতো। তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার সবই হবে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা মারাত্মক অপরাধ ও ধৃষ্টতা।[১৬০]

শাহ মুঈনুদ্দীন রহ. লেখেন, 'কোনো অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের সাজা হওয়ার বিধান ছিল না। কোনো অচ্ছুত যদি উঁচুশ্রেণির কাউকে স্পর্শ করত, তা হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। নিম্নশ্রেণির লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা আইনগতভাবেই নিষিদ্ধ ছিল। চারিত্রিক অবস্থা লজ্জাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। একজন নারীকে কয়েকজন পুরুষ বিয়ে করতে পারত। মদপানে আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাতাল ব্যক্তির সকল অপরাধ পুণ্য হয়ে যেত...।

মন্দিরের পূজারিরা ছিল লম্পট। কিছু কিছু শ্রেণিতে কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হতো। মৃত স্বামীর গৃহে স্ত্রীকে দাসিবৃত্তি করেই জীবনধারণ করতে হতো। এমন জীবনের চেয়ে বিধবা নারী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেওয়াকে প্রাধান্য দিত।[১৬১]

---

[১৬০] মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪৮-৫৩
[১৬১] তারিখে ইসলাম, শাহ মুঈনুদ্দীন নদবি- ১/২৪ (দারুল ইশাআত সংস্করণ)

বৌদ্ধধর্ম

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো বৌদ্ধ। এর জনক ছিল শাহজাদা সিদ্ধার্থ। তার নামই গৌতম বুদ্ধ বলা হয়। হিন্দুধর্মে শ্রেণিবৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নির্জন ধ্যানমগ্নতা ও গবেষণার পর একটি নতুন নৈতিক ব্যবস্থাপনা পেশ করে, যেখানে সকলেই বরাবর ছিল। তার সাথে সাথে হিন্দুধর্মের কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে সে কোটি কোটি দেব-দেবীকে এমনভাবে অস্বীকার করে যে, এক খোদার অস্তিত্বও অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

বুদ্ধ শ্রেণিবৈষম্যের বেড়ী থেকে মুক্তি দেওয়ার স্লোগান তুলে কোটি কোটি জনতাকে চমকে দেয়। কিন্তু খোদাকে নিয়ে কল্পনা-ধ্যান করার অংশটি যুক্ত না হওয়ায় একটা সময় পর্যন্ত মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। গৌতম বুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্মগুরুরা এ ধর্মের প্রচার-প্রসারে সাধারণ মানুষের চাহিদা একজন মূর্তমান খোদাকে পূজা করার উদ্দেশ্য পূরণ করার লক্ষ্যে গৌতম বুদ্ধকে তারা খোদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নতুন এই মূর্তিপূজার এমনভাবে প্রসার ঘটায় যে, হিন্দুদের মূতিপূজাকেও তা ছাড়িয়ে যায়।

বৌদ্ধমূর্তি মধ্য-এশিয়া থেকে পূর্ব-এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐশী-নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে এরকম একটি স্বতন্ত্র সংস্কারমূলক আন্দোলন ভ্রষ্টতার নতুন জালরূপে আবির্ভূত হয়।[১৬২]

ইরানের ধর্মীয় অধঃপতন

প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শক্তি সাসানি সাম্রাজ্য ইরান, খোরাসান এবং মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইরানের বাদশাহরা ছিল অগ্নিপূজারি। শত শত বছর যাবৎ তারা অগ্নিপূজার আগুন সরবরাহ করত। অগ্নিপূজা ধর্মের প্রবর্তক ছিল জরথ্রুস্ট। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তার আবির্ভাব। সে-ই আলো-অন্ধকার, ভালো-মন্দ এবং খোদার কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে যুদ্ধের ধারণা পেশ করে মানুষকে অগ্নিপূজক বানায়। অগ্নিপূজারিরা চন্দ্র-

---

[১৬২] মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮

সূর্যেরও পূজা করত। ইরানের বাদশাহ মানুষদের থেকে নিজের খোদা হওয়ার স্বীকৃতি নিত। খসরু পারভেজ তার নামের সাথে এই উপাধি ব্যবহার করত যে 'খোদার মধ্যে অবিনশ্বর মানব এবং মানবের মধ্যে অদ্বিতীয় খোদা'।[১৬৩]

ঐসব খোদার মধ্যে তারা ভালো ও মন্দের খোদাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। ভালোবিষয়ক খোদাকে তারা 'ইয়াযদা' এবং মন্দবিষয়ক খোদাকে 'আহরামান' বলত। এটা শয়তানেরই বিকৃত রূপ ছিল। তাদের ধারণামতে অনাদিকাল থেকে 'ইয়াযদা' ও 'আহরামান'-এর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছে। এ কারণেই জগৎময় ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের বিভিন্ন রূপ সামনে আসছে। এটাই ইরানিদের আকিদার ভিত্তি ছিল। আর এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল আজব আজব আকিদা, যেগুলো বিভিন্ন সময় নানা রঙ ধারণ করত।

অগ্নিপূজাধর্ম বিশেষ কিছু ইবাদতসর্বস্ব ছিল। নির্ধারিত সময়ে এগুলো আদায় করতে হতো। অগ্নিমণ্ডপ থেকে বের হলেই তারা ধর্মীয় বিধান এবং চারিত্রিক রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেত। সুদ, ঘুষ এবং জিনার মতো অপরাধ, যেগুলো অধিকাংশ সমাজেই খারাপ মনে করা হয়, তাদের সমাজে একেবারে বৈধ ছিল। এমনকি নিকটাত্মীয়দের সাথেও যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ ছিল।

এই ধর্ম যেহেতু চারিত্রিক শিক্ষা-দীক্ষাশূন্য ছিল, তাই এক হাজার বছর পর খ্রিষ্ট তৃতীয়শতকে 'মানি' অগ্নিপূজাধর্ম সংস্কারের দায়িত্ব কাঁধে নেন। দুনিয়া থেকে সকল অনিষ্ট ও মন্দাচার দূর করার লক্ষ্যে মানুষের দুনিয়া ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করা, বিয়েশাদি এবং সন্তানসন্ততির কোলাহল থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে উৎসাহ দিতে থাকেন। মূলত এটা ছিল সম্পূর্ণ মানবস্বভাবের পরিপন্থি।

পঞ্চম শতকে যখন সাসানি বংশের রাজত্বের দ্বিপ্রহর, তখন মাযদাক (জন্ম ৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) নতুন সংস্কারপ্রস্তাব পেশ করেন। মানুষকে তিনি সবরকম বিলাসিতার অনুমতি দেন। শুধু পানাহার আর ধন-সম্পত্তিতেই নয়; বরং নারীদের সাথে যৌনসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সকল

---

[১৬৩] নবিয়ে রহমত- পৃষ্ঠা ৪৭

পুরুষের সমঅধিকার ছিল। ফলে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে তাদের ভোগ-লিপ্সা ও কাম-লালসার অসহায় শিকার। দিনে-দুপুরে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে মানুষের 'মান ও সামান' তারা ভোগদখলে নিয়ে নিত। গৃহস্বামীর কিছুই করার থাকত না।

মোটকথা, যেই ইরানি সাম্রাজ্য বেলুচিস্তান থেকে সমরকন্দ-বুখারা এবং খুরাসান থেকে এশিয়া মাইনরের শেষসীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা কিছুই ছিল না; অথচ এই দুটো যেকোনো সফল ও নিরাপদ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক বিষয়। এর বিপরীতে তাদের সমাজে নিরাপত্তাহীনতা, কঠোরতা, জুলুম-অত্যাচার এবং দখলবাজির রমরমা অবস্থা বিরাজমান ছিল। জনসাধারণ চরম অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যে ভুগছিল; অথচ তৎকালীন শাসকরা বাগ-বাগিচা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

ইরানি সাম্রাজ্যের অধীন প্রায় দু-ডজন এলাকার আয়ের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হতো রাজা ও রাজন্যবর্গের ভোগবিলাসে। কিসরার শাহি বাবুর্চির সংখ্যা ছিল এক হাজার। নর্তকী, সংগীতশিল্পী, বাদক, চিতা ও শিকারি কুকুর এবং এগুলো রক্ষণাবেক্ষণকারীর সংখ্যা তারচেয়ে অধিক। গ্রীষ্মকে বসন্তে রূপান্তর করার জন্য কিসরা তৎকালীন প্রসিদ্ধ বসন্ত-গালিচা প্রস্তুত করত, যার প্রতি বর্গফুটে খরচ পড়ত কয়েক হাজার আশরাফি।[১৬৪]

চীনের আকিদা-বিশ্বাসের অবস্থা

প্রাচ্যের সর্বশেষ সাম্রাজ্য চীন। চীন তার সুবিশাল রাজ্যসীমা, খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধি, অসাধারণ প্রতিভা, পরিচ্ছন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও কনফুসিয়াসের দর্শন থেকে এগোতে পারেনি। তিনি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ৫৫৫ বছর পূর্বে চীনের 'সাঁতুঙ্গে' জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পর তার ৩ হাজারের অধিক শাগরিদ তৈরি হয়। এই প্রাচ্যদার্শনিক কিছু নৈতিক শিক্ষাকে দর্শনের প্রলেপ দিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে তাদের মেধাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ রাখেন। তিনি মানবাত্মা ও মানব-সমাজের সামনে বিশ্বব্যাপী সমস্যা নিরসনে কার্যকর কোনো সমাধান

---

[১৬৪] আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬

পেশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। ফলে বিশ্ব সমাজ-ব্যবস্থা আরো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[১৬৫]

ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয় এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন

প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। পাশ্চাত্যের অবস্থা ছিল তারচেয়ে বহুগুণ খারাপ। পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত শুধুই মূর্খতা, দরিদ্রতা, পঙ্কিলতা আর স্থবিরতা ছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিল্প থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রাজনীতি, সামাজিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রতিটি বিষয়ে ভ্রান্তবিশ্বাসী এবং গোঁয়ারপ্রকৃতির পাদরিদের দখলদারত্ব ছিল। এরা একদিকে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা এবং যেকোনো গভীর চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে মানুষের গবেষণাশক্তি ও যোগ্যতা বিকল করে দিত; অন্যদিকে তারা রোমান সালতানাতকে টুকরো টুকরো করার পাশাপাশি তাদের গির্জাকেও পূর্ব-পশ্চিম দুভাগে বিভক্ত করে ফেলে।

প্রাচ্যের প্রধান গির্জা ছিল কনস্টান্টিনোপল, যাকে অর্থোডক্স চার্চ বলা হতো। তার পুরোহিতদের বলা হতো 'পেট্রিক'। আর পশ্চিমা গির্জাকে বলা হতো ক্যাথলিক চার্চ। তার ধর্মগুরুদের উপাধি ছিল 'পোপ'। কনস্টান্টিনোপল এবং রোমের মধ্যে রাজনৈতিক শত্রুতার সাথে সাথে দুই চার্চের মাঝেও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যেকেই একে অপরের আকিদা-বিশ্বাসে আঘাত করতে থাকে। প্রাচ্যগির্জার বক্তব্য হলো ঈশ্বর যিশুর চেয়ে মর্যাদাবান আর পশ্চিমা গির্জার মত হলো উভয়ই সমান। এমন কয়েকটি বিষয়ে তাদের মধ্যকার মতদ্বন্দ্বের কারণে পরস্পর অভিশাপ ছোঁড়াছুঁড়ি করত এবং অপরপক্ষকে কাফের পর্যন্ত বলত। এই অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাজারো মানুষ নিজের দীন ও ঈমান বাঁচানোর তাগিদে বনজঙ্গলে আশ্রয় নেয়। আর এদেরকেই রাহেব বা সন্ন্যাসী বলা হয়। কিন্তু লিখিত কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় এ দলটিও গোমরাহির শিকার হয়।[১৬৬]

---

[১৬৫] মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪৬

[১৬৬] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা হাদিদ, আয়াত ২৭; আততুহফাতুল মাকদাসিয়্যাহ ফি মুখতাসারি তারিখিন নাসরানিয়্যাহ, আসিম মাকদাসি- পৃষ্ঠা ৯৬-১১১

সন্ন্যাসীরা দৈনন্দিন জীবনযাপনে শরিয়তের কোনো বিধান অনুসরণ করত না। এ ব্যাপারে তাদের কোনো গরজও ছিল না। পাদরি ও রাহেবদের একটা বড় অংশ কঠোরতা এবং সমাজ-বিচ্ছিন্নতা পছন্দ করত। কোনো কারণ ছাড়াই নিজেকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে চাইত। তারা একেবারে সমাজ-বিচ্ছিন্ন ছিল। নারীদের কেনাবেচা করা এবং তার মালিক হওয়ার পদ্ধতি নিয়ে তখনও তাদের মাঝে সংশয় ছিল। এবং নারীরাও যে মানুষ—তখন পর্যন্ত তাদের সে বিশ্বাস জন্ম নেয়নি। তাদের মধ্যে কিছু লোক নারীদেরকে একটি বিপজ্জনক শ্রেণি মনে করত। বিড়ালপ্রজাতির প্রাণির মতো মনে করত। নারীদের মধ্যে কোনো প্রাণ আছে কি না, এ নিয়েও তাদের সন্দেহ ছিল। কিছু লোক তাদেরকে নির্জীব মেশিন ভাবত।

রবার্ট ব্রিফল্‌ট লেখেন, 'সে যুগের পাশবিকতা ও বর্বরতা ছিল আদিযুগের চেয়ে ভয়াবহ, যেন পচনধরা সভ্যতার লাশ পচেই চলেছে।'[১৬৭]

ইউরোপের এই যুগটা ছিল বিক্ষিপ্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলার যুগ। ইটালি, ফ্রান্স থেকে পূর্ব ইউরোপ এবং কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত রাজনৈতিক টানা-হেঁচড়া আর অরাজকতা বৈ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমন কোনো মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকও ছিলেন না, যিনি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। তাদের কারো কাছে ইনজিলের বিশুদ্ধ কোনো কপি ছিল না। বরং তারা দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর হাতে হাতে চলে আসা ইনজিলের যেই কপি হাওয়ারিদের স্মৃতিতে ছিল, তা গ্রহণ করে নেয়। তবে এর মধ্যেও বহু বিকৃতি ঢুকে পড়েছিল। ঈসায়ি ধর্মের প্রকৃত দায়ী হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলে গেছেন,

إن الله ربي وربكم فاعبدوه

> নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার রব এবং তোমাদের রব, অতএব তোমরা তারই ইবাদত কর।[১৬৮]

কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মগুরুর রূপধারী 'পল' খ্রিষ্টধর্মের তাওহিদকে ত্রিত্ববাদ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পুঁজি করে সে

---

[১৬৭] আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪০-৪২

[১৬৮] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৫১

মূলত ক্রুশের দিকে আহ্বান করত। গ্রিক দর্শনশাস্ত্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানরা সহজ-সরল তাওহিদের দাওয়াত পরিত্যাগ করে। রোমান মূর্তিপূজারিদের সহজে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে পিতা-পুত্র এবং পবিত্রাত্মার আজব দর্শন মেনে নেয়। এরা পুরোদস্তুর ত্রিত্ববাদকে ধারণ করেছিল। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইহুদিদের বক্তব্য 'আমরাই তাকে হত্যা করেছি' দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে নিয়েছিল; অথচ আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।[১৬৯]

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে কোথাও কোথাও এমন খ্রিষ্টানও পাওয়া যেত, যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং বর্তমান খ্রিষ্টবাদে অসন্তুষ্ট ছিল। তবে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। তারা বৈরাগ্যের জীবনযাপন করত।

গ্রিকদর্শন

এ সময় জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির এক প্রাচীনকেন্দ্র ছিল গ্রিস। খ্রিষ্ট ষষ্ঠশতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্রের বাজার সরব ছিল। তাই তো আজ পর্যন্ত গ্রিসকে সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো বিখ্যাত দার্শনিকদের জন্মভূমি বলা হয়। তারা ছিলেন যুগের সেরা দার্শনিক। সক্রেটিস হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে যান। আর তার বিশিষ্ট শাগরিদ প্লেটো ঈসা আলাইহিস সালামের সাড়ে তিনশো' বছর পূর্বে গত হয়েছিলেন। তারপর আসেন অ্যারিস্টটল। তিনি গ্রেট আলেকজান্ডারের শিক্ষক এবং উপদেষ্টা ছিলেন।

গ্রিক রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় দার্শনিকদের বাজার খুব সচল হয়। আলেকজান্ডার প্রাচ্যকে দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য মিসরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন এবং সেখানে ফিলিস্তিন অধিবাসীদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এভাবেই প্রাচ্যে দর্শনভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এই দার্শনিকরা প্রতিটি জিনিসকে যুক্তির পাল্লা দিয়ে মাপতে অভ্যস্ত ছিল।

---

[১৬৯] আততুহফাতুল মাকদাসিয়্যাহ ফি মুখতাসারি তারিখিন নাসরানিয়্যাহ, আসিম মাকদাসি- পৃষ্ঠা ৭০-৯৩

তারা ভুল-শুদ্ধ যেকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য মানুষের আকল-বুদ্ধিকেই চূড়ান্ত মনে করত। ঐশীজ্ঞানের কোনো প্রয়োজনই তাদের মধ্যে ছিল না।

এই দার্শনিকরা কেবল চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র এবং রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো না; বরং বিশ্বজগৎ, ভালো-মন্দ এবং সৃষ্টির আদি-অন্ত নিয়েও নিজেদের গবেষণা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এখানেই তারা চরম পদস্খলন ও গোমরাহির শিকার হয়। তারা স্রেফ যুক্তিনির্ভর হওয়ার কারণে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞতার মধ্যে থাকে। আখেরাত, হাশর, পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের কখনো স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়নি। নিজেদের জ্ঞানকেই পরিপূর্ণ এবং নিশ্চিত মনে করার দরুন কখনো নবী-রাসুলদের শিক্ষা-উপদেশ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

এই ধরনের দার্শনিক চিন্তাধারা তার ধারকদেরকে এক সময় আখেরাত এবং আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বানিয়ে দেয়। এমনিভাবে শরিয়ত, অহি, হালাল-হারামের মতো ইসলামি পরিভাষাসমূহও তাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে।

গ্রিকদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটা এলাকায় যখন স্বাধীন সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে, সেখানে সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত থাকাকে 'ইলম' বা বিজ্ঞান নামকরণ করা হয়। উলঙ্গপনা আর অশ্লীলতাকে সভ্যতা-সংস্কৃতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। দার্শনিকদের সেই সভ্যতা গ্রিকের এমন অবস্থা করে ছাড়ে যে, হাট-বাজারে বেহায়া-পতিতাদের অপকর্মের আহ্বান করা এবং নাট্যমঞ্চে নারীদের দিয়ে নগ্ননৃত্য করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। খেলার মাঠে দর্শকদের বিবস্ত্র খেলাধুলা উপভোগ, ব্যভিচার, নাচগান এবং বিলাসিতার জীবন সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমোদ-প্রমোদের রুচি-প্রকৃতি এত নিচু পর্যন্ত গড়ায় যে, আমির-উমারাগণ ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুদের সাথে বন্দিদের লড়াই করার দৃশ্য স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করত। যৌনচাহিদা মেটানোর জন্য তারা নিত্যনতুন ও অভিনব পদ্ধতি অন্বেষণ করত। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এতটাই নীচু হয়ে গেছিল যে, অভিজাত লোকেরা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। সাধারণ চরিত্রহীন লম্পটদের কথা আর কী বলব—তাদেরকে বাজারে নারীদের জুতা চাটতে দেখা যেত।

আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করছি, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যে গ্রিককে রোমের তোতা বলা হতো, সেখানে দার্শনিকদের সোনালি দিনের সমাপ্তি ঘটেছিল। তবে রোমান সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দার্শনিক চিন্তাধারা ঢুকে পড়েছিল। প্রায় প্রতিটি অপকর্মের বীজ এই দর্শনই বুনেছিল।[১৭০]

শুধুই শব্দের ফুলঝুড়ি

সবচেয়ে হতাশাজনক কথা হলো, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই দর্শন-বিপ্লবের দাবি এবং মানবতার পথপ্রদর্শনের শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় এবং মতবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজতে গেলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।

একজন মানুষ কীভাবে আত্মিক ও দৈহিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে, তার জনসমাগম ও নির্জনবাস, কথাবার্তা এবং কর্মপদ্ধতি, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে- দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে দার্শনিক কিংবা দাঈ'র বাস্তব জীবনে এ বিষয়ে কোনোরূপ পথনির্দেশ পাবে না। খুশি-আনন্দে কীভাবে আবেগ প্রকাশ করবে, দুঃখ-বেদনায় কী আচরণ করবে, জয়-পরাজয়ে করণীয় কী? বালা-মুসিবতে বিপর্যস্ত হলে কর্তব্য কী? কীভাবে শুবে, কীভাবে জাগবে? বড় এবং মুরুব্বিদের সঙ্গে কেমন আচরণ হবে? ছোটদের সাথে কীভাবে চলবে? পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন হবে? এই প্রশ্নগুলোর প্রায়োগিক উত্তর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, আমলের মতো এত বড় বড় সব নেয়ামত পূর্ববর্তী নবীগণের অন্তর্ধানের সঙ্গে তাও বিলীন হয়ে গেছে।

গোমরাহিতে জর্জরিত ইহুদিজাতি

ঐ যুগের ইতিহাসে যদি হালকা দৃষ্টিপাতও করা হয়, তা হলে উম্মাহ ও সমাজের গোমরাহির এই নাজুক পরিস্থিতির সংশোধন ও সংস্কারের জন্য একজন মুসলিহ ও মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হওয়ার আশা করা যেত অন্যান্য গোত্রের তুলনায় ইহুদিদের থেকে অধিক। কারণ, হাজারো বছর যাবৎ বনি ইসরাইলে নবী-আগমনের ধারা অব্যাহত ছিল। উপরন্তু তাদের

---

১৭০ আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৪০-৪২; কাযায়াল মারআ ফিল মুতামারাতিদ দাওলিয়্যাহ; ডক্টর ফুআদ বিন আবদুল কারিম, পৃষ্ঠা ২৪৪

কাছে ছিল ঐশী-হেদায়েতগ্রন্থ তাওরাত শরিফ। এই গ্রন্থ বিকৃতির পরেও শেষনবীর নিদর্শনাবলি অবশিষ্ট ছিল। ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল- তাদের মধ্যে যেহেতু শত শত বছর যাবৎ বড় বড় নবীর আগমন ঘটে এসেছে, তাই শেষনবীও তাদের মধ্য থেকে হবেন। ইহুদিরা স্বাভাবিক জীবনযাপনেও সংযমী ছিল। তাদের পূর্বসূরিদের রীতি-নীতি সংরক্ষণ করত। তাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দেখেও আশা করা যেত যে, তাদের মধ্য থেকেই কোনো সংস্কারক ও নেতার আবির্ভাব ঘটবে।

উপর্যুক্ত সবই ছিল বাহ্যিক হিসাব-নিকাশ। বাস্তবতা হলো, এই কওম শত শত বছর যাবৎ আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকে; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তাদের থেকে কোনো কল্যাণের আশা করাও ছিল নিরর্থক। ইহুদিদের সকল অনিষ্টের মূল ছিল তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহংকার। বিগত সময়ে তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহম ও করমের (দয়া-মায়া, অনুগ্রহ) কারণে তারা ধারণা করত যে তারাই আল্লাহর প্রিয় ও নির্বাচিত বান্দা। এই ধারণাই তাদেরকে একগুঁয়েমি ও স্বেচ্ছাচারিতায় ফেলে দেয়। এই ব্যাধি যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এক সময় তারা শরিয়তের বিধানও নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রসার করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। তাওরাতে আমূল পরিবর্তন করে ফেলে। তারপরও যেসব আয়াত বিকৃতি থেকে বাদ পড়ে যায়, সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যেন তাদের প্রবৃত্তির পরিপন্থি না হয়।

ইহুদিদের এই নতুন তাফসির ও ব্যাখ্যা তাদের সেই ধারণারই প্রতিফলন ছিল যে, তারা সৃষ্টির সেরা, বাকি মানুষ তাদের গোলাম। তারা উক্ত মনগড়া তাফসির বংশপরম্পরায় চলে আসা উপদেশ বলে প্রচার করত এবং শত শত বছর যাবৎ সেই অনুযায়ী আমল চলছে বলে প্রসার করত। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করা এবং তার শরিয়ত না মানার কারণও ছিল ইহুদিদের কথিত বংশপরম্পরায় চলে আসা সেই উপদেশ ও শিক্ষার পরিপন্থি হওয়া; আর ইহুদিরা কোনোক্রমেই তাদের এইসব মনগড়া রেওয়ায়েত ছাড়তে রাজি ছিল না।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার দেড়শ’ বছর পর ইহুদি আলেমরা তাওরাতের সেসব মনগড়া গোপন তাফসির

প্রথমবারের মতো লিখিতরূপে সামনে আনার প্রয়াস চালায়। তাদের এই নতুন কর্মটির নাম দেয় 'মিশনা'। পাশাপাশি ইহুদি আলেমরা সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় যে, তাওরাতের পরিবর্তে এখন থেকে 'মিশনা' অনুযায়ী আমল করা হবে। তাওরাত অনুযায়ী আমলকারীরা খোদার ক্রোধ ও শাস্তির শিকার হবে। (পরবর্তীতে 'মিশনা'র সঙ্গে সংযোজনের পর তার নাম দেওয়া হয় 'তালমুদ'। বর্তমান ইহুদিরা এই গ্রন্থের উপরই আমল করে থাকে।)

প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে শরিয়তে বিকৃতি সাধন এবং এমন নতুন নতুন ব্যাখ্যা করার ফলে ইহুদিরা হকের পথ থেকে এত দূরে চলে যায় যে, তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত কেউ-ই তাদের থেকে কোনো কল্যাণের আশা করে না। ইহুদি আলেমরা দীন বেচা, অধিকার হরণ করা, পার্থিব জিনিসের প্রতি লিপ্সার ক্ষেত্রে উপমা হয়ে গিয়েছিল। তাদের নেতাগোছের লোকদের মধ্যে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা এবং কার্পণ্য সীমাতিক্রম করেছিল। তাদের মধ্যে এমন দাঈ ও পথপ্রদর্শক ছিল, যারা শয়তানি শক্তিও ব্যবহার করত। জাদুটোনা করত। নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে এসব শাস্ত্র ব্যবহার করত। আল্লাহর জিকিরের পরিবর্তে জাদুটোনা, বিভিন্ন শয়তানি কর্মকাণ্ডে তারা লিপ্ত থাকত। এগুলোকেই আত্মপ্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত। ইহুদিদের বড় বড় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের সেই হেদায়েত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলত।

ইহুদিদের এরচেয়েও জঘন্য কাজ ছিল; শত শত বছর ধরে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং অনুভূতিহীনতার কারণে তারা পুরো পৃথিবীবাসীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং হিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। তারা সব মানুষকে তাদের গোলামে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিছু কিছু এলাকায় তাদের এই মিশন শুরু করেও দিয়েছিল। তাদের এই প্রচেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে চাতুর্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশ্রয় নেয়। তারা নিজেদের মধ্যে গুপ্তচর তৈরি করে। চক্রান্ত করে সরকারের গদি উলটে দিতে থাকে। এক সরকারকে অন্য সরকারের বিরুদ্ধে এবং এক কওমকে অন্য কওমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার ক্ষেত্রে ইহুদিরা বেশ পারঙ্গমতা অর্জন করে। তাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবৃত্তিপ্রেমী এবং

নির্দয় হওয়ার কারণে পৃথিবীতে তারা কোনো ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবে বলে আশা করা নিরর্থক ছাড়া কিছুই নয়।[১৭১]

আরবদের ধর্মীয় অবস্থা

খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শত বছর পর্যন্ত আরবরা মূর্তিপূজার অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল। দীনে ইবরাহিমির উপর তারা অবিচল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জাজিরাতুল আরবের সাথে সম্পৃক্ত মূর্তিপূজারি কওমগুলোর প্রভাব তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অহির পথনির্দেশ থেকে বঞ্চনা এবং আমর বিন লুহাইয়ের মতো কূটিল চিন্তার অধিকারী নেতার কারণে কেবল কুরাইশ গোত্রেই নয়, জাজিরাতুল আরবের সকল কবিলা দীনে ইবরাহিমি থেকে দূরে সরে যায়। দেখতে দেখতে সমগ্র আরবে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে পড়ে।

পাথরমূর্তির নিকট প্রয়োজন পেশ করা, সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে মান্য করা আরম্ভ হয়। মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় যে, এইসব মূর্তির মধ্যে এমন আত্মা আছে, যা উপকার-অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং সৃষ্টির বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর তাদের ক্ষমতা বিদ্যমান। এভাবেও বলা হতো যে, এই উপাস্যরা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। এরা তার দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সকল চাহিদা প্রদান করেছেন।

মুশরিকরা মনে করত বিশ্বস্রষ্টা তো আল্লাহই। কিন্তু তিনি এখন অবসরে আছেন। তারই প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়া পরিচালনা করছে এই উপাস্যরা। যুদ্ধে জয়-পরাজয়, জন্ম-মৃত্যু, জীবিকা উপার্জন, সুস্থতা-অসুস্থতা এবং আরোগ্য লাভ করা এবং দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়া- সবই তাদের অধীনে হয়ে থাকে।

হারাম শরিফের বরকতের ব্যাপারেও মাত্রাতিরিক্ত আকিদা রাখাও তাদের বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার একটি কারণ। কিছু আরব-কবিলা মক্কা থেকে

---

[১৭১] আলইয়াহুদ ফিল আলামিল কাদিম, ডক্টর মুস্তফা কামালুদ্দীন আবদুল আলিম- পৃষ্ঠা ১১-২০; মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ৩৮-৪০

প্রত্যাবর্তন করার সময় সঙ্গে করে পাথর নিয়ে যেত। এগুলোকে কাবার তাওয়াফ করিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঐ পাথরেরই পূজা শুরু করে দিত।[১৭২]

আরবে অনেক রকমের মূর্তি ছিল। কিছু কিছু মূর্তি বড় জৌলুস ও মর্যাদার পাত্র ছিল। মক্কার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মূর্তি এরকমই ছিল। তন্মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য হালকা-পাতলা কিছু মূর্তিও ছিল। আরবরা এগুলোকে 'আসনাম' বলতো। এটা 'সানাম' শব্দের বহুবচন। বলা হয়ে থাকে যে, এটা মূলত আরামীয় ভাষার 'সলম' (Solm) শব্দ থেকে নির্গত। আরবিভাষায় এসে তা 'সানাম' শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মূর্তিপূজারিদের গণক বা 'কাহেন' বলা হতো এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করা হতো। কুরাইশসহ সকল আরব-কবিলা 'কাহেন' তথা গণকদের অনুসরণ করত। এই মূর্তিপূজারি গণকেরা মন্দিরের খেদমতের বাইরে কখনো রণাঙ্গনে যেত না। এখান থেকেই তারা বাহিনীর জয়-পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের কথাই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হতো। সেই গণকদের মধ্যে কবিলা কাল্‌বের যুহাইর বিন হুবাব এবং কবিলা বনু আবাসের যুহাইর বিন জাজিমা প্রসিদ্ধ ছিল।[১৭৩]

আরবের প্রথম মূর্তি হলো 'মানাত'। এর দ্বারাই তারা পূজা আরম্ভ করে। এই মূর্তিকে তারা ভাগ্যবিধাতা বলে বিশ্বাস করত। এই মূর্তিটাই বনু খুজাআর সরদার আমর বিন লুহাই শাম থেকে নিয়ে এসেছিল। কুরাইশ ছাড়া বনু হুজাইল এবং ইয়াসরিবে বসবাসকারী আউস-খাযরাজও এই মূর্তির বিশেষ পূজারি ছিল।[১৭৪]

কুরাইশের সবচেয়ে বড় মূর্তি হুবাল। আমর বিন লুহাই কাবা শরিফে একে স্থাপন করে। এটা লাল আকিক পাথর খোদাই করে মানবাকৃতি দিয়ে তৈরি মূর্তি। একশ' উট তার জন্য বলী দিত। কাবা শরিফ তাওয়াফের পর লোকজন তার কাছে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করত। এই মূর্তির জন্য উৎসর্গিত উপহারের পৃথক খাজানা ও দায়িত্বশীল নির্ধারিত ছিল।[১৭৫]

---

[১৭২] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৭৭
[১৭৩] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১২৮, ১২৯
[১৭৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩
[১৭৫] আখবারু মক্কা, আবুল ওয়ালিদ আজরাকি- ১/১১৭- ১১৯ (দারুল আন্দালুস সংস্করণ)

আরেকটি প্রসিদ্ধ মূর্তি হলো 'লাত'। এটা ছিল তায়েফের মন্দিরে। সাদা রঙের চৌকোনো মূর্তি ছিল এটা। আরবরা তার নামে কসম করত।[১৭৬] তায়েফ ও তার আশপাশে বসবাসকারী বনু সাকিফের একজন দানবীরের নামে এই মূর্তির নামকরণ করা হয়, যিনি ঘি দিয়ে ছাতু ভিজিয়ে হাজিদের মাঝে পরিবেশন করতেন। তার মৃত্যুর পর আমর বিন লুহাইয়ের প্ররোচনায় তায়েফবাসী এই মূর্তি নির্মাণ করে।[১৭৭]

আরবরা বৃক্ষেরও পূজা করত। যেমন : বনু গাতফানের একটি বাবলা গাছের নামে 'উজ্জা' নামক প্রসিদ্ধ নারীমূর্তিটি নির্মাণ করে। এটা ভূত-প্রেতের মর্যাদা রাখত। কুরাইশের লোকেরা 'আবদুল উজ্জা' (তথা উজ্জার গোলাম) নামটি অনেক গর্ব করে রাখত। উজ্জার জন্য পৃথক বলির স্থান ছিল। সেখানে পশু কুরবানি দেওয়া হতো।[১৭৮] 'যাতু আনওয়াত'ও কুরাইশের একটি মশহুর পবিত্র বৃক্ষ ছিল। তার পূজার জন্য লোকজন সেখানে একদিন অবস্থান করত।[১৭৯]

যুদ্ধের ময়দানে হুবাল, লাত, উজ্জার নামে স্লোগান দিয়ে যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা হতো। পৃথিবীতে তখন মূর্তিপূজার এত আধিক্য দেখা দিয়েছিল যে, কাবা-চত্বরেই তিনশো' ষাটটি মূর্তি ছিল। তন্মধ্যে ইসাফ ও নায়েলা নামে দুটি বড় ও প্রসিদ্ধ মূর্তিও ছিল। লোকজন ইসাফ থেকে তাওয়াফ শুরু করে নায়েলার কাছে গিয়ে শেষ করত। প্রথম মূর্তিটি ছিল পুরুষ, দ্বিতীয়টা নারী। এ ছাড়া দুমাতুল জানদালে 'ওয়াদ্দ' নামক একটি মূর্তির পূজা হতো। এটার তত্ত্বাবধানও কুরাইশরা করত। 'সুওয়া' বনু হুজাইলের মূর্তির নাম। আহলে জুরাশ 'ইয়াগুস' নামে সিংহ আকৃতির একটা মূর্তির পূজা করত। আহলে খাইওয়ান 'ইয়াউক' নামে এক মূর্তির পূজা করত। এটা ঘোড়া-আকৃতির ছিল। ইয়েমেনের হিময়ার গোত্র 'নাস্‌র' নামের একটি মূর্তির পূজা করত। এটা গাধা-আকৃতির ছিল।

এই পাঁচটি মূর্তি (ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাস্‌র) মূলত হজরত নুহ আলাইহিস সালামের কওমের মূর্তি ছিল। হাজারো বছর পূর্বে

---

[১৭৬] আলআসনাম, ইবনে কালবি- পৃষ্ঠা ৫
[১৭৭] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৫৫
[১৭৮] আখবারু মক্কা, আবুল ওয়ালিদ আজরাকি- ১/১২৬
[১৭৯] প্রাগুক্ত- ১/১২৯, ১৩০

(ইরাকের) ব্যবিলন শহরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই মূর্তিপূজারিরা হুবহু সেই নামেই নতুন আকৃতিতে মূর্তি নির্মাণ করে নেয়। এ থেকে বুঝা যায়, তৎকালীন আরবরা কিছু প্রাণীকে এত পবিত্র মনে করত যে, তার ভাস্কর্য তৈরি করে পূজা করত।[১৮০]

ইতিহাসবিদ ইবনে কালবি বলেন, 'মক্কার প্রতিটি ঘরে মূর্তি ছিল। তারা এর পূজা করত। সফরে যাওয়ার সময় মূর্তির গা ছুঁয়ে বের হতো এবং ফেরার পরেও প্রথমে মূর্তি স্পর্শ করত।[১৮১]

কিছু মানুষ মূর্তিপূজার স্থলে নক্ষত্রকে পবিত্র মনে করত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং প্রার্থনা ও চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রস্থল বলে বিশ্বাস করত। তাদেরকে 'সাইবিন' বলা হতো। আর মক্কাবাসীরা মূর্তিপূজা অস্বীকারকারীদের বলত 'সাবি'।[১৮২]

আরবদের নৈতিক অবস্থা

আরবদের নগণ্য কিছু সৃষ্টিগত স্বভাব ছাড়া সার্বিকভাবেই তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছিল। কথায় কথায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, একে অপরের উপর তরবারি ছুঁড়ে মারা- এসব তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের জের ধরে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যেত। তারপর তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকত।

মদপান এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, প্রতিটি ঘরেই নির্দিষ্ট মদ্যশালা থাকত। জুয়া খেলায় তারা এত মত্ত ছিল যে, নিজের সবকিছু উজাড় করে বাজি ধরত। আর এটাকে তারা গর্বের বিষয় মনে করত। চুরি-ডাকাতি খুব বেশি হতো। কিছু কিছু কবিলার পেশাই ছিল লুটপাট করা।

বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা এমন সস্তা হয়ে গিয়েছিল যে, লোকেরা জনসম্মুখে নারীদের দেখে চোখ টিপ দিত। ভরা মজলিসে প্রেমাস্পদের আলোচনা করে কবিতা আবৃত্তি করত। তাদের কাছে বিয়ের গুরুত্ব ছিল; কিন্তু ব্যভিচার কোনো মন্দ বিষয় ছিল না। পেশাদার পতিতারা

---

[১৮০] আততারিখুল ইসলামি আলআম- পৃষ্ঠা ১৪৩, ১৪৪

[১৮১] আলআসনাম, ইবনে কালবি- পৃষ্ঠা ৩৩

[১৮২] তারিখুল ফিকরিদ দীনি আলজাহিলি, ইবরাহিম আলফাইয়ুমি- পৃষ্ঠা ২৭৯

জনবসতিতে অবস্থান করত। তাদের ঘরে নির্দিষ্ট ঝান্ডা উড়তো, দূর থেকে দেখেই তা চেনা যেত।

তৎকালীন সমাজে নারীদের কোনো মূল্য ছিল না। একেকজন পুরুষ ভেড়া-বকরির মতো যতজন ইচ্ছা নারীকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। স্ত্রীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে অন্যদের মালিকানায় চলে যেত। লোকজন ছেলে জন্ম নিলে খুশি হতো। মেয়ে জন্ম নিলে মানুষদের থেকে মুখ লুকিয়ে ফেলত। বহু লোক মেয়ে জন্মের পর গোত্রের তিরস্কারের আশঙ্কায় তাকে জীবিত পুঁতে ফেলত।

আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও সামগ্রিক চিত্র বর্ণনা করেছেন নাজাশির দরবারে হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি বলেন, 'আমরা তো এক মূর্খ জাতি ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম। সবধরনের অশ্লীল ও গুনাহের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতাম। আমাদের মধ্যে সক্ষম ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা অক্ষম ও দুর্বলদের লুটপাট ও অত্যাচার করত।[১৮৩]

আবদুল মুত্তালিব

কুরাইশ সরদার হাশিম শাম থেকে বাণিজ্যসফর শেষ করে প্রত্যাবর্তনের সময় ইয়াসরিবে অবস্থান করতেন। একবার বনু নাজ্জারের এক সরদার আমর বিন লাবিদের কাছে অবস্থান করছিলেন। তাদের মাঝে এত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল যে, হাশিমের অনুরোধে আমরের কন্যা সালামাকে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। হাশিম যুবাবয়সেই ইনতেকাল করেন। তার গর্ভবতী স্ত্রী সালামা ইয়াসরিবেই ছিলেন। কিছুদিন পর ছেলে জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় 'শাইবা'। এই এতিম বাচ্চা ছয় বছর পর্যন্ত নানাবাড়িতেই লালিত-পালিত হয়।

মক্কাতে হাশিমের উত্তরাধিকারীদের জানাই ছিল না যে, তার বংশের মধ্যে একটি অমূল্য রত্ন কোথাও আছে। সাত বছর পর হাশিমের ভাই মুত্তালিবকে ইয়াসরিব থেকে আগত এক ব্যক্তি সংবাদ দেয় যে, ইয়াসরিবের কিছু ছেলের সাথে তোমার এক ভাতিজাকেও দেখেছি। এমন মূল্যবান সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকা ঠিক হবে না।'

---

[১৮৩] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৩৬

এই সংবাদ শুনেই মুত্তালিব ইয়াসরিব অভিমুখী হন। হাশিমের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার অনুমতিক্রমে শাইবাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। মক্কায় প্রবেশকালে শাইবা সওয়ারিতে তার সামনে বসে ছিল। লোকেরা দেখে ভাবে যে, মুত্তালিব হয়তো কমবয়সি গোলাম ক্রয় করে এনেছেন। সেদিন থেকে শাইবাকে তারা 'আবদুল মুত্তালিব' (আবদুল মুত্তালিবের গোলাম) বলে ডাকতে থাক। যুবাবয়সে পদার্পণ করার পর এই আবদুল মুত্তালিবই কুরাইশের সবচেয়ে খ্যাতিমান সরদার হন।[১৮৪]

মুত্তালিব জীবনভর আপন ভাতিজার পরিপূর্ণ দেখভাল করার পাশাপাশি হাজিদের খেদমতও করেন। তিনি যখন কোনো এক সফরে ইয়েমেনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মারা যান, তখন ভাতিজা আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আবদুল মুত্তালিব হাজিদের পানাহারের এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেন যে, ইতোপূর্বে কুরাইশের কারো মধ্যেই এর উদাহরণ পাওয়া যায় না।[১৮৫]

আবদুল মুত্তালিব একাধিক বিয়ে করেন। তার অনেক সন্তান হয়। এক বিয়ে করেন নানাবাড়ি বনু নাজ্জারের মেয়ে ফাতিমা বিনতে আমর বিন আয়েজকে। এই বিবির গর্ভেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহর জন্ম হয়।[১৮৬]

এই সময়েই আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন এক ব্যক্তি জমজম কূপ খনন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। জমজম কূপ দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল। বনু জুরহুম মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় জমজম কূপটি মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করে দেয় যে, তার কোনো নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকেনি।

আবদুল মুত্তালিব ঘুম থেকে জেগে ভোরেই ছেলে হারিসকে নিয়ে জমজম কূপের কাছে পৌঁছে যান। উভয়ে মিলে খনন করতে করতে পানির সন্নিকটে পৌঁছেন। এটা দেখে আবদুল মুত্তালিব যারপরনাই আনন্দিত হন। এভাবেই শতাব্দীকাল পর জমজম কূপ নতুন করে প্রবাহিত হয়।[১৮৭] যেহেতু জমজম কূপের দ্বিতীয়বার প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে আবদুল

---

[১৮৪] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬১৩, ৬১৪, তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৪০২

[১৮৫] তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৪০২

[১৮৬] লুবাবুল আনসাব, ইবনে ফানদামাহ বাইহাকি- ১/৫

[১৮৭] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৪৩-১৪৬

মুত্তালিবের একক অবদান, তাই এর খেদমতের জন্য তিনি অন্য কোনো খান্দানকে শরিক করতে চাইতেন না। কিন্তু কুরাইশের অন্য সরদারেরা তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তাদের ইচ্ছা ছিল জমজমের তত্ত্বাবধানে বনু হাশিমও অংশীদার থাকুক। তখন আবদুল মুত্তালিব মানত করেন যে, তার যদি দশজন পুত্রসন্তান হয়, তা হলে তাদের থেকে একজনকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেবেন।

আল্লাহর অপার কারিশমা যে, হারিসের পর আবদুল মুত্তালিবের আরো নয়টি ছেলে হয়। তারা হলেন জুবাইর, হাজাল, জিরার, মুকাওয়িম, আবু লাহাব, আবু তালেব, আবদুল্লাহ, আব্বাস এবং হামজা। হামজার জন্মের মধ্যদিয়ে যখন দশ পূর্ণ হয়, তখন তার সেই মানত পূরণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।[১৮৮]

আবদুল্লাহ

কোন ছেলেকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেবেন, তা নির্ধারণ করার জন্য সবার নাম লিখে লটারি দেন। প্রতিবারই ছেলে আবদুল্লাহর নাম উঠে আসে। তার প্রতি আবদুল মুত্তালিবের সীমাহীন ভালোবাসা ছিল; তাই লটারিতে তার নাম ওঠায় ভীষণ কষ্ট পান তিনি। কিন্তু মানত পুরা করতে হবে বিধায় মনে পাথর বেঁধে আবদুল্লাহকে শুইয়ে দেন এবং জবাই করার জন্য ছুরি চালাতে যাবেন এমন সময় এক ছেলে এগিয়ে এসে আবদুল্লাহর পা ধরে টান দেয়।

ওদিকে কুরাইশ সরদারেরা দৌড়ে এসে আবদুল মুত্তালিবকে জোরপূর্বক এ কাজ থেকে বারণ করে বলে, 'তুমি এটা করলে তো মানুষ কুরবানির রীতি চালু হয়ে যাবে।' এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের পরামর্শে দীর্ঘসফর করে খাইবারের এক নারী গণকের নিকট গমন করেন। তাকে ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। ফলে আবদুল্লাহর পরিবর্তে একশ' উট কুরবানি দেন।[১৮৯]

---

[১৮৮] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫১-১৫৩

[১৮৯] প্রাগুক্ত- ১/১৫৪ হজরত হাকিম বিন হিজাম রা. (তিনি হস্তীবর্ষের ১৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।) এর বক্তব্য অনুযায়ী এই ঘটনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। (আল-মুসতাদরাক, হাকিম- ৬০৪৩)

কিছুদিন পর আবদুল্লাহ বনু জুহরার এক কন্যা আমিনা বিনতে ওয়াহাবকে বিয়ে করেন। তিনি কুরাইশের অন্যান্য সকল নারী থেকে অধিক সম্ভ্রান্ত ও উঁচুবংশীয় ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এই আবদুল্লাহ ও আমিনার ললাটেই দয়ার নবী দু-জাহানের বাদশাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা হওয়ার পরম সৌভাগ্য লিখে দেন।[১৯০]

আবদুল্লাহ পঁচিশ বছর বয়সেই কুরাইশের এক বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে শাম সফর করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় পিতার নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াসরিব গমন করেন সেখান থেকে খেজুর নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সফরের অযোগ্য হয়ে যান। আবদুল মুত্তালিব তা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলে হারিসকে ইয়াসরিব পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হারিস গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বে এক মাস অসুস্থ থেকে অফাত বরণ করেন আবদুল্লাহ। তাকে নাবিগায়ে জু'দির কাছে দাফন করা হয়।[১৯১]

আবদুল মুত্তালিব প্রিয় যুবক ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে ভীষণ ব্যথিত হন। তার জানা ছিল না আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন দৌহিত্র দান করবেন, যে তার নাম কেয়ামত পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন।

---

[১৯০] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫৬
আমিনা বিনতে ওয়াহাব পিতার দিক থেকে কুরাইশের শাখাগোত্র বনু জাহরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তার মা বাররাহ বিনতে আবদুল উযযার দিক থেকে বনু আবদুদ দার বিন কুসাইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বাররাহই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রদ্ধেয়া নানি ছিলেন। [নাসাবু কুরাইশ, জুবাইরি, পৃষ্ঠা ২০, ২১]
তাই এই ধারণা ভুল যে, ইয়াসরিবের বনু নাজ্জার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানাবংশ ছিল। বরং নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নানাবংশ মক্কাতেই ছিল। বনু নাজ্জার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার নানাবংশ ছিল।

[১৯১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৮২ (দারু হিজর সংস্করণ), আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬১২, ৬১৩
(আমি কিছু মারফতে শুনতে পেরেছি, কয়েক বছর পূর্বে মসজিদে নববির সম্প্রসারণের সময় আবদুল্লাহর কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় কবরের স্থান গোপন রাখা হয়। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। - লেখক)

জাজিরাতুল আরবের উপর ঐশী-তত্ত্বাবধান কেন?

সমগ্র পৃথিবী যখন ঘোর অমানিশা এবং কয়েক স্তরের গোমরাহির পর্দায় আবৃত হয়ে পড়েছিল, সে সময়ই শেষনবীর আগমন হয়। তার আগমন সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের প্রকৃত অনুসারীদের মুখে মুখে এবং বিভিন্ন গোত্র ও চিঠিপত্রে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। তবে এমন মুক্তি-মানবের আবির্ভাব শুষ্ক মরুভূমির দেশ আরবে হবে; কারোই তা আশা ছিল না। স্বয়ং আরবদের দিলেও এমন অভ্যুত্থানের চিন্তা কখনো আসেনি। তাদের এত নিকৃষ্ট দোষ, মন্দাচার থাকার পরেও আল্লাহ তায়ালা শেষনবীকে তাদের মাঝেই প্রেরণ করলেন এবং নবীর সাহায্য-সহায়তার জন্য তাদেরকেই নির্বাচন করলেন। এতে অনেক হেকমত ও প্রজ্ঞা রয়েছে।

সবচেয়ে বড় হেকমত হচ্ছে- আরবদের চরম গোমরাহি এবং বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আভিজাত্য এবং মর্যাদাপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য তখনও অবশিষ্ট ছিল। হিন্দু এবং ইহুদিদের মতো তাদের মাঝে ধোঁকা, প্রতারণা এবং মিথ্যার অভ্যাস ছিল না। নিরক্ষরতা ও মূর্খতা সত্ত্বেও তারা নিখাঁদ সত্যবাদী ছিল। পাশাপাশি তারা ছিল বুদ্ধিমান ও সতর্ক। নিজে প্রতারিত হলেও অন্যকে ধোঁকা দিতে পছন্দ করত না। আরবরা বড় বড় নগরী এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ক্ষমতার প্রভাবে সৃষ্ট কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও অলসতা থেকে মুক্ত ছিল। তাদের শিরায় তাজা রক্ত প্রবাহিত হতো। আর তারা স্বভাবতই যেকোনো বিপদ মোকাবেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

ইহুদিরা শত শত বছর গোলামি করার দরুন নিকৃষ্ট স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল। চোরের মতো তারা লুকিয়ে লুকিয়ে চক্রান্ত আঁটত। ওদিকে রোমান ও পারস্য দীর্ঘসময় ধরে রাজত্ব করার কারণে তাদের মধ্যে আত্মগরিমা ও অহংকার চলে এসেছিল। আরবরা না কারো গোলাম ছিল, না কোনো শাসক ছিল। তারা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিধিতে স্বাধীন ছিল। তারা কারো উপর না হামলা করত, না কারো কাছে বিক্রি হতো।

পৃথিবীর প্রাচীন সকল সভ্যতার বাসিন্দারা শিল্পকর্ম, জ্ঞানবিজ্ঞানে এমনভাবে আত্মতৃপ্তির সাথে মশগুল হয়ে যায় যে, কেউ-ই আচরণ-উচ্চারণে নিজের মূর্খতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কথা স্বীকার করতে রাজি

ছিল না। তার বিপরীতে আরবরা ছিল সরলপ্রকৃতির এবং সত্যান্বেষী। তাদের তনুমন কোনো বিভ্রান্তিকর দর্শনের চক্করে পড়ে বিকল হয়ে যায়নি। তাদেরকে কেবল এটুকু অনুভূতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, তাদের বর্তমান পথটি সঠিক নয়। ব্যস, তাদের মতাদর্শ পরিবর্তন করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হতো না।

ভৌগোলিক দিক থেকেও বিশ্বব্যাপী দীন এবং পৃথিবী-বিস্তৃত উম্মাহর প্রধানকেন্দ্র হিসেবে আরবভূমি নির্বাচনই ছিল সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, পৃথিবীর আবাসনের দিক থেকেও আরব একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত, বিষুবরেখার তিনটি বড় অংশের মিলনস্থল: এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকটবর্তী অঞ্চল। পূর্ব-পশ্চিমের অধিকাংশ দেশ সমান দূরত্বে অবস্থিত। তাই এখান থেকে যেকোনো নির্দেশ জারি হলে, কোনো দাওয়াতের সূচনা হলে পুরো পৃথিবীতে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু আরবের স্থানে যদি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হিন্দুস্থান কিংবা গ্রিকদেরকে নতুন দীনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, পূর্ব কিংবা পশ্চিম যেকোনো এক দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

এক নতুন ধর্মের জন্য আরবকে নির্বাচন করা প্রতিরক্ষার দিক থেকেও অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। কারণ, আরব তিনদিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত, উত্তরদিকে রয়েছে ধু-ধু মরুভূমি। এজন্য এসব এলাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ করে সফল হওয়া দুষ্কর। আর এ কারণেই হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও আরবদেরকে কারো গোলামি করতে হয়নি। গ্রিক গ্রেট সিকান্দার, ব্যবিলনের বুখতু নাসার এবং ইরানের কুরিশের মতো দিগ্বিজয়ী বাদশাহরা আরবদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেও তাদের বালুময় রাষ্ট্রে ভুলেও প্রবেশ করতে পারেনি।

সর্বশেষ রাসুলের জন্য এমন সরলমনা, দরিদ্র এবং কঠোর পরিশ্রমী আরবদেরকে নির্বাচন করার নেপথ্য হেকমত হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে তার কুদরতের কারিশমা প্রদর্শন করতে চান। শেষনবী যদি রোম-পারস্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, তা হলে প্রথমেই পৃথিবী দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে এ কথা বলার সুযোগ পেয়ে যেত যে, ঐসব বড় বড় রাজ্যের ধনদৌলত এবং শক্তি-সামর্থ্যের কারণে দীন চমকে উঠেছিল। অন্যথায় এ দীন অভিনব কোনো কিছুই নয়।

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক শেষনবীকে এক দুর্বল ও দরিদ্র সমাজে জন্ম দিয়ে ঐ ধনদৌলতের প্রতাপের দোহাই দেওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। চোখে আঙুল দিয়ে এই বাস্তবতা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। তার দীনের প্রচার-প্রসার এবং তার শেষ-রাসুলকে উভয় জাহানে সমুন্নত করার জন্য ধনদৌলত, বড় বড় ফওজ ও হুকুমতের প্রয়োজন নেই। তিনি চাইলে দুর্বল ও অক্ষমদের দিয়েও কাজ নিতে পারেন। আর তিনি যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা এই জমিনের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

তদ্রূপ শেষনবী যদি গ্রিক, আলেকজান্দ্রিয়া কিংবা কুস্তুনতুনিয়ার মতো প্রাচীন জ্ঞানকেন্দ্রগুলোর কোনো একটিতে প্রেরিত হতেন, তা হলে সন্দেহ হতো যে, এই নবী হয়তো প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র শিখে নতুন এক দীন আবিষ্কার করেছেন। তাদের সেই দর্শনশাস্ত্র নতুন ধাঁচে মানুষের সামনে পেশ করেছেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা শেষনবীকে নিরক্ষর-মূর্খ আরবজাতির মাঝে প্রেরণ করার মাধ্যমে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন যে, এই দীন পূর্ববর্তী জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্যাস কিছু নয়; বরং এটি সত্য নবীর উপর নাজিলকৃত আসমানি দীন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির জন্য এই দীন পছন্দ করেছেন।

* * *

ইতিহাসের শিক্ষা

- পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য কওমগুলো ধ্বংস হয়ে যায়; আর অনুগত বান্দারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সফল।
- পূর্ববর্তী উম্মতের নির্ভরযোগ্য অবস্থা কুরআন করিম ও হাদিস শরিফে পাওয়া যাবে। আর এটা প্রমাণ করে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। তিনি লেখাপড়া না শিখে, পাঠশালায় না পড়ে পূর্ববর্তী উম্মতের ইতিহাস কত পরিষ্কারভাবেই-না বর্ণনা করেছেন।
- কোনো কওম যখন আত্মপ্রবঞ্চনা এবং অহংকারবশত নবীগণের উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়, তখন তারা চরম গোমরাহির শিকার হয়। বনি ইসরাইলের উদাহরণ আমাদের সামনেই বিদ্যমান।
- আমবিয়া ও তাদের কওমের মধ্যকার সমস্যা নিরসনে তারা কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, অনুসন্ধান করলে সেখানেও একজন দাঈয়ের পাথেয় মিলে যাবে।
- কোনো দাঈ যদি তার কওমের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, কওম মূর্খ হয়, মূর্তিপূজারি এবং মুশরিক হয়, দীর্ঘদিন মেহনত করার পরেও কোনো ফল দেখা যায় না; তো তার জন্য হজরত নুহ আলাইহিস সালামের জীবনের মাঝে নির্দেশনা আছে।
- কোনো জাতি যদি শক্তি-সামর্থ্য, পেশা, শিল্প এবং বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনের কারণে আত্মগরিমায় লিপ্ত হয়, আর এর ফলে সত্যপথ গ্রহণে অনাগ্রহ দেখায়, তা হলে তাদের জন্য হজরত হুদ আলাইহিস সালামের কওমের অবস্থা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।
- চাষাবাদ, বাগ-বাগিচার পরিচর্যা এবং নির্মাণশিল্পে যদি কোনো কওম অত্যধিক দক্ষতা, পারদর্শিতা ও সাফল্য অর্জন করে, তা হলে এমন

সমাজের সাথে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি কেমন হবে, তা জানার জন্য হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের জীবনী দেখুন।

- যদি লোকেরা মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসী হয়, তাদেরকে বুঝানোর মতো মানুষও আপনি একা হন, হকের দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে জালেম ও প্রতাপশালী শাসকের অত্যাচারের মুখে পড়ার আশঙ্কা হয়, তা হলে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবনীতে দৃষ্টি বুলান।
- আপনি যদি আহলে হক পরিবারের লোক হন, তা হলে আপনি আপনার পূর্ববর্তী বুজুর্গদের উত্তরাধিকার বুকে ধারণ করুন, আর তাদের বাতলে যাওয়া আল্লাহর রাস্তায় আত্মোৎসর্গ করার জন্য উৎসাহী হোন। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সেই ঈমানি স্পৃহা ও জজবা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- সমাজে যদি ঘুষ, ধোঁকাবাজি, নিরাপত্তাহীনতা, লুটতরাজ, অনিয়ম ছড়িয়ে পড়ে, এমন সমাজে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের ঘটনাবলির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করুন।
- যদি নিজেদের মধ্যেই মিথ্যা এবং আপনজনের বিচ্ছেদের শিকার হন, তা হলে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে দেখুন কত ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি আস্থার প্রমাণ দিয়েছেন।
- যদি আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হয়, বন্ধুপ্রতিম লোকদের শত্রুতার কারণে কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়, তা হলে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করুন। আর আল্লাহ তায়ালা যদি আপনাকে জিরো থেকে হিরো বানিয়ে দিয়ে আপনার শত্রুদের মুখে চুনকালি মেখে দেন; এক্ষেত্রেও হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করুন।
- আপনি যদি এমন সমাজে জন্ম নেন, যেখানে তাওহিদের কালিমা পাঠকারীরা খোদাদাবিদার শাসকদের গোলামে পরিণত হয়েছে; তাদেরকে হেদায়েতের সঠিক পথনির্দেশ হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হজরত হারুন আলাইহিস সালামের দাওয়াতের তরিকা পর্যালোচনা করলে পাওয়া যাবে।

- আল্লাহ তায়ালা যদি জিহাদের সুযোগ দেন, তো হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের জীবনী দেখা উচিত। তিনি তার শাসনব্যবস্থায় ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আল্লাহর দীনের প্রসার করেছিলেন।
- আল্লাহ তায়ালা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে নেতৃত্ব কিংবা ক্ষমতা প্রদান করেন, তা হলে দাউদ আলাইহিস সালামের পরিবারের মতো শোকরগুজার হওয়া উচিত। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মতো রাষ্ট্রক্ষমতাকে আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার এবং বান্দাদের খেদমতে ব্যবহার করা কর্তব্য।
- কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর বংশে জন্ম নেয়; কিন্তু সমাজে মুসলমান থাকা সত্ত্বেও বদ আমল, ভ্রান্ত আকিদার কারণে মানুষ পৃথিবীর গোলামিতে লিপ্ত হয় হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহইয়া, হজরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী ও তাদের ধৈর্য-অবিচলতা উপাখ্যান অধ্যয়ন করুন।
- আল্লাহর দীন কারো মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ যে-কারো মাধ্যমে তার দীনের হেফাজত, প্রচার-প্রসার ও উন্নতির কাজ নেন।
- অহংকার-আত্মগরিমা আল্লাহ তায়ালার একদম অপছন্দ। বনি ইসরাইল বংশীয় গরিমা প্রদর্শন করে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের স্থানে বনু ইসমাইলকে পৃথিবীর নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করেন।
- জুলুম-অত্যাচার এবং অজ্ঞতা-মূর্খতার রাত যতই দীর্ঘ হোক, একদিন প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হবেই, হেদায়েতের প্রদীপ জ্বলবেই।

ইসলামপূর্ব ইতিহাস

শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী

হস্তীবর্ষ থেকে রবিউল আওয়াল ১১ হিজরি পর্যন্ত
৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ জুন পর্যন্ত

کمال علم و عمل کا پیکر، کرم مجسّم، تمام رحمت

جہاں میں ان خوبیوں کا انسان نہ آیا خیر البشر سے پہلے

পরিপূর্ণ ইলম ও আমলের চিত্র হলো

দয়ার আধার সর্বোত্তম মানব তিনি

ইতোপূর্বে তার মতো পরিপূর্ণ গুণাবলিসম্পন্ন মানব

এ ধরায় আসেনি।

মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব

ভালোবাসা একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যাকে কেন্দ্র করে মানুষ গড়ে তোলে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়, যা বিরাজ করে প্রতিটি প্রাণীর সত্তায়। জীবনের প্রতিটি আশ্চর্যজনক বাঁকে এবং দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ভালোবাসার থাকে বিশাল অবদান। প্রতিটি ইতিবাচক পটপরিবর্তনের পেছনেই থাকে ভালোবাসার অনুদান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য– বহুকাল এবং বহুবছর ধরে এই ভালোবাসাই অনুপস্থিত ছিল মানুষের মাঝে। মানবতার সঞ্জীবনে এবং সভ্যতার উদ্দীপনে কেউ একে কাজে লাগায়নি শতবর্ষ ধরে। মমতা-ভালোবাসার যেন মৃত্যু ঘটেছে প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মনে। হ্যাঁ, ভালোবাসা ছিল– তবে তা মমতা ও বেদনার নয়; বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতি লালসার, রূপ-লাবণ্যে বিগলিত হওয়া কামনার।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতির মধ্যে মানবতার সেই হারানো সম্পদ মিলবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষ ছিলেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা বহুগুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার দর্শন লাভকারী বলতে থাকে যে, নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যক্তি হঠাৎ দেখত, সেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতো, প্রভাবিত হয়ে পড়তো, বলতে বাধ্য হতো যে, নবীজির মতো ইতোপূর্বে কাউকে দেখিনি এবং পরেও না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনে সত্য ও নিখাদ ভালোবাসার ঝরনাধারা উপচে পড়ে। উম্মতের প্রতিটি সদস্য তাকে এমনভাবে মহব্বত করতে থাকে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রেমিকের সন্ধান পাওয়া যাবে না। উম্মত তার অনুসরণ-অনুকরণে নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছে।'[১৯২]

---

[১৯২] ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানোঁ কে উরূজ ওয়া যাওয়াল কে আছর, সাইয়ে আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯

দুরূদ ও সালাম

اللهم اجعلْ صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمامِ الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا محمودا يَغْبِطه الأولون والآخِرون.

হে আল্লাহ, আপনার খাস অনুগ্রহ, রহমত ও বরকত নাজিল করুন সাইয়িদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকিন, খাতামুন নাবিয়্যিন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

তিনি আপনার খাস বান্দা এবং রাসুল, পুণ্য এবং কল্যাণের পথের রাহনুমা ও পথপ্রদর্শক, দয়ার নবী।

হে আল্লাহ, তাকে আপনি 'মাকামে মাহমুদ' দান করুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই যার জন্য তাকে ঈর্ষা করবে।[১৯৩]

---

[১৯৩] সুনান ইবনে মাজাহ- ৯০৬

আসন্ন বসন্তের পূর্বাভাস

হজরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আগমনের পর মানবজাতির বয়সকাল কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে হাজারও জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। পৃথিবীতে এমন কোনো অংশ নেই, যেখানে মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়নি। কিন্তু সেই ইতিহাসে বিশাল এক শূন্যতা রয়ে যায়। আর তা হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েত ও হকের নির্দেশনা দেওয়া, যার পর পৃথিবীতে গোমরাহির কোনো আশঙ্কা থাকবে না। প্রয়োজন এমন শিক্ষার, যার পর কোনো অজ্ঞতা-মূর্খতা অস্তিত্বে আসবে না। এমন একটি আদর্শ সভ্যতা প্রয়োজন, যার ফলে সত্যিকার অর্থে তারা মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

হাজারো বছর ধরে দুনিয়াতে নবী-আগমনের ধারাবাহিকতা চালু ছিল। কিন্তু কোনো নবীর শিক্ষাই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল না। প্রত্যেক নবী বা রাসুলের দাওয়াত একটি নির্দিষ্ট জাতি, বংশ বা এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এমন একজন নবীর প্রয়োজন ছিল, যিনি পুরো জগদ্বাসীর উদ্দেশে প্রেরিত হবেন, যিনি একইসময়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দেবেন এবং বিভ্রান্ত মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেবেন।

যখন আল্লাহ তায়ালা তার মহান কুদরত আর হেকমতের অধীনে এই বিশাল দায়িত্ব দিয়ে কাউকে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে দেন, যা অচিরেই ঘটতে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক বিপ্লবের সংবাদ দিচ্ছিল।

আরবভূখণ্ড ছিল সেই চড়াই-উৎরাই পরিস্থিতির ময়দান। তার এক পার্শ্ব রোম এবং অপরপার্শ্ব কিসরা সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিলিত ছিল। কিসরা ছিল প্রাচ্যের মুকুটধারী আর কায়সার এশিয়া ব্যতীত ইউরোপ-আফ্রিকার অনেকগুলো এলাকা দখল করে রেখেছিল। এরকম তিনদিক পরাশক্তি-বেষ্টিত একটি আরবভূখণ্ডে প্রকাশমান পরিবর্তনসমূহ নয়া জমানার বার্তা দিচ্ছিল।

বিপ্লবের ইঙ্গিতবহ প্রথম অস্বাভাবিক চিত্রটি ছিল আবরাহার কাবা শরিফ আক্রমণ এবং শিক্ষাপ্রদ পরাজয়। আবরাহা ঐ বাহিনীর একজন সালার ছিল। তাকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমের কায়সারের নির্দেশে হাবশার গভর্নর নাজাশি পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনের খ্রিষ্টানদের সাহায্যে, যেন সেখানকার ইহুদি শাসক ইউসুফ যু-নাওয়াসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে বাহিনীপ্রধান আরিয়াত ইউসুফ যু-নাওয়াসের প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছে তাকে পদচ্যুত করে নিজেই ক্ষমতা হাতে নেয়।

আরিয়াতের অধীনে আবরাহা দীর্ঘসময় চাকুরি করে। পরবর্তীতে তাদের মাঝে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিলে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আরিয়াতের আঘাতে আবরাহার নাক ও ঠোঁট কেটে যায়। তখন থেকেই আবরাহা 'নাককাটা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আবরাহার চাকর সুযোগবুঝে মনিবের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে আরিয়াতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। আবরাহা ছিল ভীষণ পাজি আর চতুর। সে চাটুকারিতামিশ্রিত বার্তা পাঠিয়ে নাজাশিকে বশ করে নেয়। ফলে সে ইয়েমেনে নাজাশির প্রতিনিধি এবং সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

কিছুকাল পর আবরাহা তার গির্জাপূজারি প্রভুদের খুশি করার জন্য ইয়েমেনের রাজধানী সানআতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ একটি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। কয়েক বছরে তার নির্মাণকাজ শেষ হয়। গির্জা নির্মাণের জন্য সে ইয়েমেনের অধিবাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। হাজার হাজার লোককে দিয়ে সে জোরপূর্বক কাজ করায়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই শ্রমিকদের কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ ছিল। সামান্য বিলম্ব করলেই হাত কেটে ফেলা হতো। নির্মাণ-উপকরণ হিসাবে সে ইয়েমেনের রানি বিলকিসের সুরম্য প্রাসাদ থেকে ইট, সোনা-রুপা, মরমর পাথর এবং মূল্যবান জিনিসপত্র খুলে খুলে নিয়ে আসত। তার এই অমানবিক নির্যাতনের কারণে ইয়েমেনিরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল।

তার ইচ্ছা ছিল আরব-কবিলাগুলো কাবা শরিফ থেকে বিমুখ হয়ে তার নির্মিত গির্জার প্রতি যেন আকৃষ্ট হয়ে যায়। নাজাশিকে পত্রমারফত তার অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করে। সে পত্রে লেখে- 'আরবরা যতক্ষণ না হজের জন্য এই গির্জার অভিমুখী হবে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না।'[১৯৪]

---

[১৯৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১৩৫-১৪১

আরবরা যখন তার এই হীন মনোবাসনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা আবরাহার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। কারণ, কাবার ভালোবাসা তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান ছিল। কাবার পরিবর্তে অন্যকোনো ইবাদতখানার কল্পনাও তাদের অন্তরে ছিল না। তাই ফুকাইম (বিন কিনানা) গোত্রের একজন জজবাতি হাজি এক সুযোগে ঐ গির্জার ভেতরে ঢুকে নাপাক করে দিয়ে চলে আসে। আবরাহা যখন জানতে পারে যে, জনৈক আরব এহেন কাজ করেছে তখন সে কসম করে, কাবাঘর ধ্বংস না করে দম ফেলবে না।

৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবরাহা মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। বাহিনীতে ১৩টি জঙ্গি হাতি ছিল। আবরাহাকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য আরবদের ছিল না। তারপরেও যু-নাফার এবং নুফাইল বিন হাবিব নামক দুই সরদার তাকে বাধা প্রদান করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়। ফলে আবরাহার দম্ভ আরো বৃদ্ধি পায়। বিনাপ্রতিরোধে সে মক্কার নিকটে পৌঁছে যায়। বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি শহরে প্রবেশ করে বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট করে। আবদুল মুত্তালিবের দুইশ উটও এই লুটপাটের শিকার হয়।

আবরাহা দূতমারফত কুরাইশ-নেতাদের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আসিনি। আমার উদ্দেশ্য কেবল কাবা ধ্বংস করা। যদি তোমরা আমার কাজে বাধা না দাও, তবে তোমাদের সাথে আমার যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

আবদুল মুত্তালিব একথা শুনে নির্ভীকতার সাথে উত্তর দেন, 'আমরা তার সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। এটা তো আল্লাহর ঘর। নির্মাণ করেছেন ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। আল্লাহ যদি তার ঘর হেফাজত করতে চান, তা হলে তিনি নিজেই তা হেফাজত করবেন।'

দূত এই আজব উত্তর শুনে আবদুল মুত্তালিবকে আবরাহার কাছে নিয়ে যায়। দোভাষীর মাধ্যমে দুজনের মাঝে আলোচনা শুরু হয়। আবরাহা জিজ্ঞেস করে : তোমার কী চাই?

আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমার দু'শ উট ফেরত চাই। আপনার সৈন্যরা ছিনিয়ে এনেছে।

আবরাহা বিস্মিত হয়ে বলে, আমি তোমাদের কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য এসেছি। এর জন্য তোমাদের কোনো ভাবান্তর নেই! এই সময়ও তোমরা

নিজেদের উটের ফিকির করছো! কাবাঘর তো তোমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের প্রতীক।

আবদুল মুত্তালিব নিশ্চিন্ত মনে বলেন, আমি তো আমার উটগুলোর মালিক। আর ঐ ঘরের মালিক আরেকজন। তিনি তাকে রক্ষা করবেন।

এবার আবরাহা দম্ভ ভরে বলতে থাকে, 'সেও আমার হাত থেকে আজ রক্ষা পাবে না।' এই বলে সে আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো ফেরত দিয়ে দেয়।

আবদুল মুত্তালিব মক্কায় পৌঁছেই সবাইকে শহর খালি করার পরামর্শ দেন। লোকজন শহর ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। আবরাহার পরিণতি দেখার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ওদিকে আবদুল মুত্তালিব কাবার চৌকাঠ ধরে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকেন, 'হে প্রভু, আবরাহা বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিন।'

আবরাহা বাহিনী তখনও মক্কায় প্রবেশ করেনি। আচমকা দেখা গেল সবচেয়ে বড় জঙ্গি হাতিটি রাস্তায় বসে পড়েছে। বহু মারপিট করা সত্ত্বেও দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু যখনই ইয়েমেনের দিকে মুখ করা হলো, অমনি হাতিটা চলতে থাকল। তারপর পুনরায় মক্কার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে আবার মাটিতে বসে পড়ে। বুঝাই যাচ্ছিল যে, কোনো অদৃশ্য শক্তি মক্কায় প্রবেশে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে।

পাহাড়ে আশ্রয়-নেওয়া-নগরবাসী হতবিহ্বল হয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিল। ইত্যবসরে সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসা ছোট ছোট পাখি আসতে দেখা গেল। প্রতিটির পায়ে এবং ঠোঁটে কঙ্কর। পাখিগুলো এসেই আবরাহা বাহিনীর উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। যার উপরই কঙ্কর পতিত হয়, সেই মারা পড়ছে। সৈন্যদের মাঝে তখন সীমাহীন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ভেগে যায়।

আবরাহা ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন লোকেরা তাকে উঠিয়ে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু পথিমধ্যে তার দেহের একেকটি অংশ খসে খসে পড়তে থাকে। রাজধানী সানআতে পৌঁছার আগেই সে মারা যায়। তার দেহ এমনভাবে গলে গিয়েছিল যে, চামড়ার নিচে হৃদয় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।[১৯৫]

---

[১৯৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১৪৩-১৪৮

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত

পাখির মতো একটি সাধারণ মাখলুকের মাধ্যমে বিশাল একটি বাহিনীর ধ্বংস হওয়া বিশ্ববাসীকে একথাই জানিয়ে দেয় যে, বিশ্বজগতের মালিক নিজের ঘর হেফাজত করেছেন।

হাবশি বাহিনীর এই পরিণতি বস্তুত কায়সারের গালে চপেটাঘাত ছিল, যে কায়সার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সবচেয়ে বড় ক্রুশপূজারি। এটা ছিল গির্জার পরাজয়, আরবের বিজয়। এর মাধ্যমে অনুমিত হচ্ছিল যে, অনতিবিলম্বে পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক মহানায়কের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। আর তার কেন্দ্র হবে আরবভূমি। হাতিকে আরবিভাষায় 'ফীল' বলা হয়। এজন্য আবরাহার ঘটনাটি 'আসহাবে ফীলের ঘটনা' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[১৯৬] আরবদের নিকট এই ঘটনা এতই গুরুত্ব পেয়েছিল যে, তারা এই বছরকে 'হস্তীবর্ষ' নামকরণ করে এবং পরবর্তী তারিখগুলোর গণনা তখন থেকে নতুনভাবে শুরু করে।

আবরাহার ধ্বংসের পর সামরিক স্বৈরশাসন বেশিদিন টেকেনি। আবরাহার ছেলে ইয়াকসুম কিছুদিন রাজত্ব করার পর মারা যায়। তারপর দ্বিতীয় ছেলে মাসরুক ক্ষমতায় বসে। কিন্তু সেও আরবদের বুকে দাউদাউ করে জ্বলতে-থাকা-প্রতিশোধের আগুন সামলাতে পারেনি। হিময়ার গোত্রের উঁচুবংশীয় এক ব্যক্তি সাইফ বিন যি-ইয়াযান উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে ফায়দা নেন। সৈন্যদের নিপীড়নের ফরিয়াদ নিয়ে পারস্যের বাদশাহ নওশেরওয়াঁর দরবারে গমন করে তার সাহায্য চান। নওশেরওয়াঁ হাবশিদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

---

[১৯৬] হস্তীবাহিনীর ঘটনা এবং নবীজির জন্মের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান? এক্ষেত্রে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলে ৪০ দিন, কেউ বলে ৫৫ দিন। হাফেজ ইবনে কাসির ৫০ দিনের মতটি অধিক প্রসিদ্ধ বলেছেন। কিছু কিছু মত অনুযায়ী উক্ত ঘটনা নবীজির জন্মের ১০ বছর পূর্বে ঘটেছে। কিন্তু ইবনে কাসির রহ. সাহাবায়ে কেরামের কিছু বর্ণনার আলোকে প্রামাণিকভাবে শেষোক্ত মতটি খণ্ডন করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৯৮]
ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি) হস্তীবাহিনী ঘটনা ১৭ মহররম রবিবার বলেছেন। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১০] এই মত গ্রহণ করলে, তার ঠিক ৫৫ দিন পরই ১২ রবিউল আওয়াল হয়।

অবশেষে সাইফ বিন যি-ইয়াযান ইরানের একটি বড় বাহিনী নিয়ে জাজিরাতুল আরব উপস্থিত হয়ে মাসরুককে শক্তিপরীক্ষার আহ্বান জানান। তাদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত লড়াই সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মাসরুক মারা যায়। মাসরুক-বাহিনী পরাজিত হয়। ফলে জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টান হাবশিদের ৭২ বছরের একটি জুতসই মসনদ হাতছাড়া হয়ে যায়। সাইফ বিন যি-ইয়াযান আরবদের একজন গ্রহণযোগ্য শাসকে পরিণত হন। কারণ, তিনি আরবদের মুক্ত করেছেন বিদেশি শাসকদের অধীনতা থেকে।[১৯৭]

---

[১৯৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/১৫৮-১৬০; তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৭৪

নোট-১। হাবশিদের সাথে সাইফের সংঘাত নবীজির জন্মের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমাপ্ত হয়েছিল তার জন্মের দুই বছর পর এবং সমগ্র ইয়েমেন তার দখলে চলে আসে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৯]

নোট- ২। মক্কার উপর আবরাহার যে হামলা হয়েছিল, সম্ভবত তা চান্দ্রবর্ষের পঞ্জিকা অনুযায়ী মহররম মাসে, আর মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেটা ছিল রজব মাস (মার্চ ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

আবরাহার আক্রোশ এজন্য ছিল যে, তার ঘোষণার পরেও কেন তার চার্চে কেউ হজের জন্য না গিয়ে বাইতুল্লাহয় গমন করল। জাহেলিযুগে হজ হতো মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চান্দ্রবর্ষের পঞ্জিকা মোতাবেক নয়। আবরাহার আক্রমণের বছরও মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তার আক্রমণের পূর্বেই হজ সম্পন্ন হয়।

এটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয় যে, আবরাহা হজের পরপরই হামলা করেছিল। কেননা, হজের পর আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল। যে ঘটনার কারণে তার সেই ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। ঘটনাটি ছিল- ফুকাইম (বিন কিনানা) গোত্রের এক আরব হাজি কাবার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার কারণে, এক সুযোগে আবরাহার সেই গির্জার ভেতরে ঢুকে তা নাপাক করে দিয়ে চলে আসে।' এ ধারণা করা নিতান্ত ভুল হবে যে, লোকটি কাবার হজ ছেড়ে দিয়ে ইয়েমেনে চলে গিয়েছে। যদি হজের পর তার ইয়েমেন যাত্রার কথা ধরা হয়, তা হলে তার সেখানে যেতে অবশ্যই মাসখানেক লাগবে। অর্থাৎ মহররমের মাঝামাঝিতে পৌঁছে সে গির্জা নাপাক করে। তা হলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, সেই মহররম মাসেই আবরাহা মক্কায় পৌঁছে যায়। হ্যাঁ, এটুকু ধারণা করা যেতে পারে যে, হজের পর মাসখানেকের ভেতর আক্রমণ হয়; যদিও তা সুদূর সম্ভাবনা।

তবে অধিক যুক্তিযুক্ত কথা হলো ঐ নাপাকি-কাণ্ড ঘটানোর পর আবরাহার প্রস্তুতি নিতে কিছু সময় ব্যয় হয় এবং সৈন্যদের মক্কা পৌঁছতেও দেড়-দু'মাস লাগবে। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের শব্দ থেকেও বুঝা যায় যে, আবরাহা খুব প্রস্তুতির পরই এসেছিল। ইবনে হিশাম লেখেন, 'তখন আবরাহা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং

সৃষ্টির উষাকাল

অবশেষে সেই শুভমুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, যার জন্য প্রতিটি অণু-পরমাণু অপেক্ষমাণ ছিল। হস্তীবাহিনীর ঘটনার চল্লিশদিন পর সোমবার কুরাইশ-সরদার আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম তার ঘরে এক প্রভাতসূর্য উদিত হওয়ার সংবাদ পান। আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি নাতি দিয়েছেন।[১৯৮]

শপথ করে যে, সে অবশ্যই কাবার কাছে গিয়ে তা ধ্বংস করবে। এরপর সে হাবশি বাহিনীকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ করে। বাহিনী প্রস্তুত হলে সে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৫]

এই হিসেবে আবরাহার হামলা ছ'মাস পর পরবর্তী মহররম (মহররম মাদানি পঞ্জিকা মোতাবেক রজবে মক্কি) হওয়াটায় অধিক যুক্তিসংগত।

[১৯৮] **নবীজির জন্মতারিখ নিয়ে আলোচনা**

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন সর্বসম্মতিক্রমে সোমবার ছিল। সহিহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেন, ذاك يوم وُلدتُ فيه 'এদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।' [সহিহ মুসলিম- ২৮০৪, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ইসতিহবাবি সাউমি সালাসাতি আইয়ামিন মিন কুল্লি শাহর]

এর উপরও সকলেই একমত যে, বছরটি হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছর ছিল। হজরত কায়েস বিন মাখরামা থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। [সুনানু তিরমিজি- ৩৬১৯, মুসনাদ আহমাদ- ১৭৮৯১] যদিও এই হাদিসের সনদ যয়িফ। কিন্তু কাবাস বিন আশআম রা. এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে ঐ হাদিসের সমর্থনে বর্ণনা পাওয়া যায়। [আলআহাদ ওয়াল মাছানি: ৯২৭ ইবনে আব্বাস থেকে, মুসনাদ বাযযার: ৪৭৬২]

এ হিসেবে উপর্যুক্ত হাদিস টিকে হাসান ধরে নেওয়া যায়।

অপরদিকে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

وُلد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، واستنبئ يوم الإثنين، وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الإثنين

'অর্থাৎ তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, সোমবারে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের জন্য বের হন। সোমবারে মদিনায় আগমন করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল। তবে বিশুদ্ধ চান্দ্রবর্ষের পঞ্জিকা হিসেবে তা ছিল রমজান মাস। তারিখের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ৮, ৯, ১১ এবং ১২ হলো প্রসিদ্ধ তারিখ।[১৯৯]

ওয়াসাল্লাম সোমবার ইনতেকাল করেন। সোমবারে হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।' -[মুসনাদ আহমাদ- ২৫০৬] এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে যয়িফ। কারণ সনদে ইবনে লাহিয়াআ রয়েছে।

সর্বোপরি উপর্যুক্ত হাদিস গুলো থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, নবীজির জন্ম হস্তীবর্ষের সোমবারে হয়েছে। ইবনে লাহিয়াআর রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হলে তো হিজরত, নবুওয়াত, ওফাতের তারিখও এই তারিখই হয়। অপরদিকে ইমাম যুহরী রহ. মদিনায় আগমনের তারিখও ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার উল্লেখ করেছেন। [তারিখুত তাবারি- ২/৩৯৩] ইমাম তাবারি রহ. এর বক্তব্য হলো, এসব বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। [তারিখুত তাবারি- ২/২৯৩]

১৯৯ নবীজি কোন্ মাস এবং কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, এ বিষয়ে হাদিসের কিতাবসমূহে কোন যয়িফ হাদিস ও বর্ণিত হয়নি। হ্যাঁ, ইতিহাস ও সিরাতগ্রন্থে কিছু যয়িফ বর্ণনা এসেছে। কিছু সনদ মুনকাতি, কিছু সনদবিহীন। একটি সনদও সহিহ কিংবা হাসান পর্যায়েও পৌঁছে না। সামনেই আমরা এগুলোর সনদসহ আলোচনা দেখতে পাব। উপরন্তু সনদের স্তর উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ঐতিহাসিক দিক থেকেও এগুলোর কোনো মূল্য নেই। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, ঐসব রেওয়ায়েত দিয়ে শরিয়তের কোনো মাসআলা প্রমাণ করা যাবে না। ফলে নবীজির জন্মের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নির্ধারণ করে একটি শরিয়তসম্মত উৎসবের মর্যাদা দেওয়ার এবং সেদিনকে জাঁকজমকভাবে পালন করার সুযোগ নেই। যেহেতু এই তারিখগুলো জন্নি (আনুমানিক), কাতয়ি বা অকাট্য নয়; তাই কেউ যদি এই তারিখগুলো অস্বীকার করে, তা হলে তার দীন ও ঈমানের মধ্যে বিন্দুমাত্র কমতি আসবে না।

এবার আমরা নবীজির জন্মতারিখ সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থগুলো থেকে কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব।

এক ১২ রবিউল আওয়াল

১ ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৩ হিজরি) মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে ইসহাক বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৫৮] কিন্তু ইবনে ইসহাকের সিরাতগ্রন্থে তার এই বক্তব্যটি আমি খুঁজে পাইনি। হয়তো ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের অন্য কোনো কিতাবে পেয়েছেন, যা আমাদের কাছে নেই। অথবা এই রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাক থেকে কোনো মাধ্যমে নিয়েছেন। সর্বোপরি ইবনে হিশাম উক্ত রেওয়ায়েতটির সনদ উল্লেখ করেননি। কেবল 'ইবনে ইসহাক বলেছেন'- এটুকু বলেই থেমে গেছেন। এই রেওয়ায়েতটিই বাইহাকি, হাকিম, তাবারিও উল্লেখ করেছেন।

সবারই ইবনে ইসহাক পর্যন্ত এসে তাদের সনদ শেষ হয়ে গেছে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- ১/৭৪; মুসতাদরাক- ৪১৮৭; তারিখুত তাবারি- ২/১৫৬]

সর্বাবস্থায় রেওয়ায়েতটি যয়িফ ও মুনকাতি সাব্যস্ত হয়। আর তিনশ' শতাব্দীতে এসে তা অধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যাবে না। কারণ, প্রথম শতাব্দীর রাবি সম্পূর্ণ মাজহুল (অজ্ঞাত)।

২ হাফেজ ইবনে কাসির রহ. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার বরাতে হজরত জাবের ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। এদিনই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। এদিনই তাঁকে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানো হয়। এদিনই তিনি হিজরত করেন এবং ইনতেকাল করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৫] ইবনে কাসির রহ. নিজেই এর সনদ মুনকাতি বলেছেন (আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে উক্ত রেওয়ায়েতটি পাইনি এবং অন্যকোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থেও তার সন্ধান মেলেনি)।

৩ মা'রুফ বিন খারবুজ মক্কি (মৃত্যু ১৫১ হিজরি) থেকে একটি মুনকাতি বর্ণনা রয়েছে। এতে তিনি ১২ রবিউল আওয়ালকে নবীজির জন্মতারিখ বলেছেন। [তারিখে দিমাশক- ৩/৬৯, ৭০]

দুই ১২ রমজানুল মোবারক

১ হাফেজ ইবনে কাসির রহ. জুবাইর বিন বাক্কার (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি) এর সূত্রে তার একটি বক্তব্য উল্লেখ করেন, যার দ্বারা মা আমিনার গর্ভধারণ শুরু হয়েছে আইয়ামে তাশরিকে, ৯ মাসের গর্ভধারণ সময়সীমা সমাপ্ত হয় রমজান মাসে এবং ১২ রমজানে জন্ম হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৬]

এই বক্তব্যটি আল্লামা আবদুল আজিজ হামাবি এবং আল্লামা মাকরিযি উভয়ই উদ্ধৃত করেছেন। [আলমুখতাসারুল কাবির ফি সিরাতির রাসুল, পৃষ্ঠা ২২, ইমতাউল আসমা, মাকরিযি- ১/৬]

স্মর্তব্য, জুবাইর বিন বাক্কার একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবি, হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা. এর বংশধর। ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে কঠোর জারহ (আপত্তি) রয়েছে। কিন্তু জুবাইর বিন বাক্কার-এর ব্যাপারে তেমন জারহ নেই। কেবল আল্লামা সুলাইমানি তাকে জারহ করেছেন আর এটা সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যাত। এ ছাড়া সবই তার তাওসিক বা নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে বক্তব্য। হাফেজ জাহাবি রহ. তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, 'আল্লামা, হাফেজ (হাদিস) মক্কার কাজি ও আলেম' -[সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১২/৩১১-৩১৫]। জুবাইর বিন বাক্কারের নির্ভরযোগ্যতার আলোচনার দ্বারা উক্ত হাদিসটি সহিহ কিংবা হাসান বানানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সনদের মধ্যে ইনকিতা পাওয়া যাওয়ার দরুন ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের মতো যয়িফ রয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হলো, এই রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের স্তরেই আছে, তা বর্ণনা করা।

২ জুবাইর বিন বাক্কারের রেওয়ায়েতের সমর্থনে হাফেজ ইবনে আসাকির ভিন্ন এক সনদে শুয়াইব বিন শুয়াইব তার পিতা এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে এসেছেন মহররমের আশুরাতে এবং রমজান মাসের ১২ তারিখে সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ

করেন।' কিন্তু এর সনদের মধ্যে দুজন দুর্বল রাবি আছেন, একজন মুহাম্মদ বিন উসমান (বিন আবি শাইবা -মৃত্যু ২৯৭ হিজরি)। কিছু মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাকে যয়িফ এবং মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বলে কঠোর জারহ (সমালোচনা) করেছেন [মিযানুল ইতিদাল- ৩/৬৪২]। দ্বিতীয়জন মুসাইয়িব বিন শারিক (মৃত্যু ১৮১ হিজরি), তিনিও যয়িফ। [মিযানুল ইতিদাল- ৪/১১৪]

তিন ১লা রবিউল আওয়াল

ইমাম ফাকিহি নিজের সনদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবীজির জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই হয়েছে ১লা রবিউল আওয়ালে। [আখবারু মক্কা, ফাকিহি- ৩/৩৮৪] এই রেওয়ায়েতটি খুবই দুর্বল। কারণ, তার সনদে মুআল্লা বিন আবদুর রহমান নামের একজন রাবি, তাকে কাজ্জাব বা মিথ্যুক বলা হয়েছে। [আযযুআফাউল কাবির, উকাইলি- ৪/২১৫]

চার ২রা রবিউল আওয়াল

ওয়াকিদি আবু মা'শার মাদানি (মৃত্যু ১৭০ হিজরি) থেকে ২রা রবিউল আওয়ালের বক্তব্য উল্লেখ করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১০১] এর সনদও মুনকাতি (দুর্বল)। কারণ, আবু মা'শার মাদানি একজন দুর্বল রাবি। [তাকরিবুত তাহযিব- জীবনী নম্বর ৭১০০]

পাঁচ ৮ই রবিউল আওয়াল

ইবনুল জাওযি রহ. নিজের সনদে মুহাম্মদ বিন আহমাদ আলবারা (মৃত্যু ২৯১ হিজরি) থেকে নবীজির জন্ম ৮ই রবিউল আওয়ালে হয়েছে মর্মে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। [আলমুনতাজাম- ২/২৪৬] এর সনদও সুস্পষ্ট মুনকাতি। ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি) উপর্যুক্ত দুটি বক্তব্য তথা ২ ও ৮ই রবিউল আওয়াল- এর কথা কোনো সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ৮, ৯]

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ আল্লামা ইবনে কুনফুজ (মৃত্যু ৮১০ হিজরি) ৮ই রবিউল আওয়াল-এর তারিখকে প্রাধান্য দিয়ে লেখেন, অধিকাংশ লোকই ৮ তারিখকে বিশুদ্ধ বলেছেন।' [উসিলাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪]

এ ছাড়া বহু বক্তব্য রয়েছে, যেমন- ১৭ তারিখ ইত্যাদির কথাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সবকটিই পরিত্যাজ্য। প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলো আমরা আলোচনা করেছি। ১২ রবিউল আউয়ালের বক্তব্যটি অধিকাংশ সিরাত গবেষকরা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশামের অনুকরণে লিখেছেন। ইবনে কাসির রহ. এটাকেই জুমহুরের (অধিকাংশের) বক্তব্য বলেছেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৫]

অন্যদিকে রেওয়ায়েতের চেয়ে যুক্তির উপর অধিক নির্ভরকারী পঞ্জিকা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ইতিহাসবিদদের নিকট ১২ রবিউল আওয়ালের স্থানে ২, ৮ কিংবা ৯ তারিখের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাদের যুক্তি হলো, হিজরত সর্বসম্মতিক্রম ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। সে হিসেবে হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে ১২ রবিউল আওয়াল কোনোভাবেই সোমবার হয় না। কিন্তু ২, ৮ কিংবা ৯ তারিখগুলো কোনো না কোনোভাবে ঐদিনের সাথে মিলে যায়।

রমজানুল মুবারকে জন্মের বিষয়টি কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ সনদের বিচারে এটি ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতের স্তরে। হাফেজ ইবনে কাসির রহ.

এই বর্ণনার সমর্থনে উল্লেখ করেন যে, নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় রমজানুল মুবারকে। আর নবীজির বয়স তখন চল্লিশ বছর ছিল।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৩৭৬] সে হিসেবে জন্মের ঠিক চল্লিশ বছর পূর্বে রমজানুল মোবারক মিলে যাবে।

রবিউল আওয়াল এবং রমজানের বক্তব্যের কোনটি অধিক অগ্রগণ্য?

এখন প্রশ্ন হলো, রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারকের বক্তব্যের কোনটি অধিক প্রাধান্য পাবে? মূলত এর মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। আমরা যদি মক্কি-মাদানি পঞ্জিকার পার্থক্য সামনে রেখে হিজরতের ৫৫ বছর পূর্বের হিসাব মেলাই, তা হলে জন্মের বছর দুই স্থানে গিয়ে পৃথক পৃথক পঞ্জিকাতে রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মোবারক দেখা যাবে।

আলি মুহাম্মদ খানের পঞ্জিকা মোতাবেক প্রথম স্থান- ১৩ রমজান মাদানি= ১৩ রবিউল আওয়াল মক্কি হয় ১৯ নভেম্বর ৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। আর দ্বিতীয় স্থান- ১০ রমজান মাদানি= ১০ রবিউল আওয়াল মক্কি হয় ১৩ মে ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। [তাকউয়িমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ১১৫]

কিছু ওলামায়ে কেরাম উপর্যুক্ত দুটি তারিখের প্রথমটিকে এবং অন্যরা দ্বিতীয়টিকে নবীজির জন্মতারিখ সাব্যস্ত করেন। ইখতিলাফের কারণ নিয়ে একটা সংশয় হয় যে, রবিউল আওয়াল এবং রমজানুল মুবারকের প্রবক্তাদের মধ্যে কে মক্কি এবং কে মাদানি পঞ্জিকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

নবীজির জন্মতারিখ ঘাঁটাঘাঁটি করে ইবনে হাবিবের একটি বক্তব্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। তার এই বক্তব্য অনুযায়ী জন্মতারিখ মহররমের জুমাবার শুরু হয়। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১০] এই তারিখ ধরা হলে ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ মাদানি রমজান (মক্কি রবিউল আওয়াল) এবং ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী ১২ মাদানি রমজান (মক্কি রবিউল আওয়াল) সোমবার হয়।

তবে আমার (লেখকের) মতে এ বিষয়ে আরো তাহকিক ও গবেষণা দরকার। উপর্যুক্ত তারিখগুলো প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। হিসাবে কিছু জিনিস ঠিকমতো আসে না, আবার মানুষ হিসেবে এর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। অন্যদিকে এটাও হতে পারে যে, ভুল চাঁদ দেখার কারণে তারিখ গণনাতেও ভুল হয়েছে। আমরা গণনা করে এটা তো বলতে পারব যে, কোনো এক স্থানে চাঁদ দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানের কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ, দিগন্ত এবং মৌসুমের বিভিন্ন অবস্থার কারণে চাঁদ দেখার ধরনেও প্রভাব পড়ে।

যাই হোক, এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রমজান-রবিউল আওয়ালের মতানৈক্য চান্দ্র আর সৌরবর্ষপঞ্জির ভিন্নতার কারণে হয়েছে। এবার জানা প্রয়োজন চান্দ্র আর সৌরবর্ষপঞ্জির মাঝে পার্থক্য কী? এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বলব, তৎকালে নিরেট চান্দ্রবর্ষপঞ্জি ছিল না; বরং সৌরবর্ষ মোতাবেক ৩৬৫ দিন হিসেবেই দিন গণনা করা হতো। এই হিসেবে নবীজির জন্ম ও হিজরতের মধ্যকার সময় কেবল চান্দ্রবর্ষপঞ্জির ৫৩ বছর হবে না; বরং ৫৪ বছর কয়েক মাস হবে। অথচ মক্কি পঞ্জিকা তথা সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৫৩ বছর কয়েক মাস হবে।

এই সংবাদ পেয়ে তিনি দৌড়ে আসেন। পুত্রবধূ আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কোলে চাঁদের মতো এক সুদর্শন বাচ্চা দেখে তার অন্তর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ছ'মাস পূর্বে তার সর্বকনিষ্ঠ ছেলে আবদুল্লাহর ইনতেকাল হয়। এই সন্তান সেই আবদুল্লাহরই প্রতিচ্ছবি। আবদুল মুত্তালিব বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ-সানা পাঠ করে বাচ্চার নাম খুঁজতে থাকেন। তখনই তার মনে একেবারেই নতুন একটি নাম উদিত হয়- 'মুহাম্মাদ'। ইতোপূর্বে আরবদের কারো মধ্যেই এই নাম পাওয়া যায়নি। আল্লাহ তায়ালা এমন অনন্য নামটি সর্বশেষ রাসুলের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এটিই আবদুল মুত্তালিবের অন্তরে ঢেলে দেন।

নবীর বংশধারা হলো- মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব, বিন হাশিম, বিন আবদে মানাফ, বিন কুসাই, বিন কিলাব, বিন মুররা, বিন কাব, বিন লুয়াই, বিন গালিব, বিন ফিহর, বিন মালিক, বিন নজর, বিন কিনানা, বিন খুযাইমা, বিন মুদরিকা, বিন ইলয়াস, বিন মুযার, বিন নিযার, বিন মাআদ, বিন আদনান।'

আদনানের পর কয়েক মাধ্যমে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে

চান্দ্রবর্ষ হিসেবে পূর্ণ ৫৩ বছর ধরলেই নবীজির খ্রিষ্টীয় জন্মসনের সাথে বছর-মাসের হিসাব ভুল বের হয়।

ব্যাপকভাবে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল যদিও জন্মসন বলা হয়, কিন্তু শুদ্ধ হলো ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস কিংবা ৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। এরপর পুনরায় এই আপত্তি আসে না যে, সিরাতগবেষকরা নবীজির জন্ম বসন্তকালে হয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকেন, অথচ প্রথমযুগের রাবিদের থেকে এই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। কারণ, কিছু মানুষ রবিউল আওয়াল শব্দ থেকে ভুল ধারণা করে যে, এ মাস বসন্ত মৌসুমে আসে। আবার কিছু মানুষ ক্যালেন্ডার হিসেব করে বসন্ত মৌসুমের কথা বাড়িয়ে দেয়। যদিও এই গণনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

আমি (লেখক) নববি সিরাতের তারিখ আলোচনায় মক্কি জীবনের ঘটনাবলি অধিকাংশই মক্কি তথা সৌরবর্ষ মোতাবেক উল্লেখ করেছি। কারণ, তৎকালে এটিই অধিক প্রচলিত ছিল। হ্যাঁ, কোনো তারিখ যদি দলিল কিংবা সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের দ্বারা মাদানি তথা চান্দ্রতারিখও প্রমাণিত হয়, সেটা ভিন্ন কথা।

মিলে যায়। তিনি ছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বড় ছেলে এবং একজন সম্মানিত নবী।[২০০]

পবিত্র শিশু

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুর দিকে কিছুদিন চাচা আবু লাহাবের বাঁদি সুয়াইবার দুধ পান করেছিলেন।[২০১] ঐ সময় আবদুল মুত্তালিব তার এতিম নাতির জন্য একজন দাইমা খুঁজছিলেন। আরবের রেওয়াজ ছিল তারা দুধের শিশুর লালন-পালনের জন্য পল্লী-অঞ্চলের দুধমায়ের হাতে সোপর্দ করত। গ্রামের স্বচ্ছ ও মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে তার সঠিক প্রতিপালন হয়। তার বিকাশ হয়। তা ছাড়া গ্রামের ভাষা হতো সুনির্দিষ্ট এবং বিশুদ্ধ। এ ভাষা শিখে শিশুরাও সুন্দর করে বলতে পারে।

তায়েফের নিকটবর্তী বসতি বনু সা'দ তার বিশুদ্ধতা ও অলংকারিত্বের কারণে মশহুর ছিল। এজন্য মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বনু সা'দের দুগ্ধপানকারিণী নারীদের দিয়ে সেবা নিতে খুব পছন্দ করতেন। অভ্যাস অনুযায়ী এ সময়েও বনু সা'দের কিছু দাইমা প্রতিপালনের জন্য বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে। কিন্তু কোনো দাই-ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিতে রাজি হচ্ছিল না। কারণ, সময়টা ছিল দুর্ভিক্ষের। দাইমায়েরা চাচ্ছিল নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতিম দেখে এই ঘর থেকে ন্যায্যমূল্য পাওয়ার আশা করেনি কেউ।

দাইমাদের ঐ কাফেলায় হালিমা সাদিয়া নামক এক পুণ্যবান নারী ছিলেন। তিনি কোনো বাচ্চাই পাচ্ছিলেন না। পরিশেষে মা আমিনার ঘরে প্রবেশ করার পর বাচ্চা দেখেই তার মহব্বত উথলে ওঠে। অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের আশা না করেই তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়ে চলে আসেন। তাকে কোলে নেওয়ার পর থেকেই হালিমার সর্বদিকে বরকত হতে থাকে। দুর্বল প্রাণী সবল হয়ে যায়। অসচ্ছলতা সচ্ছলতায় বদলে যায়।

---

২০০ সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১, ২, ৩
২০১ জামিউল উসুল, ইবনুল আসির জাজারি- ১২/৯১ (মাকতাবা হালওয়ানী সংস্করণ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক বিকাশ সাধারণ বাচ্চাদের থেকে ব্যতিক্রম ছিল। তার বয়স যখন দু'বছর হয়, তখন হালিমা সাদিয়া তাকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুধভাই-বোনদের সাথে জঙ্গলে বকরি চড়াতে যেতে থাকেন। এ সময় একদিন আচমকা দুই ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে নবীজির বুক ফেঁড়ে তার অন্তরটা বের করে তা থেকে কালো ধরনের কী যেন বের করে ফেলেন এবং ঈমান ও হেকমত দিয়ে ভরে পুনরায় তা আপন স্থানে রেখে দেন। কিন্তু নবীজির বুক বিদীর্ণ করার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি।[২০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার বছর বনু সা'দে ছিলেন। এরপর হালিমা তাকে মায়ের কাছে ফেরত দেন।[২০৩] কবিলা বনু সা'দের সাদাসিধে এবং পরিশ্রমী জীবন নবীজির স্বাস্থ্য, বিকাশ ও তরবিয়তে অনেক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদের বলতেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। আর আমি কবিলা বনু সা'দে দুধপান করেছি।'[২০৪]

মায়ের সাথে ইয়াসরিব সফর

মক্কায় ফিরে আসার পর নবীজির বয়স যখন ছ' বছর হয়, তখন মা আমিনা তাকে নিয়ে ইয়াসরিব রওনা হন। পথিমধ্যে স্বামীর কবর জিয়ারতও হবে আবার ছেলেকে নানুবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। তার হাবশি বাঁদি বারাকা (উম্মে আইমান)-ও তাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। আবদুল্লাহর উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে রেখে যান। আমিনা নানাবাড়ি বনু নাজ্জারে কিছুদিন বেড়ান। এখানে বনু আদি

---

[২০২] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৬২-১৬৪; (সিনা বিদীর্ণ করার ঘটনা), মুসনাদ আবু ইয়ালা- ৭১৬৩, সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬৩৩৫

[২০৩] দুধপান শেষ করার পর হালিমা রা. নবীজিকে মক্কায় নিয়ে এসেছিলেন। তার প্রতি এত মহব্বত তৈরি হয়েছিল যে, মা আমেনাকে অনুরোধ করে পুনরায় তাকে কবিলায় নিয়ে যান। [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৬৪] দু'বছর পর পুনরায় নিয়ে আসেন। [মিরআতুয যামান, সিবতু ইবনুল জাওযি- ৩/৪৯]

[২০৪] সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/১৬৭

বিন নাজ্জারের একটি পুকুর ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সাঁতার শেখেন।[২০৫]

মা আমিনার অফাত এবং আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান

ইয়াসরিব থেকে ফেরার পথে মা আমিনা 'আবওয়া' নামক স্থানে আসার পথে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ স্থানেই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। এই অনাবাদ বিরান ভূমিটি মক্কা ও ইয়াসরিবের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত ছিল। চারপাশ পাহাড়-বেষ্টিত একটি টিলাতে তাকে দাফন করা হয়। আবদুল্লাহর এতিম ছেলেটি ছয় বছর বয়সে মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। এমন দুর্দশা অবস্থায় তার পাশে এমন কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও ছিল না, যে তার মাথায় হাত বুলিয়ে এবং বুকে জড়িয়ে একটু সান্ত্বনা দেবে। আল্লাহর তরফ থেকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা তরবিয়তের এমন কিছু ধাপ অতিক্রম করে, যা বালুকে প্রক্রিয়াজাত করার পর সোনার অলংকারে পরিণত করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদি বারাকাহ (উম্মে আইমান, তার বয়স তখন ষোল-সতের বছরের বেশি ছিল না) অনেক কষ্ট করে তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। আবদুল মুত্তালিব এই অনন্য এতিম নাতিকে আদর-স্নেহের চাদরে আবৃত করে নেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেননি। কাবার ছায়ায় যখন তার জন্য সরদার হিসেবে কোনো চাদর বিছিয়ে দেওয়া হতো, যার উপর অন্য কারো বসার অনুমতি ছিল না, তখনও তার দৌহিত্রকে তার সঙ্গে বসিয়ে নিতেন।[২০৬]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত বছর বয়সে উপনীত হলে, কিছুদিনের জন্য আবদুল মুত্তালিব ইয়েমেন সফর করেন। ইয়েমেনে হাবশিদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে মসনদে আরোহণ করায় সেখানকার নতুন শাসক সাইফ বিন যি-ইয়াযানকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সফর

---

২০৫ শারহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ: ১/৩০৯ (দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ)

২০৬ সিরাতে ইবনে হিশাম- ২/১৬৮

করেন।[২০৭] এ ছাড়া আবদুল মুত্তালিব কখনো এই এতিম শিশুকে ছেড়ে কোথাও যাননি।

আবদুল মুত্তালিবের অফাতের পর

কিন্তু এই সীমাহীন মায়া-মমতার সময়টা প্রভাত-সমীরণের ন্যায় কেটে যায়। একদিন আবদুল মুত্তালিবও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তখন নবীজির বয়স ছিল ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন।[২০৮] দাদা ইনতেকালের পূর্বে ছেলে আবু তালিবকে নবীজির দেখভাল এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য অসিয়ত করে যান।[২০৯]

---

[২০৭] আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/১৬৬, ১৬৮ (আলইলমিয়্যা সংস্করণ), আলমুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ, পৃষ্ঠা ৪২৭, তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৭৪

[২০৮] আলমুহাব্বার- ইবনে হাবিব, পৃষ্ঠা ১০

[২০৯] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৭৯

আবদুল মুত্তালিবের ইনতেকালের সময় তার দুই ছেলে হামজা ও আব্বাস ছোট ছিলেন। কেবল জুবাইর ও আবু তালেব যুবক ছিলেন। তো নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার তত্ত্বাবধানে থাকবেন? এ ব্যাপারে মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আবু বকর থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল মুত্তালিব রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে চাচা আবু তালিবকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।' [তারিখুত তাবারি- ২/২৭৭]

এই বর্ণনানুযায়ী আবদুল মুত্তালিব তার নাতির দেখাশোনার জন্য আবু তালিবকে অসিয়ত করেছিলেন। সিরাতে ইবনে ইসহাক, তারিখুত তাবারি- সিরাতে ইবনে হিশাম, দালাইলুন নুবুওয়াহসহ অনেক সিরাতের কিতাবেই ঐ রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাকের মুনকাতি সনদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এই রেওয়ায়েতের সনদ যয়িফ; তাই কিছু কিছু আলেম একে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে জুবাইরের দেখাশোনার দায়িত্বের কথা বলে থাকেন। কারণ আবদুল মুত্তালিবের পরবর্তী উত্তরাধিকার ছিলেন জুবাইর। তিনিই বড় চাচা এবং ধনী মানুষ ছিলেন। অপরদিকে আবু তালেব দরিদ্র ছিলেন। তাই এমন অবস্থায় তার কাছে কীভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন!' কিন্তু এটা কেবল দাবি ও যুক্তি। তার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। জুবাইরের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যত বর্ণনাই উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কোনোটারই সনদ নেই। তা ছাড়া রেওয়ায়েতে সরাসরি নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তত্ত্বাবধানের কথাও উল্লেখ নেই। বরং তাকে আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক গোত্রের সরদারির দায়িত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে। [আলমুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ, পৃষ্ঠা ১২৬; আলমুহাব্বার- ইবনে হাবিব, পৃষ্ঠা ১৩২]

পরবর্তী উত্তরাধিকার হলেই যে বংশের ছোট-বড় সব কাজ তারই আঞ্জাম দিতে হবে, তা কিন্তু জরুরি নয়। তা ছাড়া আবু তালিব কর্তৃক নবীজির (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তত্ত্বাবধানের কথা কেবল মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সনদেই নয়; বরং ভিন্ন সনদেও উদ্ধৃত হয়েছে। মুহাম্মদ বিন সাদ একাধিক সনদ উল্লেখ করেছেন, যদিও তা যয়িফ। তন্মধ্যে একটি সনদে মুয়াজ বিন মুহাম্মদ আলআনসারি (মৃত্যু ১৬০ হিজরি, ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকাতে'র (নির্ভরযোগ্য) মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তাহযিবুল কামাল- ৩৮/১৩১) আতা (বিন ইয়াসার, মৃত্যু ৯৪ হিজরি, তিনি বুখারি ও মুসলিমের রাবি) থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সনদটি সর্বনিম্ন হাসান পর্যায়ের হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আর অন্যান্য রেওয়ায়েত মেলালে তা সহিহ লিগায়রিহি স্তরে পৌঁছে যাবে। তাই আবু তালেব রাসুলুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার রেওয়ায়েতগুলো গ্রহণযোগ্য। আর তার প্রত্যাখ্যান নিরেট সমালোচনা বৈ কিছুই নয়।

ইমাম বালাযুরি এ বিষয়েই কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করে লেখেন,

فاقترع الزبير وأبو طالب أيهما يكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأصابت القرعة أبا طالب، فأخذه إليه، ويقال: بل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزبير، وكان ألطف عميه به، ويقال: بل أوصاه عبد المطلب بأن يكفله بعده

তখন জুবাইর ও আবু তালেব নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক কে হবেন, এ ব্যাপারে লটারি দেন। তখন লটারি আবু তালেবের পক্ষে যায়। বলা হয়, না বরং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাকে জুবাইরের উপর প্রাধান্য দেন। কারণ, উভয়ের মাঝে তিনি ছিলেন অধিক কোমলপ্রকৃতির। কেউ কেউ বলেন, বরং আবদুল মুত্তালিবই আবু তালেবকে তার তত্ত্বাবধানের অসিয়ত করে যান।' [আনসাবুল আশরাফ- ১/৮৫]

উল্লেখ্য যে, আল্লামা হালাবি একটি বক্তব্য নকল করেছেন, যার মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ বক্তব্যগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য এসে যায়। তা হলো- আবদুল মুত্তালিবের ইনতেকালের পর জুবাইর ও আবু তালেব, উভয়ই নবীজির তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন জুবাইর মারা যান। ফলে আবু তালেবের জিম্মাদারিতে চলে আসেন।' [আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/১৬৫] এখানেও কিন্তু আবু তালেবের তত্ত্বাবধানের কথা এসেছে।

তবে ইমাম বালাযুরি জুবাইরের তত্ত্বাবধান এবং নবীজির চৌদ্দ বছর বয়সে তার ইনতেকালের বিষয়টি তিনি দালিলিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন,

وروى بعضهم أن الزبير كفل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم كفله أبو طالب، وذلك غلط، لأن الزبير شهد حلف الفضول ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ نيف وعشرون سنة، لا اختلاف بين العلماء في أن شخوص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع أبي طالب بعد عبد المطلب بأقل من خمس سنين

এই বছরই মারা যান আরবের প্রখ্যাত দানবীর এবং তাই গোত্রের সরদার হাতিম তাই। এ বছর পারস্যের প্রসিদ্ধ বাদশাহ নওশেরওয়াঁরও অফাত হয়।[২১০]

সুন্দর শৈশব

সাধারণত বাল্যকাল উচ্ছৃঙ্খলতা আর দুষ্টুমিতে ভরপুর থাকে। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম থেকেই নেহায়েত শিষ্ট, সম্ভ্রান্ত, গম্ভীর এবং লাজুক ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবদের মন্দচরিত্রে বিন্দুপরিমাণ প্রভাবিত হননি। শিরকি কার্যকলাপ, শরাবপান, গানবাদ্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। সততা, আমানতদারি, সহমর্মিতা, বিনয়, মানবিকতা, দয়া-মায়ার গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন তিনি। তার পাশাপাশি তিনি প্রখর মেধাবী, সামাজিক, সাহসী ও সচেতন ছিলেন।[২১১]

শাম সফর এবং বাহিরা পাদরির সাক্ষ্য

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো বছর বয়সে যখন চাচা আবু তালেবের সঙ্গে শাম সফরে বের হন, তখন তাদের কাফেলা শামের

কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, জুবাইর নবীজি সা কে তত্ত্বাবধান করেছেন, তারপর তার মৃত্যু হয়েছে, এরপর আবু তালেব তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; এটি ভুল কথা। কারণ, জুবাইর তো 'হিলফুল ফুযুল' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স তখন বিশের ঊর্ধ্বে। ওলামায়ে কেরাম সকলেই একমত যে, আবদুল মুত্তালিবের ওফাতের প্রায় পাঁচবছর পর আবু তালিবের সঙ্গে শাম সফর করেছেন।' [আনসাবুল আশরাফ- ১/৮৫]

সারকথা, ইমাম বালাযুরি আবু তালিবের তত্ত্বাবধানের রেওয়ায়েতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন যদি কেউ কেবল এই যুক্তি দেয় যে, আবু তালেব নিঃস্ব-দুর্বল ছিলেন, জুবাইর ধনবান ও সরদার ছিলেন এবং এই যুক্তিতে আবু তালিবের তত্ত্বাবধানের রেওয়ায়েতগুলো প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে তা হবে ঠুনকো যুক্তি। আচ্ছা, দরিদ্ররা কী কোনো বাচ্চা লালন-পালন করেন না? তারা কি এতিমদের দেখভাল করেন না?

[২১০] তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালিল আনফাসিন নাফিস- ১/২৫৫ (দারু সাদির সংস্করণ), আলবাদউ ওয়াত তারিখ- ৪/১৩৩ (মাকতাবতুস সাকাফাতিদ দীনিয়্যাহ সংস্করণ)

[২১১] আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/১৭৮

সীমান্তবর্তী শহর বুসরার প্রধান রাস্তার পাশেই যাত্রাবিরতি দেয়। সেখানে বাহিরা নামক এক পাদরির সাধনাগৃহ ছিল।[২১২] বাহিরা তার এই সাধনাগৃহ থেকে সাধারণত বের হতেন না। কিন্তু সেদিন বের হন এবং কাফেলার লোকদের পরখ করতে করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে যান। তার হাত ধরে বলতে লাগলেন, 'এ পৃথিবীর সরদার, এ বিশ্বপ্রতিপালকের রাসুল, এ বিশ্বমানবতার প্রতি দয়া'।

কুরাইশের কিছু বৃদ্ধ বলল, তুমি তা কীভাবে জানলে?

বললেন, তোমরা যখন উপর থেকে নিচে নামছিলে, তখন আমি দেখলাম এখানকার প্রতিটি বৃক্ষ কিংবা পাথর তার সম্মানে অবনত হচ্ছে। এমন শুধু নবীদের জন্যই করা হয়ে থাকে। আর আমি তার দুই কাঁধের মাঝে মোহরে নবুওয়াত থাকার কারণে তাকে নবী হিসেবে চিনতে পেরেছি।'

ঐ পাদরি কাফেলার মেহমানদারি করলেন এবং আবু তালেব থেকে এই মর্মে শপথ নিলেন যে, এই বালককে শামে নিয়ে যাবেন না। কারণ, সেখানকার রোমানরা যদি তার এই নবুওয়াতের গুণাবলি জানতে পারে, তা হলে তারা তাকে মেরে ফেলবে।[২১৩] ফলে আবু

---

[২১২] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১২১। কুরাইশের এই শাম সফর হয়তো তাদের অভ্যাস অনুযায়ী সম্ভবত গ্রীষ্মকালেই হয়েছিল। [সুরা কুরাইশ, আয়াত ৩]

[২১৩] সুনান তিরমিজি- ৩৬২০ (আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মা জাআ ফি বাদইন নুবুওয়াতিন নবী) আলবানি রহ. বলেছেন, হাদিস টি সহিহ; কিন্তু এখানে বেলালের উল্লেখ মুনকার। এই রেওয়ায়েতের কোনো রাবির ওয়াহমের কারণে 'আবু তালেব নবীজিকে আবু বকর ও বেলালের সঙ্গে ফেরত পাঠান' কথাটির সংযুক্তি এসেছে। আর এই অংশটুকুর কারণে পুরো রেওয়ায়ত ইমাম জাহাবি রহ. অগ্রহণযোগ্য বলেন। [মিযানুল ইতিদাল- ২/৫৮১]

তবে ইনসাফ ও মধ্যপন্থা হলো কেবল অযৌক্তিক সেই অংশটুকুই পরিত্যাজ্য হওয়া। যেমন: ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. যাদুল মাআদে (এ গ্রন্থে তিনি সিরাতে নববিকে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে আলোচনা করেছেন) সেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং আলোচিত অংশটুকু অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। তিনি লেখেন,

ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح، فإن بلالاً إذا لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن معه عمه ولا مع أبي بكر، وذكر البزار في مسنده هذا الحديث، ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال: رجلاً

'তিরমিজি ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে, আবু তালেব নবীজির সঙ্গে বেলালকে পাঠিয়েছেন; এটা সুস্পষ্ট গলদ। কারণ, বেলাল রা. হয়তো ঐ সফরে ছিলেন না, আর থাকলেও সঙ্গে অবশ্যই চাচা আবু তালেব এবং আবু বকরও ছিলেন না। ইমাম বাযযার তার মুসনাদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে 'চাচা তার সঙ্গে বেলালকে পাঠান'- এ কথাটি নেই; হ্যাঁ, সেখানে 'একজন লোক পাঠালেন'- কথাটি আছে। [যাদুল মাআদ- ১/৭৬, ৭৭]

অপরদিকে আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. তার সুপ্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থ 'সিরাতুন-নাবী'তে প্রাচ্যবিদদের আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে ঐ রেওয়ায়েতটি শুধু মতন (পাঠ) এর দিক থেকেই নয়; বরং সনদের দিক থেকেও কঠিন জারহ ও সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি খুবই দুর্বল যে, 'নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সফরে বাহিরা সন্ন্যাসী থেকে বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন।' আল্লামা শিবলি তার একটি যৌক্তিক উত্তর দেন যে, এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এমন একটি ছোট বালকের সূক্ষ্ম জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জন করা এবং এর মাধ্যমে এত বড় বিপ্লব ঘটানো সম্ভব? সর্বোপরি প্রাচ্যবিদদের আপত্তি এমন গুরুত্বপূর্ণও নয় যে, এর কারণে আমাদের হাদিসের ভাণ্ডার পরিত্যাগ করতে পারি।

এবার আমরা উক্ত হাদিসের উপর আলোকপাত করব। তিরমিজি রহ. এ হাদিসের সনদকে 'হাসানুন গারিবুন' বলেছেন। সনদটি হলো,

فضل بن سهل، عبد الرحمن بن غَزْوان، يونس بن أبي إسحاق، أبو بكر بن أبي موسى، أبو موسى الأشعري

ফযল বিন সাহল: বুখারি ও মুসলিমের রাবি। সাদুক। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং ৫৪০৩]

আবদুর রহমান বিন গাজওয়ান: বুখারি ও মুসলিমের রাবি। সিকাহ। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং ৩৯৭৭] ইমাম জাহাবি তাঁকে হাফেজ, ইমাম এবং সাদুক বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার শাগরিদ। [সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৯/৫১৮]

ইউনুস বিন আবি ইসহাক: ইমাম মুসলিম রহ. তার রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাকে 'সাদুকুন য়াহিমু' বলেছেন। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং: ৭৮৯৯]

আবু বকর বিন মুসা : বুখারি ও মুসলিমের রাবি। সিকাহ। [তাকরিবুত তাহযিব- তরজমা নং: ৫৪০৩] অর্থাৎ প্রত্যেক রাবি-ই বুখারি-মুসলিম কিংবা উভয়ের রাবি। মিথ্যায় অভিযুক্ত কোনো রাবি নেই। এরপর রয়ে যায় হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এর কথা। আল্লামা শিবলি নুমানি রহ. তার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই হাদিসের সর্বশেষ রাবি আবু মুসা আশআরি রা. তো ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন, তা উল্লেখ করেননি।' [সিরাতুন নবী: ১/১১৪]

কিন্তু তার এই আপত্তি অহেতুক। কারণ, উসুলে হাদিসে আছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

তালেব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন লোক দিয়ে মক্কা পাঠিয়ে দেন।[২১৪]

হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন দশ, তখন থেকেই মক্কার বিভিন্ন এলাকায় অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে। একে 'হুরুবুল ফিজার' বা ফিজার যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। এই যুদ্ধ প্রথম সংঘটিত হয় বনু কিনানা এবং হাওয়াজিনের মাঝে। দ্বিতীয়বার কুরাইশ ও হাওয়াজিনের মধ্যে, তৃতীয়বার হাওয়াজিন ও বনু নাসর বিন মুয়াবিয়ার মুখোমুখি যুদ্ধ।[২১৫] চতুর্থ লড়াই হয় আগের চেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এই লড়াই 'ফিজারে রাবে' এবং 'ফিজারে বাররায' নামে প্রসিদ্ধ। কুরাইশ এবং বনু কায়সের মাঝে সংঘটিত হয়। এ সময় নবীজির বয়স পনেরো বছর ছিল।

যুদ্ধের দিন কুরাইশের বিচক্ষণ পুরুষেরা সারিবদ্ধভাবে ময়দানে দাঁড়ায়। বালকদেরকেও সাহায্যের জন্য তলব করা হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু

ইমাম যারকাশি বলেন, 'সাহাবাগণের মুরসাল গ্রহণযোগ্য, যদিও তাবেয়িদের থেকে তাদের বর্ণনার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করেন না। বিশেষকরে স্বাভাবিক অবস্থায়। তাই যখন কখনো ভিন্নরকম দেখা যাবে ঐ 'অধিকাংশ ক্ষেত্রের' উপর তার রেওয়ায়েতকে প্রযোজ্য হবে।' [আননুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ, যারকাশি: ১/৪৭৫]

আল্লামা সালাহুদ্দীন আলাঈ দিমাশকি লেখেন, জমহুর ওলামায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল গ্রহণে একমত।' [তাহকিকু মুনিফুর রুতবাহ, পৃষ্ঠা ৪৫]

ইমাম ইরাকি রহ. লেখেন, 'আর সাহাবায়ে কেরামের মুরসাল হলো মাওসুল হাদিসের হুকুমে।' [শারহুত তাবসিরা ওয়াত তাজকিরা আলফিয়াতুল ইরাকি: ১/২১৩]

সুনান তিরমিজির এই রেওয়ায়েতের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবার পর সিরাতে ইবনে হিশাম এবং তাবাকাতে ইবনে সাদের সেই যয়িফ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো আর পরিত্যাজ্য থাকবে না, যেগুলোতে এর কাছাকাছি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই সিরাত গবেষকরা ঐ ঘটনাটি গুরুত্বের সাথেই উল্লেখ করেছেন। কারণ, এখানে এক অমুসলিমের জবানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যতার সাক্ষ্য মিলে।

[২১৪] যাদুল মাআদ- ১/৭৬, ৭৭ (মুসনাদবাযযারের সূত্রে)

[২১৫] মিরআতুয যামান, সিবতু ইবনুল জাওযি- ৩/৭২, ৭৩

আলাইহি ওয়াসাল্লামও চাচাদের সাথে সাথে যান। তাদেরকে তিরন্দাজির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে ছিলেন বনু হাশিমের সরদার জুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিবও উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বনু উমাইয়ার সরদার হারব বিন উমাইয়া।

যুদ্ধের শুরুতেই শত্রুপক্ষ কুরাইশের উপর পুরো চড়াও হয়ে পড়ে। নবীজির চাচারা তির নিক্ষেপ করছিলেন আর তিনি দুশমনের তির কুড়িয়ে জমা করে রাখছিলেন, যেন তিরের সংকট তৈরি না হয়। দিনের শুরুতে বনু কায়সের যুদ্ধের পাল্লা ভারী ছিল। কিন্তু সূর্য ঢলার পর থেকেই কুরাইশের যুদ্ধের রূপ পালটে যায় এবং বনু কায়স পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রথম অভিজ্ঞতা।[২১৬]

সাইফ বিন যি-ইয়াযানের অফাত এবং দক্ষিণ আরবের উপর পারস্যের কর্তৃত্ব

এ বছরই দক্ষিণ আরবে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। ইয়েমেনের দেশপ্রেমিক আরব-শাসক সাইফ বিন যি-ইয়াযান পনেরো বছর শাসন করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। যেহেতু ইয়েমেনি হুকুমত কিসরার সামরিক মদদপুষ্ট ছিল; তাই সাইফের মৃত্যুর পরপরই কিসরা সরাসরি

---

[২১৬] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৮৪, আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/১৮৫-১৮৭

পুনশ্চ:

১ কারো মতে 'নিষিদ্ধ মাসসমূহে হওয়ার কারণে এগুলোকে 'হুরুবুল ফিজার' (তথা অপরাধ উদ্বেগকারী যুদ্ধসমূহ) বলা হয়। কিন্তু এই মতটি ঠিক নয়। কারণ, কিছু যুদ্ধ বছরের অন্যমাসেও সংঘটিত হয়েছিল। যেমন 'ফিজারে বাররায' যুদ্ধ শাওয়াল মাসে হয়েছিল। [উয়ূনুল আছার, ইবনু সাইয়িদিন নাস: ১/৬০, আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/১৮৬)।

অগ্রগণ্য মত হলো, অন্যায়ভাবে বহু পরিমাণে জান-মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে তাকে 'ফিজার' নামকরণ করা হয়।

কায়স বিন মাখরামা রা. বলেন, 'তারা একে (ফিজার নাম দিয়েছে, কারণ) তারা অন্যায়কাজ করেছে, আগে যে সমস্ত কাজকে হারাম মনে করতো, তা হালাল করে ফেলেছিল।' [মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ১৩৯৩৯]

২ 'ফিজার' শব্দটি 'ফুজ্জার'ও পড়া যায়। 'ফুজ্জার' 'ফাজের' (পাপী) শব্দের বহুবচন। এদিক থেকে তার নামকরণের কারণ সুস্পষ্ট।

হুকুমত দখল করে পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে শুরু করে। ফলে জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চল পুনরায় বিদেশি স্বৈরাচারী সরকারের হাতে চলে যায়।[২১৭]

হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম

যৌবনে পদার্পণের পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে জীবিকার খোঁজে বের হওয়ার চিন্তা করেন। বনু হাশিমের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করা; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো পুঁজি ছিল না। তাই তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের ব্যবসায় শ্রম দিতে শুরু করেন। বনু সা'দে শৈশবকাল কাটানোর সুবাদে তার এই কাজের অভিজ্ঞতা ছিল।[২১৮] এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা জুবাইরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন এবং তার সাথে ইয়েমেন সফরও করেন।[২১৯]

---

[২১৭] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৪১০ (কিসরা বাদশাহ নওশেরওয়াহ বিন কুবাযের আলোচনা, তারিখু ইবনে খালদুন- ২/৭৪

[২১৮] সহিহ বুখারি- ২২৬২ (কিতাবুল ইজারা, বাবু রা'য়িল গানাম আলা কারারিত্ব)

[২১৯] ইবনুল জাওযি রহ. 'আলওয়াফা' গ্রন্থে বলেন,

لما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة سنة، خرج في سفرمع عمه الزبير

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন দশের উর্ধ্বে, তখন তার চাচা জুবাইরের সঙ্গে এক সফরে বের হন। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/১৩৯, হালাবি তার ব্যাখ্যায়: 'ইয়ামানে' অর্থাৎ সফর করেন। [আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/১৭০]

উপর্যুক্ত বক্তব্য দিয়ে নবীজির বয়স নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। কারণ, بضع শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়। [আসসিহাহ তাজুল লুগাহ: ৩/১১৮৬] কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে। সময়টা ছিল ফিজারযুদ্ধ এবং হিলফুল ফুযুলের মাঝামাঝি সময়। হিলফুল ফুযুলে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স ছিল বিশ বছর আর ফিজারযুদ্ধে পনেরো বছর। এ ছাড়া কিছুদিন তিনি ছাগলও চড়িয়েছেন। ব্যবসার জন্য পর্যাপ্ত বয়স দরকার ছিল। তাই অনুমান করা যায় সফরের সময় নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স ১৮ বছরের কাছাকাছি ছিল। খুব সম্ভব এটি ইয়েমেনে কুরাইশদের গ্রীষ্মকালীন নিয়মিত সফর ছিল। [সুরা কুরাইশ : আয়াত ৩, তাফসিরে ইবনে কাসির দ্রষ্টব্য]

হিলফুল ফুযুল

মক্কার কিছু সম্মানিত ব্যক্তির উদ্যোগে তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ সন্ধি সংঘটিত হওয়ার সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল বিশ বছর। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন নির্জীব এবং নিদ্রামগ্ন যুগেও কিছু মানুষের হৃদয় জাগ্রত ছিল।[২২০]

এই সন্ধির মূলকথা তো ছিল, কুরাইশরা ইতোপূর্বে অহেতুক রক্তপাতে লিপ্ত হতো। তারা ন্যায়সঙ্গত সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন। তা ছাড়া এর তাৎক্ষণিক একটি কারণ ছিল যে, বনু জুবাইদ গোত্রের এক ব্যবসায়ী তার পণ্য নিয়ে মক্কায় আসে। জনৈক কুরাইশ-সরদার আস বিন ওয়াইল তার সব পণ্য ক্রয় করে নেয়; কিন্তু কোনো মূল্য পরিশোধ করে না। জুবাইদি ব্যবসায়ী অতিষ্ঠ হয়ে মক্কাবাসীর সাহায্য চায়। তখন কিছু সরদারের হৃদয়ে দয়া জাগ্রত হয়।

নবীজির চাচা জুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিবের অনুমতিক্রমে তারা আবদুল্লাহ বিন জুদআন নামক সরদারের বাড়িতে একত্রিত হয়। তখন তাদের মাঝে চুক্তি হয় তারা জালেমের মোকাবেলায় এবং মজলুমের সাহায্যে প্রত্যেকেই পরস্পরের সহযোগী হবে। যিলকদ মাসে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত শান্তিচুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ তিন ব্যক্তির নাম ছিল ফযল, ফাযালা এবং মুফাযযাল; এজন্য তার নাম পড়ে যায় 'হিলফুল ফুযুল'।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই চুক্তির মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তাদের এই ইনসাফপূর্ণ কথা ও স্বীকারোক্তিতে তিনি অনেক খুশি হন। পরবর্তীতে নবীজি বলেছিলেন, 'এই সন্ধির পরিবর্তে আমাকে যদি লাল উটও দেওয়া হতো, আমি তা গ্রহণ করতাম না।

---

[২২০] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১২৮। উক্ত রেওয়ায়েতের উপর এই আপত্তি তোলা ভিত্তিহীন হবে যে, 'জুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব সে-সময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর তার মৃত্যু হয়েছিল নবীজির নবুওয়াতপ্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্বে।' কারণ, বংশধারা সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ইমাম বালাযুরি বলেন, জুবাইর যখন মারা যান, তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ছিল ত্রিশোর্ধ্ব।' [আনসাবুল আশরাফ- ২/২০]

আজও যদি কেউ এমন সন্ধি করার দাওয়াত দেয়, আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত।[২২১]

ঈর্ষণীয় তারুণ্য, ব্যবসা ও বিয়ে

নিজের পুঁজি না থাকায় অন্যের পুঁজি বিনিয়োগ করে লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসা করতে থাকেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার বয়স যখন পঁচিশ, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ধনদৌলত দিয়ে সম্পদশালী বানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ নামের কুরাইশের একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ লোকদেরকে নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় নিয়োগ দিতেন। আর লভ্যাংশ থেকে পর্যাপ্ত বিনিময় প্রদান করতেন। তিনি নবীজির আভিজাত্য, দীনদারি এবং আরো গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করে তাকে নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করার জন্য শামদেশে পাঠান।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনদারি ও নৈতিকতার কারণে ব্যবসায় অনেক মুনাফা অর্জিত হয়। পাশাপাশি তার বহু গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও খাদিজা জানতে পারেন। তার কার্যক্রমে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এর আগে বড় বড় শরিফ ও সরদাররা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাব কবুল করেন। চাচা আবু তালেব বিবাহ পড়ান। এ সময় নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদিজার ছিল চল্লিশ বছর।[২২২]

বৈবাহিক জীবন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃস্ব ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে বৈবাহিক জীবনের সাথে সাথে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছিলেন। ওদিকে হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমন জীবনসঙ্গী লাভ

---

[২২১] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১২৮, আল-মুসতাদরাক, হাকিম- ২৮৭০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৩/৪৫৫-৪৫৯, মিরআতুয যামান, সিবতু ইবনুল জাওযি- ৩/৭৯

[২২২] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৮৭-১৯২। এটিই প্রসিদ্ধ। তবে ঐ সময় খাদিজা রা. এর বয়স ৩৫ও কারো বক্তব্যে এসেছে; এটা অনেকটাই যৌক্তিক।

করেছিলেন যে, তিনি যতই এ নিয়ে গর্ব করতেন, মনে হতো হক আদায় হচ্ছে না। তিনি নিজের ধনসম্পদ, জায়গা-সম্পত্তি এবং ব্যবসায়িক পুঁজি সবই নবীজির খেদমতে সঁপে দেন। নবীজির সন্তুষ্টিই ছিল তার সন্তুষ্টি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর ঘরেই বসবাস করতে থাকেন। সেই ঘরে দুটি বেডরুম এবং মেহমানখানা ছিল। এই বরকতময় ঘরেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনের আটাশটি বছর কাটিয়েছেন।[২২৩]

নবীজির খেদমতে তখনও সেই হাবশি বাঁদি বারাকাহ নিয়োজিত ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা ছিলেন।'

উম্মে আইমান নবীজি থেকে দশ-এগারো বছর বড় হবেন। তিনি নিজের বিয়ের সময় বাঁদির পড়ন্ত বয়স এবং পূর্বের অবদানের কথা চিন্তা করে কেবল তাকে আজাদই করে দেননি, বরং একজন অমায়িক মানুষ হারিস বিন যায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। ফলে তিনিও নিজ স্বামীর ঘরে স্থির হয়ে যান। তার একটি ছেলে হয়, যার নাম রাখেন আইমান। তখন থেকেই ছেলের নামের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে বারাকার পরিবর্তে উম্মে আইমান বলে ডাকা হয়।[২২৪]

হজরত যায়েদ বিন হারিসার দায়িত্বগ্রহণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়াও আরেকজন ছিল। সে বনু কালবের হারিয়ে যাওয়া ছেলে যায়েদ বিন হারিসা। দুশমনরা তার কবিলার উপর হামলা করে তাকে ছিনতাই করে উকাজ বাজারে নিয়ে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তার বয়স ছিল তখন মাত্র আট বছর। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু

---

[২২৩] কিছু ওয়েবসাইটের তথ্যমতে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় খোদাই করে জায়গাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার (লেখকের) তা বিশ্বাস হয় নাই।

[২২৪] আলইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি- ৮/৩৫৮ (উম্মে আইমানে রা. জীবনী)

আনহার ভাতিজা হাকিম বিন হিযাম তাকে খরিদ করে চাচিকে দিয়ে দেন। নবীজির সঙ্গে যখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়, তখন তিনি যায়েদকে তার খেদমতের জন্য প্রদান করেন।[২২৫]

এক সময় যায়েদের পিতা হারিসা জানতে পারেন যে, তার হারানো সন্তান কুরাইশ গোত্রে গোলাম হিসেবে আছে। তিনি সোজা মক্কায় উপস্থিত হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুনয়-বিনয় করে তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং তার মুক্তিপণও পেশ করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যায়েদকে জিজ্ঞেস করুন। সে যদি যেতে চায়, তা হলে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই আপনি নিয়ে যান। আর সে যদি না যেতে চায়, তা হলে জোর করে তাকে পাঠাবো না।'

যায়েদকে ডাকা হলো। তখন তিনি পিতার সাথে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি নবীজিকে ছাড়া কারো সঙ্গে থাকা পছন্দ করি না।'

পিতা হতভম্ব হয়ে বললেন, বেটা, মুক্তজীবনের তুলনায় তুমি গোলামির জিন্দেগি বেছে নিচ্ছো?

যায়েদ বললেন, জি বাবা! আমি নবীজির মাঝে যে উত্তম গুণাবলি প্রত্যক্ষ করেছি, এগুলো ছাড়া আমার অন্য কিছু পছন্দ নয়।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি যায়েদের মহব্বত দেখে খুব মুগ্ধ হন আর তখনই মসজিদে হারামে গিয়ে ঘোষণা দেন যে, 'আমি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

যায়েদের পিতা এই দৃশ্য দেখে আশ্বস্ত হন এবং নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান।

হজরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে থাকতেন; কিন্তু এ ঘোষণার পর থেকে তার এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন যে, লোকেরা তাকে 'যায়েদ বিন মুহাম্মদ' বলে ডাকতে থাকে।[২২৬]

---

[২২৫] উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসির জাজারি- ২/৩৫০ (যায়েদ বিন হারিসার জীবনী)
[২২৬] উসদুল গাবা, ইবনুল আসির জাজারি- ২/৩৫০ (যায়েদ বিন হারিসার জীবনী)

নবীজির পারিবারিক জীবন

বিয়ের পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সময়টি ছিল নবীজির জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও সিরাতের কিতাবসমূহে খুব সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা এসেছে। এই পনেরো বছর নবীজি তারুণ্যদীপ্ত কর্মযজ্ঞ, সমাজকল্যাণ এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যদিয়ে একটি ব্যস্ততম সময় পার করেছেন। যেহেতু তার জীবিকার মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য; তাই লেনদেন কার্যক্রমের জন্য তাকে দিনভর বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হতো।

ব্যবসায়ী জীবন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে তার সুনাম-সুখ্যাতি তুঙ্গে ছিল। পুরো মক্কাতে তার চেয়ে সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমান, সম্মানিত, উত্তম চরিত্রবান কেউ ছিল না। সকলেই তার সততা, দীনদারির কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র আমানত রাখার জন্য নবীজিকেই তারা বিশ্বস্ত মনে করত। সবাই তাকে 'সাদিক' এবং 'আমিন' বলে ডাকত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং ওয়াদা-রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মক্কার অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন আবুল হামসা নামক এক ব্যক্তির সাথে নবীজির কিছু লেনদেন হয়। তখন আবদুল্লাহর কাছে ঋণ পাওনা হন। সে বলে, 'আপনার পাওনা আমি এখানে এনে পরিশোধ করে দিচ্ছি'- বলে সে তার বাড়ি চলে যায়। সে তার ওয়াদা পূরণের কথা ভুলে যায়। তৃতীয়দিন তার স্মরণ হতেই সে ঐ জায়গায় গিয়ে দেখে নবীজি সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কেবল এটুকু বললেন, 'যুবক, তুমি আমাকে ক্লান্ত করে ফেললে।'[২২৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌথব্যবসাও করেছেন। আবু সাইব এবং কায়েস বিন সাইব নামে দুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার ব্যবসায়ে পার্টনার ছিল। তারাও নবীজির দীনদারি এবং সুন্দর লেনদেনের স্বীকারোক্তি দেয়।[২২৮]

---

[২২৭] উসদুল গাবা, ইবনুল আসির জাজারি- ৩/২১৮ (আবদুল্লাহ বিন আবুল হামসা-এর জীবনী)

[২২৮] আলইসতিয়াব, ইবনু আবদুল বার- ৩/১২৮৮

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য নিয়ে মক্কার বাইরেও যেতেন। মক্কার উত্তর-পূর্বে তায়েফের নিকটবর্তী সুপ্রসিদ্ধ 'উকাজ' বাজার। এখানে ব্যবসা ছাড়াও কবিতা আবৃত্তি এবং গল্পের আসর জমে উঠত। বিভিন্ন কবিলার ঝগড়াঝাটির ফয়সালাও এখানে হতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য নিয়ে এই বাজারেও গমন করতেন।[২২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর বিন আবু কুহাফা স্বভাব-প্রকৃতি, ধ্যানধারণা, অভ্যাস- সব গুণেই নবীজির সঙ্গে তার মিল ছিল। পাশাপাশি উভয়ে একই পেশার লোক ছিলেন। মূর্তিপূজা, মদপানসহ অন্যান্য মন্দ স্বভাব তিনি একদম পরিহার করে চলতেন।[২৩০]

ঐ পনেরো বছরের দিনলিপির এরচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এটুকু বুঝা যায় যে, পুরো দিন তার ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই কেটে যেত। আর একাকিত্বে তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরত, দুনিয়ার সূচনা, ব্যবস্থাপনা এবং আপন কওমের অবস্থা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন।

কাবা শরিফ নবনির্মাণ

কুরাইশ যখন মক্কা শরিফ নতুনভাবে নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করে, ততদিনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁয়ত্রিশের কোটা পেরিয়ে গেছে।[২৩১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা

---

[২২৯] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/১৮৬

[২৩০] আসসিরাতুল হালাবিয়্যাহ- ১/৩৮৯; তারিখুল খুলাফা- পৃষ্ঠা ২৯

[২৩১] তাবাকাতে ইবনে সাদ গ্রন্থের দুই রেওয়ায়েত: 'কুরাইশরা নবীজির উপর ওহি অবতরণের পাঁচ বছর পূর্বে কাবা নির্মাণ করেছে।' (৩/৩৮১) এবং 'কুরাইশরা যখন কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করে তখন নবীজির বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ ছিল।' (৮/১৬)- একত্র করলে উল্লিখিত কথাই পাওয়া যায়।

মুসনাদ আহমাদের রেওয়ায়েত: 'সোমবার হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেছেন' (হাদিস নং ২৫০৬) এর আগ-পিছের বর্ণনাভঙ্গি বলে যে, ঘটনাটি রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ নির্ধারণ করে দেয়। কারণ, ঐ বর্ণনায় আসা অন্যান্য ঘটনাও এই তারিখেই ঘটেছে।

আব্বাসের সঙ্গে নির্মাণকাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারা পাহাড় থেকে পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন।[২৩২] নির্মাণ আরম্ভ হওয়ার পর দেওয়ালের গাঁথুনি যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে এবং এই মোবারক পাথর স্থাপনের সময় হয়, তখন নির্মাণকাজে অংশগ্রহণকারী সব গোত্র প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত হয়; প্রত্যেকেই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়।

বনু আদি এবং বনু আবদুদ দারের ক্রোধ-ক্ষোভ এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা আরবের যুদ্ধপ্রতিজ্ঞার নিয়মানুযায়ী রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে এ মর্মে কসম খায় যে, তাদেরকে যদি হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করার সুযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে তারা সবাই মিলে অধিকার আদায়ে যুদ্ধ করতে করতে জান দিয়ে দেবে। ওদিকে তাদের প্রতিপক্ষদের গোসসাও কম ছিল না। পরিস্থিতি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

এ সময় কিছু দূরদর্শী বিচক্ষণ লোক তাদেরকে বুঝিয়েসুজিয়ে শান্ত করতে সক্ষম হয় এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মসজিদে হারামে এখন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে, সে-ই বর্তমান সংকট নিরসন করবে। তখন লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই সমস্বরে বলতে থাকে, 'মুহাম্মদ আল আমিন (বিশ্বস্ত মুহাম্মদ) এসে গেছে। আমরা তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকট মোকাবেলায় একটি চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাদেরকে একটি চাদর আনতে বললেন। চাদরের মধ্যখানে হাজরে আসওয়াদ রেখে প্রতিটি কবিলার একজন নির্বাচিত ব্যক্তিকে চাদরের এক কোনায় ধরার জন্য বললেন। সবাই মিলে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজহাতে তা কাবায় স্থাপন করেন। এভাবেই অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও ইনসাফের সঙ্গে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে উম্মত বেঁচে যায়।[২৩৩]

---

[২৩২] সহিহ বুখারি- ৩৮২৯ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু বুনয়ানিল কাবা)
[২৩৩] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/১৯০-১৯৯

ঘরোয়া দায়িত্ব

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঘরের দায়িত্বও কম ছিল না। তার ছিল তিন কন্যা- যায়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম তার বিয়ের বয়সে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদেরকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছিল। আরবের এমন বিকৃত পরিবেশ এবং নষ্ট সমাজে বর খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের পঞ্চম বছরে হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্ম হয়। অষ্টম বছরে হজরত রুকাইয়ার জন্ম। এরপর যথাক্রমে উম্মে কুলসুম ও ফাতেমার জন্ম হয়। ফাতেমাই ছিলেন নবীজির সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। তিনি নবীজির বিয়ের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৪]

চারকন্যার পিতা হওয়ার পর নবীজির দায়িত্ব কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা কন্যাসন্তানের পিতামাত্র অনুধাবন করতে পারে।

এ সময়ের মধ্যে নবীজির দুজন পুত্রসন্তানও হয়- কাসিম ও আবদুল্লাহ। কাসেমের দিকে সম্বন্ধ করেই নবীজিকে 'আবুল কাসিম' উপনামে ডাকা হয়। আর আবদুল্লাহ 'তাইয়িব' ও 'তাহির' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২৩৫]

যায়েদ বিন হারিসার সঙ্গে উম্মে আইমানের বিয়ে

এদিকে হজরত উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের মর্যাদা দিতেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিয়োগ সইতে পারছিলেন না। আবার এই বয়সে তার দেখাশোনার জন্য একজন লোকেরও প্রয়োজন ছিল। তিনি হাবশি ছিলেন। আরবে তার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। এই বয়সে তাকে বিয়ে করতেও কেউ আগ্রহী হবে না। এই অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসা তাকে বিয়ে করার জন্য রাজি হয়ে যান।

---

[২৩৪] তাবাকাতে ইবনে সাদে এভাবে এসেছে, কুরাইশ যখন কাবা পুনর্নির্মাণ করে, অর্থাৎ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে ফাতেমা জন্মগ্রহণ করেন।' (৮/১৯-৩৮)

[২৩৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/১৩৩। কিছু কিছু সিরাত-লেখকের কাছে 'তাইয়িব' এবং 'তাহির' দুই ছেলে ছিল। তবে এটি তাহকিক পরিপন্থি।

উম্মে আইমানের সঙ্গে যায়েদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যায়েদ যদিও টগবগে তরুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি উম্মে আইমানের সঙ্গে সুন্দর জীবনযাপন করেন। উম্মে আইমানের মরহুম স্বামীর ছেলে আইমানও তার সঙ্গে ছিল। তাদের পরিবারটি নবীজির পূর্ণ দায়িত্ব ও পরিবারভুক্ত ছিল।[২৩৬]

সৃষ্টির সেবা : নবীজির অনন্য বৈশিষ্ট্য

ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর ও পারিবারিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল সৃষ্টির সেবা করা। তিনি আল্লাহর দেওয়া ধনদৌলত, ইজ্জত-সম্মান, চিন্তাফিকির ও বুদ্ধিমত্তার নেয়ামতগুলো তার বান্দাদের কল্যাণে অকাতরে ব্যয় করতেন। ক্ষুধার্ত মানুষদের খাওয়ানো, বিধবা নারীদের সাহায্য করা, অভাবী লোকদের চাহিদা পূরণ করা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। অতিথিদের সম্মানে কোনো সৌজন্যমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকতেন না।

বনু হাশিমের অভাবী পরিবারগুলোর প্রতি তার বিশেষ সহযোগিতা জারি ছিল। তার চাচা আবু তালিব, যিনি তাকে দেখভাল করেছেন, তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছেলের প্রতি বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। তাদেরকে ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন করতেন। তাদের মধ্যে আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশ বছর, জাফর বিশ বছর এবং আলি ত্রিশ বছর ছোট ছিলেন। একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের পরিবারে নিয়ে নেন এবং তিনি নবীজির কোলেই হেসে-খেলে প্রতিপালিত হন।[২৩৭]

বনু হাশিমের সূর্য

পরিবারের দায়িত্ব এবং ব্যবসায়িক ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনি নিজ বংশ বনু হাশিমের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে অংশগ্রহণ করতেন। বনু হাশিমের

---

[২৩৬] উসদুল গাবাহ- ৮/২৯০, আলইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি- ৮/৩৫৮ (উম্মে আইমান রা. এর জীবনী)

[২৩৭] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৪৫, ২৪৬; উসদুল গাবাহ- ১/৫৪১; (জাফর রা. এর জীবনী), ৪/৬১ (আকিল রা. এর জীবনী)

খুঁটি হিসেবে ছিলেন তখন চাচা আবু তালেব, আবু লাহাব, আব্বাস এবং হামজা।

আবু তালিব ছিলেন বয়স্ক এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিভাবক। আবু লাহাব কঠোরপ্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও নবীজির সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। নবীজি তার দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা এবং উতাইবার সঙ্গে দেন।[২৩৮]

চাচা হজরত আব্বাস নবীজির তিন বছরের বড় ছিলেন এবং তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন। তিনি উচ্চ স্বরধ্বনির অধিকারী প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। জমিদারি তার পেশা ছিল। সচ্ছল জীবনযাপন করতেন। আবদুল মুত্তালিবের পর কাবার পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার এবং হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতেন।[২৩৯]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ চাচা হামজা তার থেকে মাত্র দুই বছরের বড় ছিলেন। তিনি আবু লাহাবের বাঁদি সুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। এদিক থেকে তিনি নবীজির দুধভাইও ছিলেন। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন। অভাবীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তিরন্দাজি এবং তরবারি চালনায় তার কোনো জুড়ি ছিল না। সফর ও শিকার তার ব্যস্ততা ছিল।[২৪০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাও বনু হাশিমের একজন বড় নারীব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নবীজির সমবয়সি ছিলেন। তার বাহাদুরি ও সাহসিকতা ছিল প্রবাদতুল্য।[২৪১] বনু হাশিমের মতো এমন বড় খান্দানের মধ্যে নবীজির মর্যাদা ছিল সূর্যের ন্যায়। অন্তত এটা সবার জানা ছিল যে, বনু হাশিমের নেতৃত্ব নবীজির ভাগ্যেই জুটবে। কিন্তু কারোই কল্পনা ছিল না যে, তার বিরলপ্রজ নামের সাথে উভয়জাহানের নেতৃত্ব লিখে দেওয়া হয়েছে।

---

২৩৮ আলজাওহারা ফি নাসাবিন নাবিয়্যি ওয়া আসহাবিহিল আশারাহ, আল্লামা বাররি তিলমিসানি (মৃত্যু ৬৪৫ হিজরি): ২/৪৪ (দারুর রিফাই সংস্করণ, রিয়াদ)

২৩৯ আলইসতিয়াব, ইবনু আবদুল বার- ২/৮১১ (দারুল জীল সংস্করণ)

২৪০ তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/৯৫, ৩/১৩; আনসাবুল আশরাফ- ৪/২৮৫ (দারুল ফিকর, বৈরুত সংস্করণ)

২৪১ আলইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি- ৮/২১৩

নবুওয়াতের আমানত যখন অর্পিত হলো

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর হওয়ার পরপরই তার ধ্যান, অনুভব-অনুভূতির মধ্যে গভীরতা আসে। তিনি দেখতে পান পুরো পৃথিবী ধ্বংস ও বরবাদির পথে হাঁটছে। এখনই যদি তাদের সংশোধনের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তা হলে সমগ্র মানবজাতির অবস্থা খুবই নাজুক আকার ধারণ করবে। এই চিন্তা-ফিকির ছাড়াও তার মধ্যে আশ্চর্য ধরনের এক অজানা বেচাইনি ও অস্থিরতা অনুভব হতো। বিগত সাত বছর যাবৎ তিনি মাঝেমধ্যেই ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন, অদৃশ্যের নুরের ঝলকও দেখতে পেতেন।[২৪২] তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পনা ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা তাকেই সর্বশেষ রাসুলের মর্যাদা দান করবেন।[২৪৩]

এই অবস্থা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকিত্ব-বান্ধব করে তোলে। ফলে তিনি মক্কার পাহাড় ও বিরানভূমিতে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য স্বপ্ন দেখানো হতো। কখনো কখনো উপত্যকা অতিক্রম করার সময় বৃক্ষ ও পাথর থেকে আওয়াজ শুনতেন 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ'। তখন তিনি পেছন ফিরে তাকাতেন। তখন কাউকে দেখা যেত না।[২৪৪]

---

[২৪২] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা কাসাস, আয়াত ৮৬

[২৪৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস ৬২৫০ (কিতাবুল ফাজাইল)

[২৪৪] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৩৪। সে সময় কিছু পাথর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সালাম দিত, তিনি তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেন। (সহিহ মুসলিম- হাদিস ৬০৭৮) এই আলামতগুলোকে সিরাত-লেখকগণ 'ইরহাসাত' বলে ব্যক্ত করেন।

জিনদের আসমান-গমন নিয়ন্ত্রণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহি নাজিল শুরু হওয়ার পূর্বেই তা সংরক্ষণ করার সকল ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়। ইতোপূর্বে জিন-শয়তানরা আসমানের নিকটবর্তী হয়ে ফেরেশতাদের নিকট আসা বিধান এবং সংবাদ শুনে ফেলত। পৃথিবীতে এসে তারা গণক ও জাদুকরদের এগুলো অবগত করত। আর এরা একটার সাথে দশটা মিথ্যা মিশ্রণ করে মানুষকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে ধোঁকা দিত। সর্বশেষ কিতাব নাজিল হওয়ার পূর্বেই জিনদের আসমানের নিকটবর্তী হওয়া এবং সংবাদ আহরণ করার উপর প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো। যদি কোনো জিন আগের মতো সেদিকে যায়, তা হলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়।

এই পরিস্থিতি দেখে জিনদেরও অনুমান হয়ে যায় যে, শীঘ্রই পৃথিবীতে বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এক জ্যোতিষীর বক্তব্য হলো (যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন), আমার কাছে এক পেত্নী আসত। একদিন সে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলতে থাকে,

ألم تر الجنَّ وإبلاسَها، ويأسها من بعد إنكاسها، ولحوقها بالقِلاص وأحلاسها

> কী, তুমি জিন ও তাদের পেরেশানি দেখোনি? তাদের হতাশা এবং অপদস্থতা, উটের চটের নিচে তাদের আশ্রয় নিতে দেখনি?[২৪৫]

পৃথিবীর এমন পরিবর্তনের কারণে জিনেরাও বুঝতে পেরেছিল যে, শেষনবীর আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল—যেমনিভাবে প্রবল বৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে বাতাস থমকে থাকে, তেমনি অহি নাজিলের পূর্বে যেন পুরো সৃষ্টি নির্জীব স্থবির হয়ে আছে।

---

[২৪৫] সহিহ বুখারি- ৩৮৬৬ (বাবু ইসলামি উমর রা.)

প্রথম অহি

(নবুওয়াতের ১ম বর্ষ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধ্যানমগ্নতার জন্য মক্কা থেকে দূরে হেরাগুহাকে বেছে নেন। নবীজির বয়স তখন চল্লিশ বছর। একাকী থাকা অবস্থায় একদিন তার সামনে এক ফেরেশতা আবির্ভূত হলেন।[২৪৬]

---

[২৪৬] ওহি নাজিল শুরুর প্রসঙ্গে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। ক্যালেন্ডারের হিসাবেও মতানৈক্য চলে আসছে। তবে সোমবার ওহি নাজিল হওয়ার ব্যাপারে সকলেরই মতৈক্য রয়েছে। সহীহে হাদিসে আছে, 'তাঁকে সোমবার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, এদিন আমি জন্ম নিয়েছি এবং এদিনই আমার ওহি নাজিল (শুরু) হয়।' সহিহ মুসলিম- ২৮০৭; কিতাবুস সাওম, বাবু ইসতিহবাবি সাওমি ছালাছাতি আইয়্যাম মিন কুল্লি শাহর]

সে সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর, এতেও কারো দ্বিমত নেই। শামায়েলে তিরমিজির (আরো অনেক মুহাদ্দিস এই হাদিস টি বর্ণনা করেছেন) এক সহিহ হাদিসে আছে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁকে চল্লিশ বছরের শুরুভাগে নবুওয়াত প্রদান করেন।' সাথে সাথে এতেও কারো মতানৈক্য নেই যে, নবুওয়াতের তেরো বছর পর হিজরত হয়েছে।

মাস এবং তারিখ নিয়ে হলো অধিক মতানৈক্য। প্রসিদ্ধ মত হলো রবিউল আওয়াল মাসে ওহি নাজিল শুরু হয়েছে। কারণ, ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়েত আছে, 'রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়স যখন চল্লিশ, তখন তার উপর ওহি নাজিল হয়'। [সহিহ বুখারি- কিতাবুল মানাকিব-বাবু মাবআসিন নাবী] আর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মতারিখ হয় ১২ রবিউল আওয়াল, তাই চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নবুওয়াতের দিনও ১২ রবিউল আওয়াল নির্ধারিত হয়ে যায়। ১২ তারিখের পক্ষে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি ভারি দলিল: 'রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ সোমবার হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছরে জন্মগ্রহণ করেন। এ তারিখেই তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, এ তারিখেই তিনি হিজরত করেন এবং ওফাত বরণ করেন।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩৭৫- ইবনে আবি শাইবার সূত্রে]

কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি রহ. বলেন, নবুওয়াতের বছর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার হয় না, বরং ৯ রবিউল আওয়াল হলে সোমবার হবে। তাই ৯ তারিখই সুনির্দিষ্ট। এজন্য জন্ম-মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ৯ তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [রাহমাতুল লিল আলামিন- ১/৬৯, ৭৫, ২৪২]

কিছু কিছু পঞ্জিকাবিশেষজ্ঞের নিকট সোমবার ৯ তারিখ নয়; ৮ রবিউল আওয়াল হয়, আর এটিই নবুওয়াতপ্রাপ্তির তারিখ। [তাকউয়িম আহদি নববি, আলি মুহাম্মদ খান, পৃষ্ঠা ৮০] উপর্যুক্ত উভয়পক্ষই ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ ৯ ফেব্রুয়ারি হওয়ার ব্যাপারে একমত।

অপরদিকে এক শ্রেণির নিকট নবুওয়াত এবং জন্ম উভয়টিই রমজান মাসে হয়েছে। রমজান মাসে নবীজির জন্ম হওয়ার ব্যাপারে তাদের দলিলসমূহ পিছনে আমরা টীকায় উল্লেখ করে এসেছি। তারা সহিহ বুখারির ঐ হাদিস কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন, চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী চল্লিশ বছর পূর্ণ হতেই রমজান মাসে ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। রমজানে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হওয়ার দলিল হিসেবে তারা সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত (شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن) এবং সুরা আনফালের ৪১ নং আয়াত (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) পেশ করেন। (يوم التقى الجمعان) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গাজওয়ায়ে বদর, আর এটি সংঘটিত ১৭ রমজানে। (وما أنزلنا على عبدنا) অনুযায়ী (يوم الفرقان) কুরআন নাজিলের দিন হয়। আর কুরআন নাজিলের দিনও সেই সতেরো রমজান। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- ২/১৩০]

হাফেজ ইবনে কাসির রমজানের নবুওয়াতপ্রাপ্তির মতটিকে প্রসিদ্ধ মত বলে ব্যক্ত করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬] ইবনে ইসহাকের কাছে এটিই অগ্রগণ্য মত। [সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১৩০]

ওয়াকিদি ইমাম বাকের রা. থেকে ১৭ রমজানে নবীজির নবুওয়াতপ্রাপ্তির বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১৬]

হজরত ইবনে আব্বাসের উপর্যুক্ত বক্তব্যটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা-ই হোক, ইবনে কাসির রহ. তা উল্লেখ করার পর মুনকাতি বলে তার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উপর্যুক্ত রেওয়ায়েত এবং অভিমতগুলো সামনে রেখে পঞ্জিকার সাহায্যে সম্ভাব্য আরো কিছু তারিখ বর্ণনা করেছেন, এত সংখ্যক বক্তব্য থেকে অধিক উপযুক্ত মত চেনা বড় দুষ্কর। কিছু কিছু মত গ্রহণ করলে নবুওয়াত ও হিজরতের মাঝে ১৩ বছরের স্থানে ১৪ বছরেরও অধিক সময় হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের মত গ্রহণ করলে ১৩ বছর ছ'মাস হয়ে যায়। অথচ ১৩ বছরের ব্যাপারে সকলেই একমত। আর কিছু মত গ্রহণ বুখারির (ابن أربعين) এবং তিরমিজির (على رأس أربعين سنة) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ এমন একটি মতও নেই, যার মধ্যে সকল শর্ত রয়েছে, আর তা গ্রহণ করলে কোনো আপত্তিও থাকে না।

আমার (লেখকের) অভিমত হলো, যদি নবুওয়াতের সময়টি ১৯ মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ ধরা হয়, তা হলে তুলনামূলক কম আপত্তি উত্থাপিত হয়। (মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হিজরতের মাস সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে ১৩ বছর চার মাস হয়।) ভাংতি মাসগুলো ফেলে দিলে এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না। এই মতটি গ্রহণ করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় মানা আবশ্যক।

তিনি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সর্বশেষ রিসালাত এবং সমগ্র পৃথিবীর পথনির্দেশের দায়িত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সঁপে দিতে এসেছিলেন। তিনি এসেই নিজের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, 'হে মুহাম্মদ, আমি জিবরিল, আর আপনি আল্লাহর রাসুল।' এরপর ফেরেশতা সুরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

'পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[২৪৭]

এটাই ছিল সর্বশেষ উম্মতের প্রতি আখেরি নবীর মাধ্যমে প্রেরিত প্রথম আসমানি বার্তা। যাতে বলা হচ্ছিল—পড়া, লেখা, রবের জিকির করা, তার কুদরত নিয়ে গভীরভাবে ভাবা, তার দয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা, ইলম

---

১ নবীজির জন্ম মক্কি রমজান মোতাবেক মাদানি রবিউল আওয়াল ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে হওয়া।

২ চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্তি থেকে উদ্দেশ্য মক্কি পঞ্জিকা অনুযায়ী চল্লিশ বছর।

এবার লক্ষ করুন, ১৯ মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের মক্কি রমজানের ৯ তারিখ সোমবার পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত প্রকারগুলো তার অনুরূপ তারিখের সাথে মিলে যায় :

১. যে রেওয়ায়েত সোমবার দিন নবুওয়াতপ্রাপ্তির দলিল।

২. যে রেওয়ায়েত রমজান মাসে নবুওয়াতপ্রাপ্তিকে সমর্থন করে।

৩. যে রেওয়ায়েতে (ابن أربعين) কিংবা (على رأس أربعين سنة) শব্দ রয়েছে।

৪. যে রেওয়ায়েতে নবুওয়াতের ১৩ বছর পর হিজরতের কথা উল্লেখ আছে। বাকি থাকে রবিউল আওয়াল মাসে নবুওয়াতপ্রাপ্তি সম্পর্কে হাদিস গুলোর কথা। আলি মুহাম্মদ খান রহ. এর গবেষণা মোতাবেক ১৯ মে ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের দিন আরবের তৃতীয় ক্যালেন্ডার 'সৌর, চন্দ্র এবং বসন্ত' এর ৯ রবিউল আওয়ালের নিয়ম অনুযায়ী হয়। এভাবে আলহামদুলিল্লাহ উপর্যুক্ত সব মত ও রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। (আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত)

[২৪৭] সহিহ বুখারি- ৩ (বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওহি), সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১২১ (দারুল ফিকর সংস্করণ)

বা জ্ঞানকে নিজের যোগ্যতার মাপকাঠি বানানো এবং কলমের মাধ্যমে ইলমের নির্দেশনা প্রচার করা মূল সংবিধানে পরিণত হলো।

পৃথিবীতে ইলম ও কলমের ধারণা

পৃথিবীর অবস্থা তখন এমন ছিল যে, সভ্য কওমগুলো পর্যন্ত কলমের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা রাখত না। প্রাচ্যের চীনকে দেখুন, তৎকালে তাং বংশের জনক লিউ আন শাসন করছিল। তারপর তাই শাং মসনদে বসে। এবং ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে। ভারতে মহারাজা হর্ষ বর্ধন ক্ষমতাসীন ছিল। তার ক্ষমতাকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

প্রাচ্যের তাহজিব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এই দুই বড় কেন্দ্রেও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে ধ্যানধারণার অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। পাথর কর্তন, নাচগান, ধ্যানমগ্নতা এবং নীরবতাকে তারা কলমচর্চার উপর প্রাধান্য দিত। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে বার বার গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব ছিল। তারা মূর্তিপূজারি ছিল। পশ্চিমা বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তৎকালে বৃটেনে অ্যাংলো সেকসন গোত্রগুলোর বাদশাহদের অধীন শাসন চলত। তাদেরই অধীনস্থ কিং এডার্ন ৬০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে। কিন্তু এ যুগটি ছিল বৃটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের পশ্চাদপদ আর বিজ্ঞানচর্চাশূন্য। স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে নিম জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর রাজত্ব ছিল। পরবর্তীতে তারাই বৃটেনের মসনদে ক্ষমতার পালাবদল করত।

ফ্রান্সে সম্রাট প্রথম ডেকোর্ট (৬২৮-৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) আপ্রাণ চেষ্টা করার পরেও নিজের বিলুপ্তপ্রায় রাজ্যের ভীত মজবুত করতে পারেননি। ইটালিতে 'গোথ' বংশের শাসক সায়বার্টের রাজত্ব চলছিল। তার সময়েই ইটালিতে ইহুদিদের বার বার ব্যবহার করা হয়। উপর্যুক্ত রাজ্যগুলোতে উঁচু-নিচু সব স্তর পর্যন্ত অজ্ঞতা-মূর্খতার সয়লাব ছিল। ইউরোপের অধিকাংশ এলাকায় নার্মান, সুইডিশ, সেলানি এবং ক্রিশিন্সের মতো গণ্ডমূর্খ এবং গোঁয়ার কবিলাগুলোর দৌরাত্ম্য ছিল।[২৪৮]

---

[২৪৮] রাহমাতুললিল আলামিন- ১/৭৫, মাজাল্লাতুস সিরাহ, রমাজান ১৪২৪ হিজরি, পৃষ্ঠা ৯১-৯৩, (প্রফেসর নেসার আহমাদের প্রবন্ধ)

মোটকথা, যে ইউরোপ আজ জ্ঞানবিজ্ঞানে নেতৃত্বের দাবি করে, তাদের কিন্তু শত শত বছর পর্যন্ত জ্ঞান, গবেষণা এবং কলমচর্চার সাথে দূরতম সম্পর্ক ছিল না। অপরদিকে আরবের মতো এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত অঞ্চলে তাদের বহু পূর্বে জ্ঞানের আলোর প্রথম কিরণ 'ইকরা (পড়), 'আল্লামা' (তিনি শিখিয়েছেন), 'বিল কালাম' (কলমের সাহায্যে) এর মাধ্যমে আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলো এমন উদ্ভাসিত হয়েছিল, যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে এটি এমন এক বিপ্লবের সূচনাপর্ব, যা মানব-সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে অধ্যয়ন, শিক্ষাদান এবং কলমচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছিল।

গুরুদায়িত্ব

ফেরেশতা থেকে এই বার্তা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে পৌঁছান, তখন ভয়-ভীতি এবং জিম্মাদারির সীমাহীন অনুভূতির কারণে তার দেহ মোবারক কাঁপছিল। নবীজির মনে হচ্ছিল এই কাজের চিন্তাফিকির এবং গুরুভারের কারণে তার প্রাণবায়ূই হয়তো উড়ে যাবে। তিনি ঘরে পৌঁছেই প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরাকে বলতে লাগলেন, 'আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমার প্রাণ উড়ে যাবে মনে হচ্ছে।'[২৪৯]

স্ত্রীর অনুরোধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরাগুহার আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান নারী ছিলেন। তিনি তার প্রিয়তম স্বামীর অবস্থান ও মর্যাদা খুব ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজখবর নেন। সত্য কথা বলেন। অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করেন। নিঃস্বদের সহায়তা করেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের উপর আপতিত সকল বিপদে আপনি সাহায্য করেন।'

এরপর তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান। তিনি পূর্ববর্তী আসমানি

---

[২৪৯] এর থেকে বুঝা যায়, নবুওয়াতপ্রাপ্তির বছর গ্রীষ্মকালেই হয়েছে। অন্যথায় শীতকালে তো মানুষ সাধারণত উষ্ণ কাপড়ই পরিধান করে থাকে। এই পয়েন্টটি নবুওয়াত 'মে মাসে হয়েছে' -এ মতের পক্ষে যায়।

কিতাব অধ্যয়ন করতেন। হয়তো কোনো পরামর্শ ও পথনির্দেশ পাওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যে তার কাছে গেলেন।

ওয়ারাকা ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি এই উম্মতের নবী হবে। এ তো সেই ফেরেশতা, যে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলেন। দেখবে, একসময় তোমার কওম তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বড় পেরেশান হন যে, কুরাইশ তো আমাকে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত উপাধি দিয়েছে। এরপরও তারা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারে! তাই তিনি অবাক-বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, এরা কি আমায় বের করে দেবে?

ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তিই তোমার মতো এমন পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তার সঙ্গেই এমন দুশমনি করা হয়েছে। আর আমি যদি তোমার যুগ পাই, তবে অবশ্যই তোমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব।'[২৫০]

ওহি বন্ধ হওয়া এবং নবীজির বেচাইনি

এই ঘটনার পর কিছু সময় পর্যন্ত ফেরেশতা দ্বিতীয়বার অহি নিয়ে আসেননি। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই পেরেশান এবং অস্থির হয়ে মক্কার উপত্যকা এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে থাকেন। মনে কোনো প্রশান্তি ছিল না। প্রভু তার কাছ থেকে কী চান? এই গুরুদায়িত্ব তিনি কীভাবে আদায় করবেন? কিছুই তার জানা ছিল না। এমন পেরেশানি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মাঝেমধ্যে-ই গায়ব থেকে আওয়াজ আসত: নিঃসন্দেহে আপনি সত্য রাসুল'- তখন মনে কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করতেন। পরিশেষে এই আয়াত নাজিল হলো-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

হে চাদর আবৃত, উঠুন এবং সতর্ক করুন। আর আপনার প্রভুর বড়ত্ব প্রকাশ করুন।[২৫১]

---

[২৫০] সহিহ বুখারি- ৩ (বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওহি)
[২৫১] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত ১-৩

গোপনে দাওয়াত

(নবুওয়াত ১ম বর্ষ-৩য় বর্ষ)

উক্ত আয়াতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এবার কর্মপদ্ধতি পেয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালবিলম্ব না করে দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া শুরু করে দেন। সূচনা তিনি আপন ঘর থেকেই করেন স্ত্রীর মাধ্যমে। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম এই সত্যধর্ম গ্রহণ করেন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দশ বছর বয়স ছিল তখন। তিনিও তখন ইসলাম কবুল করেন। হজরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুও কোনোরূপ ইতস্ততভাব ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই তিনজনই ছিলেন ঘরের লোক। বাইরের পরিচিত লোকদের মধ্যে নবীজির বন্ধু হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম তার দাওয়াতে সাড়া দেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান ছিলেন। হজরত আবু বকর রা. নিজেও অত্যন্ত সম্মানিত ও অভিজাত ছিলেন। সেজন্য তিনিও তার পরিচিতজনদের এই দাওয়াত দিতে থাকেন।[২৫২]

ইসলামি দাওয়াতের ধরন কী ছিল?

ইসলামের সূচনালগ্নে দাওয়াত কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র স্বীকারোক্তির উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। তাওহিদ (একত্ববাদ) ও রিসালাত (নবুওয়াত)-এর এমন মৌলিক বার্তার মাধ্যমেই এই মহান দাওয়াতের সূচনা হয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র উদ্দেশ্য ছিল সকলকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তোলা যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। সবকিছুর মালিক আল্লাহ। সফলতা-অকৃতকার্যতা,

---

[২৫২] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৪০-২৪৯

সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মৃত্যু; সবই আল্লাহ তায়ালার হাতে। সবকিছু তার নির্দেশে হয়। তার নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া মাখলুক কিছুই করতে পারে না। মূর্তি, দেব-দেবীর কোনো ক্ষমতা নেই। সবকিছুর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ। তাই ইবাদতও কেবল তারই হওয়া উচিত।'

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ আল্লাহর সর্বশেষ রাসুল। তার সব কথা বিশ্বাস করা আবশ্যক। তার অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা। তার নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে রয়েছে উভয় জাহানের বরবাদি।'

যেহেতু মক্কার মুশরিক-সমাজে এই দাওয়াত একটি অপরিচিত বিষয় ছিল, কুরাইশ সরদারদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বাধা আসার আশংকা ছিল, তাই দাওয়াত গোপনে গোপনেই চলতে থাকে। সত্যানুসন্ধানী লোকেরা এই দাওয়াতের কথা শুনেই অনুভব করতে পারতেন যে, এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াতে উসমান বিন আফফান, জুবাইর বিন আওয়াম, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা বিন উবাইদুল্লাহর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মতো অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৫৩]

দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো কবিলা, কোনো বংশ নির্ধারিত ছিল না। বরং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেই দাওয়াত দেওয়া হতো, যাদের মধ্যে হক গ্রহণের আলামত দেখা যেত। এ কারণেই আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আরকাম বিন আবুল আরকাম, উবাইদা বিন হারিস, উসমান বিন মাজউন এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর মতো তরুণরা মুসলমান হয়ে যান। আর এভাবেই গোপন দাওয়াতের আওয়াজ মক্কার দুর্বল, দরিদ্র ও গোলামদের কাছে পৌঁছে যায়।[২৫৪]

উমাইয়া বিন খালফের হাবশি গোলাম বিলাল বিন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু

---

[২৫৩] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৫০-২৫২

[২৫৪] প্রাগুক্ত- ১/২৫২-২৫৪

আনহু একজন বিত্তবান মহিলার গোলাম ছিলেন এবং তিনি কামারের কাজ করতেন; তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিদেশি তরুণ ছিলেন; তিনিও মুসলমান হয়ে যান। হজরত ইয়াসিরের পরিবার ছিল অত্যন্ত নিঃস্ব। গোটা পরিবারই এ সময় মুসলমান হয়ে যায়। পরিবারে ছিলেন হজরত ইয়াসির, তার স্ত্রী সুমাইয়া এবং তার পুত্র আম্মার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।[২৫৫]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বালক ছিলেন। উকবা বিন আবু মুয়াইতের ছাগল চড়াতেন। একবার তিনি মাঠে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়েন এবং তাওহিদের দাওয়াত শুনেই তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।[২৫৬]

কুরআন করিমও ধারাবাহিক নাজিল হতে শুরু করে। ইসলামের দাওয়াতের শুরুর দিনগুলোতে আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজ শেখান। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার কাছে এসে অজু করেন এবং নামাজ পড়ে দেখিয়ে দেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, পবিত্রতা এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের এটি হলো শরয়ি পদ্ধতি। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্যান্য মুসলমানকে অজু ও নামাজ শিখিয়ে দেন।[২৫৭]

ইসলামি দাওয়াতে গোপনীয়তা রক্ষা এবং সতর্কতা

দাওয়াত প্রচারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি ছিল যে, তিনি কট্টরপন্থি এবং গোঁড়াপ্রকৃতির লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়। মুসলমানরাও এ তরিকা পুরোপুরি অনুসরণ করতেন। আবু লাহাব চাচা হলেও যেহেতু গোঁয়ার এবং কট্টর মুশরিক ছিল; তাই তাকেও এ বিষয়ে অবহিত করা হলো না। এর থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২৫৫] উসদুল গাবা, বেলাল, খাব্বাব এবং ইয়াসির রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[২৫৬] মুসনাদ আহমাদ- ৩৫৯৮, আলমুজামুস সাগির, তাবারানি- ১/৩১০ (দারু আম্মার সংস্করণ), আলইসাবাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর জীবন দ্রষ্টব্য।

[২৫৭] মুসনাদ আহমাদ, হাদিস ১৭৪৮০,(আর-রিসালাহ সংস্করণ), সহিহ বুখারি- হাদিস ৫২১ (কিতাবু মাওয়াকিতুস সালাহ)

ওয়াসাল্লামের গভীর চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের যোগ্যতা অনুমান করা যায়।

বনু হাশিমের শীর্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল চাচা আবু তালিবই এই দাওয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনিও ঘটনাক্রমে এ ব্যাপারে জানতে পারেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একদিন চুপিসারে নামাজ আদায় করতে দেখে ফেলেন। তিনি ঈমান না আনলেও নবীজির মোহাফেজ এবং গোপনীয়তা রক্ষাকারী অভিভাবক ছিলেন। ছেলে আলির ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি কোনো আপত্তি করেননি।[২৫৮] বরং তার আরেক সন্তান জাফরকে (যিনি হজরত আলি থেকে দশ বছর বড় ছিলেন)[২৫৯] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। ফলে হজরত জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুও 'আসসাবিকুনাল আওয়ালুন' তথা প্রথম ইসলামগ্রহণকারী সাহাবিদের কাতারে শামিল হয়ে যান।[২৬০]

আব্বাসও এই দাওয়াতের কথা জেনে গিয়েছিলেন। তিনি যদিও প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেননি; কিন্তু বিরোধিতাও করেননি। বরং যথাসম্ভব তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথিদের সাহায্য করতেন।[২৬১]

ধীরে ধীরে তাওহিদের এই দাওয়াতের সংবাদ কুরাইশের একাধিক সরদারের কর্ণগোচর হয়।[২৬২] তারপরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দাওয়াত এমন গোপনে চলছিল যে, বিক্ষুব্ধ হওয়ার

---

[২৫৮] মুসনাদ আহমাদ- ৭৭৬

[২৫৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১/২০৬ (আর-রিসালাহ সংস্করণ)

[২৬০] তারিখে দিমাশক- ৫৪/১৬৫

[২৬১] হজরত আব্বাস রা. নওমুসলিম হজরত আবু যার গিফারি রা. কে হারাম শরিফে কুরাইশদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সহিহ হাদিসেই তার বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। [সহিহ মুসলিম- ৬৫১৩, ৬৫১৬]
এটিই প্রমাণ করে যে, হজরত আব্বাস রা. ইসলামের গোপন দাওয়াত সম্পর্কে অবগত এবং মুসলমানদের সাহায্যকারী ছিলেন।

[২৬২] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৬২, দালাইলুন নুবুওয়াহ- ২/১৭৫

কোনো সুযোগ ছিল না। কোনো মুসলমান ও মুশরিক কোথাও মুখোমুখি হচ্ছিল না। বনু হাশিমের সম্মান ও মর্যাদাও কুরাইশ সরদারদের নিশ্চুপ থাকার আরেক কারণ ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বললেও মনে তাদের প্রবোধ ছিল যে, এই দাওয়াত দুর্বল লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং একদিন তা নিজে নিজেই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

সম্ভবত তারা এই দাওয়াতকে জাহিলিযুগে উমাইয়া বিন আবু সাল্‌ত এবং যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের মতো ব্যক্তিদের মতাদর্শের মতো মনে করেছিল। কারণ, তারাও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এক উপাস্যের কথা বলতেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সংস্কারকদের মতাদর্শের তুলনায় ইসলামি দাওয়াতের মধ্যে অকল্পনীয় ক্ষমতা ছিল।

আবু জর গিফারির ইসলামগ্রহণ

মক্কায় আল্লাহ তায়ালার ঘর হওয়ায় মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল। বাইরে থেকে আগত জিয়ারতকারীদের আগমন-প্রস্থান সর্বদা লেগেই থাকত। উপযুক্ত মওকা পেলে ঐসব জিয়ারতকারীর মধ্যেও দাওয়াতি কার্যক্রম চলে। এর ফলে ইসলামের সংবাদ খুব দ্রুত দূরদূরান্তের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর সত্যানুসন্ধানী লোকেরা এক-দুজন করে মক্কায় এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যায়। মক্কার সরদাররা প্রথমদিকে নবীজির সাক্ষাৎ লাভকারী প্রত্যেকের উপর নজরদারি করতে থাকে। তিনিও নতুন লোকদের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।

ঐ সময়েই ডাকাত-কবিলা গিফারের এক যুবক আবু জর গিফারি (যিনি মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন) তার ভাইয়ের মুখে একজন নতুন নবী এবং নতুন ধর্মের সংবাদ শুনতে পান। তিনি সোজা মক্কায় চলে আসেন। তার জানা ছিল নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিজের উপর অযথা বিপদ ডেকে আনার নামান্তর। তাই তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কোনো দিন হয়তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হালপুরসি করেন। তারপর তার আগমনের উদ্দেশ্য জেনে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের?

বললেন, গিফার গোত্রের।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে অস্থিরতা এবং খুশিতে তার ললাট ঘেমে গিয়েছিল।

আবু জর গিফারি ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গোপন রাখার তাগিদ দেন। কিন্তু তিনি ফিরে যাওয়ার পথে মসজিদে হারামে গিয়ে মুশরিকদের ভরা মজলিসে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কালিমায়ে তাওহিদ পাঠ করেন।

এটাই ছিল হকের প্রথম সুউচ্চ ধ্বনি। কুরাইশরা তা সহ্য করতে পারেনি। তারা এই যুবকের উপর নির্দয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হজরত আব্বাস তা দেখে হুমড়ি খেয়ে তার উপর পড়ে যান আর বলতে থাকেন 'এই দুর্ভাগারা, এই লোক (ডাকাত গোত্র) গিফারের সন্তান। শাম থেকে আসা তোমাদের বাণিজ্য-কাফেলাগুলোর কিন্তু তাদের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে হয়!'

এ কথা শুনে লোকেরা পিছু হটে। কারণ, ডাকাতরা প্রতিশোধ নিতে তাদের বাণিজ্য-কাফেলায় হামলা করতে পারে। পরদিন সেই মুজাহিদ আবু জর পুনরায় মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়ে কালিমায়ে তাওহিদ বুলন্দ আওয়াজে পাঠ করেন। আবার মারপিটের শিকার হন। এবারও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে রক্ষা করেন।

আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ কবিলায় ফিরে গিয়ে নিজের মা ও ভাইকে দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর সমগ্র কবিলাতে তিনি দাওয়াত দিতে থাকলে খুব দ্রুত গোত্রের সকলেই ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়।[২৬৩]

অনুরূপ বনু বুজাইলা গোত্রের আমর বিন আবাসা নিজের এলাকা থেকে এসে উকাজের মেলায় নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

[২৬৩] সহিহ মুসলিম- ৬৫১৩, ৬৫১৬ (কিতাবু ফাজায়িলুস সাহাবাহ, বাবু ফাজায়িলু আবু যার গিফারি রা.) দারুল জীল সংস্করণ, আলইসাবাহ, আবু যার গিফারি রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

নবীজি তাকে বলেন, ‘আমাদের পাল্লা যখন ভারী হওয়ার সংবাদ পাবে, দ্বিতীয়বার আসবে।’[২৬৪]

তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াতের ধারা চলমান থাকে। সাফা পাহাড়ের কিনারে অবস্থিত হজরত আরকাম বিন আবুল আরকামের ঘরই এই মহান মেহনতের প্রথম কার্যালয় ছিল।[২৬৫]

---

[২৬৪] আলইসাবাহ, আমর বিন আবাসাহ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য, আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬৫৭, সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/৪৫৬, ৪৫৭

[২৬৫] উসদুল গাবাহ- আরকাম বিন আবুল আরকাম রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

তাওহিদের ঘোষণা এবং মুমিনদের পরীক্ষা

তিন বছর পর আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরই প্রথম ধাপ হিসাবে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে বলেন, 'আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনকে (শিরকি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে) ভীতি প্রদর্শন করুন (এবং তাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত দিন)।'[২৬৬]

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সর্বাগ্রে ঘরের লোকদের দাওয়াত দেন। এক এক করে সবাইকে সম্বোধন করে বুঝান। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে প্রিয় ফুফু সাফিয়া, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা করো। কারণ, আল্লাহর দরবারে সেদিন আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।'[২৬৭]

বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার চেয়ে পরিবারের লোকদের দাওয়াত দেওয়া অনেক কষ্টকর ছিল। এজন্য তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বনু হাশিমের প্রত্যেক সদস্যকে একত্রিত করেন। তাদের মধ্যে চাচা আবু তালেব, আব্বাস, হামজা, আবু লাহাবসহ ৪০-৪৫ লোক জমা হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত, দুধ ও রুটি দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। অলৌকিকভাবে সবার খাওয়ার পরেও কিছু খাবার রয়ে যায়। খাওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হামদ-সানা পাঠ করার পর বলেন, 'কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের কাছে কখনো গলদ কথা বলে না। ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি সবার জন্য সামগ্রিকভাবে এবং আপনাদের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।

---

[২৬৬] সুরা শুআরা, আয়াত ২১৪

[২৬৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৯৭, ৯৮

'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি তার কওমের নিকট এমন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কথা নিয়ে আসতে পারেনি, যা আমি আপনাদের নিকট নিয়ে এসেছি। আমি দুনিয়া-আখেরাতে সফলতার বার্তা নিয়ে এসেছি।

'আল্লাহর শপথ, আপনারা যেভাবে শুয়ে বিশ্রাম নেন, তেমনি একদিন আপনাদের মরতে হবে, যেভাবে আপনারা জাগ্রত হন, সেভাবেই একদিন আপনাদের হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হতে হবে। আর সেখানেই আপনাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। নিশ্চয় জান্নাত চিরস্থায়ী ঠিকানা, দোজখও চিরস্থায়ী ঠিকানা।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে আবু তালেব উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দেন। কিন্তু আবু লাহাব প্রতিবাদ ও অহংকারমূলক কথা বলে। তার উত্তর থেকে যেন তখন আগুন উদ্‌গিরণ হচ্ছিল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের সবচেয়ে কঠিন বাধা প্রদান করে।[২৬৮]

---

[২৬৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০১

প্রকাশ্য দাওয়াত

(নবুওয়াতের চতুর্থবর্ষ)

কিছুদিন পর আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার হুকুম করে আয়াত নাজিল হয়,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

আপনার যার আদেশ করা হয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে শুনিয়ে দিন এবং মুশরিকদের কোনও পরোয়া করবেন না।[২৬৯]

তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আহ্বান করতে লাগলেন, 'ইয়া সাবাহাহ'! দুশমন যখন মাথার উপর এসে যেত, তখন আরবরা এই বাক্যের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন করত। এই বাক্য উচ্চারণ করার পরপরই কুরাইশের সবাই এসে সেখানে জমায়েত হয়ে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলতে শুরু করলেন, 'হে বনু আবদুল মুত্তালিব, হে বনু ফিহর, হে বনু কাব, আমি যদি তোমাদের সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে একটি বাহিনী আক্রমণের জন্য ঘাঁপটি মেরে আছে, তা হলে কী তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

---

[২৬৯] সুরা হিজর, আয়াত ৯৪

হাদিস থেকে এই নির্দেশ কখন এসেছে তার সুনির্দিষ্ট সময় জানা যায় না। হ্যাঁ, এটুকু জানা যায় যে, তখন নবুওয়াতের তিন বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যাদের নিকট নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা রবিউল আওয়ালে হয়েছে, তাদের মত অনুযায়ী এই নির্দেশ নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঠিক তিন বছর পর রবিউল আওয়াল মাসে।

আর যাদের নিকট নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা রমজানে হয়েছে, তাদের মত অনুযায়ী এই নির্দেশ রমজান মাসে হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাফেজ ইবনে কাসির রহ. নবুওয়াতপ্রাপ্তি রমজান মাসে হওয়ার মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। (আমরাও এই মতটি গ্রহণ করেছি।)

তাই উপর্যুক্ত মত অনুযায়ী প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ চার রমজানে ঘটেছে।

নবীজির সততার প্রতি সবার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তারা নির্দ্বিধায় বলে, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ভয় করছি, যা তোমাদের একেবারে নিকটে।'

কুরাইশরা এ কথা শুনে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আবু লাহাব অগ্নিশর্মা হয়ে বলে,

تَبًّا لك سَائرَ اليوم، ألِهذا جمعتَنا؟

ধ্বংস হও তুমি! এজন্য তুমি আমাদের জমায়েত করেছো?' (নাউজুবিল্লাহ)

এরপর সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আপন গন্তব্যে ফিরে যায়।[২৭০]

আবু লাহাবের ধৃষ্টতার জবাব ও সুরা লাহাব নাজিল

আবু লাহাবের সেই ধৃষ্টতার জবাবে সুরা লাহাব নাজিল হয়। পবিত্র কুরআনে তার (تَبًّا لك) বাক্যের অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ উত্তর দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

تبَّتْ يَدا أبِي لَهَبٍ وتَبَّ

আবু লাহাবের হাত বিনষ্ট হোক এবং ধ্বংস হয়ে যাক।

এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে জবাব দেওয়ার ফলে আবু লাহাব পুরো মক্কায় অপমানিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সে তার ছেলে উতবা এবং উতাইবাকে আদেশ করে নবীজির কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক প্রদান করার জন্য। এদের মাত্রই বিয়ে হয়েছিল। তখনও উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। আবু লাহাবের ছেলেরা পিতার নির্দেশে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের তালাক দিয়ে দেয়।[২৭১]

---

২৭০ সহিহ বুখারি (কিতাবুত তাফসির, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিও ওয়া তাব্বা'-আয়াতের তাফসির)

২৭১ উসদুল গাবাহ (রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য)

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর উৎপীড়ন

এই ঘটনার পর থেকে আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে কোনো পদ্ধতিই বাদ রাখেনি। আবু লাহাবের ঘর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের কাছাকাছি ছিল। এজন্য প্রতিমুহূর্তেই তার দুষ্টামির শিকার হতে হতো। উম্মে জামিল রাতেরবেলা নবীজির চলার পথে কাঁটা পুঁতে রাখত। আবু লাহাব ঘরের সমস্ত আবর্জনা এনে পথে রেখে দিত।

নবীজির ঘরের অপর পার্শ্বে ছিল আরেক শত্রু উকবা বিন আবি মুয়াইত। সেও কষ্ট দেওয়ার জন্য ঘরের ময়লা-আবর্জনা নবীজির ঘরের দরজায় রেখে দিত।[২৭২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি দুজন নিকৃষ্ট প্রতিবেশীর মাঝে বসবাস করি; আবু লাহাব এবং উকবা বিন আবি মুয়াইত।'[২৭৩]

আবু লাহাব সর্বদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যবেক্ষণ করত দাওয়াত-তাবলিগের জন্য তিনি কখন কোথায় যান। তিনি যেখানেই যেতেন, সে তার পিছু পিছু গিয়ে উচ্চবাচ্চ শুরু করত; যেন নবীজির কথা শোনা না যায়।'[২৭৪]

আবু তালেবের উপর কুরাইশের বলপ্রয়োগ : নবীজির জবাব

কুরাইশের অন্য সরদাররাও সরাসরি নবীজির বিরোধিতা করত। এই দাওয়াত প্রতিহত করার জন্য মাঝেমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনায় অংশ নিত। এরাই আবু তালেবের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে বলে, 'আপনি আপনার ভাতিজাকে বাধা দিন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং উপাস্যদের গালমন্দ আর সহ্য করতে পারব না। আপনি তাকে সংযত করুন, অন্যথায় আমাদের সাথে আপনার এবং আপনার ভাতিজার সব সম্পর্ক চুকে যাবে।'

---

[২৭২] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা লাহাব, আখবারু মাক্কাহ, ফাকিহানি- ৩/৩৮৫ (দারু খিযির)

[২৭৩] আসসিরাতুল হালাবিয়্যা- ১/৪৪৭

[২৭৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

আবু তালেব ঘাবড়ে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথকভাবে ডেকে কুরাইশের দাবি উল্লেখ করে বললেন, 'আমার এবং তোমার জানের পরোয়া তো করো! আমার উপর এত বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না। আমি তা সইতে পারব না।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝে গেলেন তার উপর কঠিন বলপ্রয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি এর চেয়ে অধিক সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি এই মহান দায়িত্ব কীভাবে ছেড়ে দেবেন! এর উপরই তো নির্ভর করে দুনিয়ার অস্থিরতা থেকে মুক্তি। এই দাওয়াত তো তার আত্মার চেয়েও বড়। এটিই তার জজবা, এটিই তার প্রত্যয়। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'চাচাজান, আল্লাহর কসম, যদি আমার এই ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে রেখে দেওয়া হয়, আর এর বিনিময়ে আমাকে এই দাওয়াত পরিত্যাগ করতে বলা হয়, তা হলেও আমি তা পরিত্যাগ করব না। এমনকি আল্লাহ তায়ালা যদি এ দীনকে বিজয়ী করেন কিংবা এই জিহাদে আমার প্রাণও চলে যায়, তারপরেও আমি এই দাওয়াত ছাড়তে পারব না।' এটুকু বলতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে পড়তে থাকে, তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বাইরে চলে যান।

আবু তালেব এই অবস্থা দেখার পর তার ভেতরে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তাকে পুনরায় ডেকে এনে বললেন, 'ভাতিজা, তোমার যা মন চায়, তাই বলো। যেভাবে তোমার দাওয়াত দিতে মন চায়, দাও; আমি তোমাকে কখনোই একা ছেড়ে দেব না।'[২৭৫]

সাহাবিদের উপর জুলুম-অত্যাচার

কুরাইশ-সরদাররা যখন দেখল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত ও তাবলিগ থেকে বিরত রাখতে আবু তালেবের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূর করতে পারছে না, তখন তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বনু হাশিমের লোকজনের মাঝে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাদা ইজ্জত-সম্মান ছিল। উপরন্তু আবু তালেবের মতো একজন হৃদয়বান সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব

---

[২৭৫] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৬৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

দিচ্ছেন না। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হাত ওঠানো তাদের জন্য খুব সহজ ছিল না।

অধিকাংশ মুসলমানই যেহেতু অত্যন্ত নিঃস্ব ও সম্বলহীন ছিল, তাই এবার কুরাইশদের সব আক্রোশ ও প্রতিশোধ তাদের থেকে নিতে লাগল। কুরাইশের প্রত্যেক সরদার তাদের কবিলার মুসলমানদের টার্গেট করতে থাকে। তাদের মধ্যে যারা ছিল একেবারেই নিঃস্ব, বন্ধুবান্ধব ও মদদশূন্য, তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার।

হজরত খাব্বাব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অঙ্গারের উপর শোয়ানোর কারণে তার কোমর একেবারে ঝলসে যায়। হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া বিন খালফের গোলাম ছিলেন। সে হজরত বিলালকে মরুভূমির তপ্ত বালুতে ফেলে বুকের উপর ভারি পাথর রেখে বলত- 'মুহাম্মদকে অস্বীকার করে লাত-উজ্জার পূজা কর; অন্যথায় তোর প্রাণ এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।' কখনো-বা তাকে লোহার পোশাক পরিয়ে তপ্ত বালুতে বসিয়ে রাখা হতো। তিনি এই কষ্টের ভেতরেও বলতেন 'আহাদুন! আহাদুন! (তিনি এক, তিনি একক)। কখনো তার গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের দিয়ে সারা শহর ঘুরাত।[২৭৬]

কাহতানি বংশোদ্ভূত আম্মার বিন ইয়াসির এবং তার পিতা-মাতা (ইয়াসির ও সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা); মক্কাতে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। কুরাইশ সরদার তাদের তিনজনকে ধরে মরুভূমিতে নিয়ে এসে সীমাহীন নির্যাতন করত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই অবস্থায় দেখে বলতেন, 'ইয়াসিরের পরিবার! ধৈর্য ধরো, তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।'

হজরত ইয়াসির বয়স্ক দুর্বল মানুষ ছিলেন। এমন অনবরত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। এরপর তার স্ত্রী সুমাইয়াকে অভিশপ্ত আবু জাহল অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার করে বর্শা মেরে শহিদ করে দেয়। তাকেই ইসলামের প্রথম নারী শহিদ বলা হয়ে থাকে।[২৭৭]

---

[২৭৬] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩১৮; তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২৬; মুসতাদরাক হাকিম- ৫২৩৮

[২৭৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৪/১৩৬, ৮/২৬৪

এমনিভাবে হজরত সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ বিন জারআনের আজাদ-করা গোলাম ছিলেন। বংশগতভাবে ছিলেন অনারব। তাকে প্রচণ্ড মারপিট করা হতো। মাঝেমধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।[২৭৮]

কুরাইশের জুলুম-অত্যাচার এতই বৃদ্ধি পায় যে, বড় বড় সম্ভ্রান্ত, অভিজাত এবং সম্পদশালী ব্যক্তিরা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। হজরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচা হাকিম বিন আবুল আস তাকে বেঁধে রাখে, এবং ইসলাম ত্যাগ না করলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি ইসলামের উপর অবিচল থাকেন।[২৭৯]

হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার একজন বড় সম্পদশালী, সম্ভাবনাময় এবং বিলাসিতায় লালিত-পালিত-হওয়া নওজোয়ান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার পরিবারের লোকেরা একটা কুঠরিতে তাকে বন্দি করে রাখে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে আটক অবস্থায় কাটান।[২৮০]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর অত্যাচার

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। অনুরূপ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। কিন্তু যখনই এই দুজন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশ সরদার নাওফিল বিন খুওয়াইলিদ উভয়কে পাকড়াও করে একই রশিতে বেঁধে খুব নির্যাতন করে। তখন থেকেই এই দুজনকে 'কারিনাইন' তথা দুই নিষ্ঠাবান সঙ্গী' বলা হতো।[২৮১]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নবীজি

একদিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তায় রাস্তায় লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। মুশরিকরা তখন ভীষণ

---

[২৭৮] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২২৭

[২৭৯] আলমুনতাযাম- ৪/৩৩৫

[২৮০] আলইসতিয়াব- ৪/৭৪

[২৮১] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/১১৪ (তালহা রা. এর জীবনী)

ক্রুদ্ধ হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে। উতবা বিন রবিয়া তার মোটা জুতা দিয়ে হজরত আবু বকরের চেহারায় আঘাত করতে থাকে। চেহারা এতই বিক্ষত হয় যে, তাকে চেনাই মুশকিল হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। সবার একিন হয়ে গিয়েছিল তিনি আর বাঁচবেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। সন্ধ্যার আগমুহূর্তে তার হুঁশ ফিরে আসে। তখন তার মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম এই বাক্যটি বের হয়- 'নবীজি ভালো আছেন তো?' যখন বলা হলো যে হ্যাঁ, তিনি ভালো আছেন, তখন তিনি বললেন, আমি যতক্ষণ না স্বচক্ষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখব, ততক্ষণ মুখে খাবার তুলবো না।'

অবশেষে যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, তখন তার আম্মা উম্মুল খায়ের এবং আরেকজন আত্মীয় উম্মে জামিলের কাঁধে ভর করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসেন। প্রিয় বন্ধুর এমন শোচনীয় অবস্থা দেখে নবীজির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও কাঁদতে থাকেন। তার আম্মা উম্মুল খায়ের তখনও মুসলমান হননি।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেন যেন তার মায়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন। তখন নবীজি তার মায়ের জন্য দোয়া করেন। দোয়ার তাৎক্ষণিক বরকত দেখা দেয়। উম্মুল খায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ছিল দাওয়াত-তাবলিগ এবং জুলুম-অত্যাচারের উপর সবরের নগদ পুরস্কার।[২৮২]

নবীজিকে অপমান

এত তীব্র জুলুম-অত্যাচারের পরেও মুসলমানরা তাদের দীনের উপর অটল-অবিচল থাকে। ফলে কুরাইশ সরদাররা আরো ক্ষীপ্ত হয়। এবার তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখের সাথে সাথে দৈহিক নির্যাতনও শুরু করে দেয়। তারা শহরের ইতরশ্রেণির লোকদের দায়িত্ব দেয় যে, তারা যেখানেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

---

[২৮২] আলইসাবাহ- আবু বকর রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

দেখবে উত্যক্ত করবে, হইচই শুরু করবে, কবি, জাদুকর, পাগল বলবে এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দেবে।

তাদের এই কর্মকাণ্ড জোরদারভাবেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাদের এহেন কার্যকলাপে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন ভীষণ ভেঙে পড়ত। দিলের ব্যথা যখনই অনেক বেড়ে যেত, তখনই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে অহি নাজিল হতো।

একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার পর সারাদিন এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হলেন। এমনকি মক্কার গোলামরা পর্যন্ত তাকে সরাসরি অপমান করে এবং মিথ্যাবাদী বলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন এবং চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন। আর তখনই অহি নাজিল হয়- 'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির' (হে চাদরাবৃত)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন প্রশান্তি লাভ করে।[২৮৩]

মক্কাবাসীর অধিকাংশ তিরস্কার, দোষারোপের উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু যখনই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত, তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ তৈরি করছ।

একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। সে সময় মক্কার সরদাররা কাবার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তিনি যখনই তাওয়াফ করতে করতে তাদের কাছে আসতেন, তাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করত। তৃতীয় তাওয়াফের সময় তিনি তাদের কাছে এসে থেমে গিয়ে বলতে থাকেন, 'হে কুরাইশের লোকেরা, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা আসলে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর আজাব তোমাদের উপর আপতিত হয়। শুনে রাখো, আমি তোমাদের ধ্বংসের সংবাদ নিয়ে এসেছি।' এ কথা শোনার পর সবার লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং ভয়ে চুপসে যায়।

---

[২৮৩] সহিহ বুখারি (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা লাকিয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা) সম্ভবত এই আয়াত নবীজিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার নাজিল হয়। অন্যথায় এটি পূর্বে নাজিল হয়েছিল।

ওদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার দীনকে নিশ্চয়ই বিজয়ী করবেন।'[২৮৪]

পরবর্তী দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাওয়াফ করতে এলেন, তখন ঐ লোকগুলো ঘিরে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুর্ভাগা উকবা বিন আবি মুয়াইত নবীজির চাদর দিয়ে তার গলায় এমনভাবে চেপে ধরে যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। সে নবীজির পায়ের উপর উঠে বসে। ভাগ্য ভালো ছিল যে, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি উকবা বিন আবি মুয়াইতকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলতে লাগলেন,

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟

> তোমরা কি একজন মানুষকে কেবল এ কারণে হত্যা করছো যে তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?

এ কথা শুনে মুশরিকরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর চড়াও হয় এবং এত আঘাত করে যে, তার মাথা ফেটে যায়।[২৮৫]

আবু জাহলের নোংরামী

কুরাইশের প্রসিদ্ধ সরদারদের মধ্যে আমর বিন হিশাম ওরফে আবু জাহল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল। সে ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী, চতুর এবং ধূর্ত। অধিকাংশ সময় সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করার জন্য অন্যদের উসকানি দিত আর নিজে দূর থেকে তামাশা দেখত। কখনো কখনো জনসমক্ষেই নবীজিকে লাঞ্ছিত করত। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরের পাশে নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি সেজদায় গেলেন, তখন এই হতভাগা তার মাথায় আঘাত করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অলৌকিকভাবে তার নবীকে হেফাজত করেন। সে তার

---

২৮৪ প্রাগুক্ত, উয়ূনুল আছার- ১/১৪০

২৮৫ সহিহ বুখারি (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা লাকিয়া রাসুলুল্লাহ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা)

সামনে মুখ ব্যাদান-করা এক ভয়ানক উট দেখতে পায়। ফলে সে পিছপা হয়ে যায়।[২৮৬]

এতসব নিদর্শন দেখার পরেও সে তার কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসেনি। যখনই কুরাইশের কাউকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে কিংবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখত, যদি সে গোত্রপতি কিংবা নেতৃস্থানীয় কেউ হতো, মারমুখী হয়ে তাকে সতর্ক করত যে, 'তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ, অথচ তোমার বাপ-চাচারা তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব, সামনে থেকে তোমাদের চরিত্র সম্পর্কে কোনো ভরসা রাখবো না। তোমাদের মতামতেরও কোনো মূল্য নেই এবং মান-ইজ্জত কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

আর যদি ব্যবসায়ী হতো তা হলে তাকে এভাবে ধমকাত যে, 'তুমি যদি মুসলমান হও, তবে আমরা তোমার ব্যবসায় মন্দা এনে দেব, তোমার ধনসম্পদ নষ্ট করেই ছাড়ব।'

আর যদি কোনো ভিনদেশি লোক মুসলমান হতো, তা হলে আবু জাহল সরাসরি তার উপর লাথি, ঘুষি এবং লাঠি ব্যবহার করত।[২৮৭]

নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং পারিবারিক জীবন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাওয়াত ও আধ্যাত্মিক কাজে নিমগ্নতা সত্ত্বেও নিজের পরিবার সম্পর্কে কখনো বেখবর ও অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি বড় মেয়ে হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার খালাতো ভাই আবুল আস বিন রাবির কাছে বিয়ে দেন। হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বোন হালা'র পুত্র ছিল আবুল আস। একজন সম্ভ্রান্ত নওজোয়ান ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। যদিও তিনি তখনো ঈমান আনেননি। সে সময় মুসলমানই ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। তার চেয়ে উত্তম খান্দানি মানুষ কেউ ছিল না। মুশরিকদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তখনও কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি।

---

[২৮৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১১৬
[২৮৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৪৭

দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা, যাকে আবু লাহাবের পুত্র তালাক দিয়ে দিয়েছিল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত লজ্জাশীল তরুণ হজরত উসমান বিন আফফানের সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবেও ছিলেন সচ্ছল। হজরত খাদিজা ও নবীজির এই দুই কন্যা দাওয়াত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে তার পূর্ণ সহযোগী এবং সহমর্মী ছিল।

হজরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা যেহেতু পরিবারের বড় মেয়ে ছিলেন, তাই তিনি পিতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কোন অবস্থায় আছেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাট-বাজার, অলিগলিতে তাওহিদের বাণী শোনাতে গিয়ে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করতে করতে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত, তখন হজরত যায়নাব বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌঁছে যেতেন এবং শত্রুদের কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

হারিস বিন হারিস তার বাল্যকালে স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তার পিতার সঙ্গে তিনি যখন মক্কায় পৌঁছেন, তখন এক জায়গায় মানুষের জটলা দেখতে পান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, এখানে কীসের জটলা? বাবা উত্তর দেন, 'বেটা, এরা একজন বেদীন লোককে ঘিরে আছে।' তখন পিতা-পুত্র দুজনই সওয়ারি থেকে নেমে সেই জটলার কাছে যান। দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে ঈমান ও তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছেন আর তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে এবং একইসাথে তারা বিভিন্নভাবে তাকে কষ্টও দিচ্ছে।

এভাবে কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জটলা ভেঙে যায়। তখনই একজন নারী পানির পেয়ালা এবং রুমাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি পান করান, অজু করান। লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি এই নারী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যায়নাব।

মুনিব আজদি নামের আরেক ব্যক্তি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমাগমের মধ্যে গিয়ে বলতেন, 'লোকসকল, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো, তা হলে সফল হবে।' কিন্তু মানুষ তাকে গালি দিত। কেউ কেউ তো থালার মধ্যে বালু ভরে

এমনভাবে ছুড়ে মারত, তার পুরো দেহ ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যেত। এক বদবখত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক চেহারায় থুথুও নিক্ষেপ করে। এমন সময় একটি মেয়ে পানির পেয়ালা নিয়ে এগিয়ে এসে তার চেহারা মোবারক ধুয়ে দেন। নবীজি তাকে বলেন, 'বেটি, তোমার বাপের ব্যাপারে এমন আশঙ্কা করো না যে, তিনি অকস্মাৎ মারা যাবেন কিংবা লাঞ্ছিত হবেন।' এই মেয়ে ছিলেন হজরত যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[২৮৮]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে হারামে নামাজ পড়ছিলেন। তখন আবু জাহল বলে, 'এমন কেউ কি আছে, যে উটের নাড়িভূঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে তার পিঠের উপর রেখে দেবে?'

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর দুশমন উকবা বিন আবি মুয়াইত গিয়ে উটের নাড়িভূঁড়ি নিয়ে এসে নবীজি যখন সেজদাবনত হলেন, সে তার পিঠে নাড়িভূঁড়ি রেখে দেয়।

মুশরিকরা এই নষ্টামী দেখে এত মজা পায় যে, তারা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে পড়তে থাকে। ইতোমধ্যে কেউ নবীজির ঘরে গিয়ে তার কন্যা ফাতেমাকে অবহিত করলে, (তখন তার বয়স কম ছিল) তিনি দৌড়ে এসে বড় কষ্ট করে পিতার পিঠ থেকে নাড়িভূড়ি সরিয়ে ফেলেন। এরপর কাফেরদের লক্ষ করে গালমন্দ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা থেকে মাথা উঠানোর পর তার কাপড় নাপাক হয়ে গিয়েছিল। মুশরিকরা তখনও হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনন্যোপায় হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে ওদের জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। এটা শুনে মুশরিকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল- না জানি এই বদদোয়া কবুল হয়ে যায়।[২৮৯]

---

[২৮৮] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাইসামি- ৯৮২৭, ৯৮২৮ (মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো সংস্করণ)

[২৮৯] সহিহ মুসলিম- ৪৭৫০, (কিতাবুল জিহাদ বাবু মা লাকিয়ান নাবিয়্যু সা.), সিরাত ইবনে ইসহাক- ১/২১১

এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে যে, ইসলামের জন্য কুরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানমাল, পরিবার-পরিজনসহ সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এটিই একজন সত্যিকার দাঈ এবং পূর্ণতর রাহবারের শান ও বৈশিষ্ট্য।

সম্ভবত এ বছরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা (মৌখিক) হজরত উম্মে আইমান এবং পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসার ঔরসে একটি ছেলের জন্ম হয়। মায়ের মতোই সুশ্রী ছিল। তার নাম রাখা হয় উসামা। শিশু উসামাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মহব্বত করতেন।[২৯০]

পুত্রসন্তানদের মৃত্যু এবং মুশরিকদের দোষারোপ

ইতিমধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনেক বড় একটি বিপদ নেমে আসে। তার বড় পুত্র কাসিম আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে চলে যান। তিনি নবুওয়াতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এতটুকু বয়স হয়েছিল যে, ঘোড়ায়ও চড়তে পারতেন। কিছুদিন পর দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহও দুনিয়া ত্যাগ করেন। এর ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পুত্রসন্তান জীবিত থাকল না। সন্তানের বিয়োগব্যথা কম হৃদয়বিদারক ছিল না।

মুশরিকরা নবীজির অন্তরকে আরো বিক্ষত করার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, মুহাম্মদ 'আবতার' তথা পুত্রসন্তানহারা হয়ে গেল। ভবিষ্যতে তার নাম নেওয়ার মতো কোনো প্রজন্ম বাকি রইল না। তখন আল্লাহ তায়ালা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরাতুল

সহিহ মুসলিম এবং ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতেই এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যতজনের ব্যাপারে বদদোয়া করেছিলেন, প্রত্যেকেই বদরযুদ্ধে মারা যায়।

হজরত ফাতেমা রা. এর বয়স তখন নয়-দশ বছরের কাছাকাছি। কারণ, অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী তিনি কুরাইশদের কাবাঘর পুনর্নির্মাণের বছর তার জন্ম হয়। তখন নবীজির বয়স ছিল পূর্ণ ৩৫ বছর [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/১৯, আলইসাবাহ- ৮/২৬৩]। এর পাঁচ বছর পর নবীজি নবুওয়াত পান। সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপরই কষ্ট, নির্যাতনের ধাপ আরম্ভ হয়। আর এই ঘটনাটিও সেই পরীক্ষাযুগের।

[২৯০] আলইসাবাহ- উসামা বিন যায়েদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

কাউসার নাজিল করে বলে দেন 'নিশ্চয়ই আপনার দুশমনেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'[২৯১]

ছেলেদের মৃত্যু ও আল্লাহ তায়ালার হেকমত

আল্লাহর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রসন্তানদের এত দ্রুত নিয়ে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় হেকমত হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষনবী হওয়া চূড়ান্ত ছিল। ফলে তার ছেলেরা বড় হয়েও যদি নবী না হতো, তখন কারো সন্দেহ হতে পারত যে, হয়তো পূর্ববর্তী নবীগণ অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলেন। এবং তাদের সন্তানদের উত্তম অভিভাবক ছিলেন, তাই সন্তানরাও নবী হয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এতই যোগ্য নবী হবেন, তা হলে তার ছেলেরা নবী হলো না কেন? এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে পুত্রসন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি। আর দ্রুত ফেরত নিয়ে যান, কারো মনে যেন সংশয় তৈরি না হয়।

নতুন উম্মতের সৃষ্টি

সময়টা ছিল পরীক্ষা, বালা-মুসিবত, ধৈর্য-সহনশীলতা, অবিচলতা, দূরদর্শিতা, তরবিয়ত ও দীক্ষার। ইসলামের ইতিহাসে এই যুগটি সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। কারণ, এ সময়ে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, যাদের উপর ভবিষ্যতে সমগ্র উম্মাহর নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনা নির্ভর করবে। কাফেরদের কঠোরতা ও কটাক্ষ, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, বাধ্যবাধকতা, কাজকর্মের নিত্যনতুন পদ্ধতি, গোপন ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্য বাধার মুখে নবীজির প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব, ধৈর্য-সহনশীলতা, সংযম ও নম্রতা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা এবং প্রতিটি লোককে আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেওয়ার মধ্যদিয়ে সে সময়টা অতিক্রান্ত হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামও তখন সকাল-সন্ধ্যা গোপন ও প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনেরবেলার অধিকাংশ সময় সাফাপর্বতের পাশে অবস্থিত হজরত আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে অবস্থান করতেন। এটিই ইসলামি দাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র এবং প্রথম মাদরাসা। প্রতিদিন তিনি সকাল-

---

[২৯১] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা কাউসার

সন্ধ্যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে যেতেন এবং উভয়ে মিলে পরামর্শ করতেন।

কাফেরদের মোকাবেলায় নবীজি এবং সাহাবিদের হাতে কোনো হুকুমত, ধনদৌলত, জনশক্তি ছিল না। তখন একমাত্র হাতিয়ার ছিল আল্লাহর উপর মজবুত ঈমান, তার মদদ ও নুসরতের পূর্ণ একিন, সর্বাবস্থায় তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তার নিকটই কায়মনোবাক্যে রোনাজারি করা।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অজিফা ছিল কালিমায়ে তাইয়েবা। এটিই দাওয়াতের সারাংশ এবং এটিই ছিল আধ্যাত্মিকতার সূতিকাগার। তারা নিজেদের মজলিসে খুশি-আনন্দ প্রকাশের জন্য আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলত। নামাজ তখনও ফরজ হয়নি; তবে তার পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয়েছিল। অজু-গোসল এবং নামাজের পদ্ধতি শেখানো হয়েছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণ দু'রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন। সাধারণত তারা ঘরে কিংবা গোপন জায়গায় নামাজ পড়তেন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা-চত্বরে গিয়ে নামাজ পড়তেন। কোনো কোনো সময় রাতের একাংশে যখন দীর্ঘ সময় নামাজে কাটিয়ে দিতেন, তখন অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে তেলাওয়াত করতেন। অপরদিকে অধিকাংশ সাহাবি কুরাইশের ভয়ে হারাম শরিফে নামাজ পড়তে পারতেন না। আর সেখানে তো জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করার প্রশ্নই আসে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিগণের জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ও শক্তি ছিল অহি। ধারাবাহিকভাবে তা নাজিল হচ্ছিল। কাফেররা গবেষণা করে নতুন নতুন আপত্তি তুলত; কিন্তু কুরআন মাজিদের দুই-তিন আয়াত তাদেরকে নিরুত্তর করে দিত। ওরা কষ্ট দিত; অহি এসে মুসলমানদের আশ্বস্ত করত, সাহস যোগাত, নিশ্চিত বিজয় ও মুক্তির বার্তা দিত। কাফেরদের বাধাপ্রদানে কী করণীয়- জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদমে কদমে তা শেখাচ্ছিলেন।

কুরআন করিম লেখা, সংরক্ষণ করা এবং তার পাঠদান প্রথমযুগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। নতুন আয়াত নাজিল হওয়ামাত্র লিপিবদ্ধ করা হতো।

সাহাবায়ে কেরাম তা শেখা, অপরকে শেখানো এবং মুখস্থ করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামগ্রহণকারী সাথিদের অনেক খোঁজ-খবর রাখতেন। তাদের পারিবারিক ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আশ্বস্ত হতেন। যারা নিঃস্ব দরিদ্র হতেন, তাদের সম্পর্ক জুড়ে দিতেন সচ্ছল মুসলমানদের সাথে, যাতে করে তাদের দেখভাল হয়ে যায় এবং কুরাইশ সরদারদের দ্বারস্থ না হতে হয়। যেমন দরিদ্র সাহাবি হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজরত সাইদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথি বানিয়ে দেন। হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কুরআন পড়াও শেখাতেন।[২৯২]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী ধনী মুসলমানরাও দরিদ্র এবং অভাবী মুসলিম ভাইদের সমস্যা সমাধান করাকে সৌভাগ্য মনে করত। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত বিলাল বিন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উমাইয়া বিন খালফের গোলামি থেকে আজাদ করেন। তদ্রূপ যিন্নিরা, নাহদিয়া এবং উম্মে উমাইসও (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না) মুশরিকদের বাঁদি ছিলেন। তারা মুসলমান হওয়ার কারণে কঠিন নির্যাতনের শিকার হন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকেও ক্রয় করে আজাদ করে দেন।[২৯৩]

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

---

[২৯২] মা'রিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম- ৭৭৯১

[২৯৩] জাওয়ামিউস সিরাতিন নববিয়্যাহ, ইবনে হাযম, পৃষ্ঠা ৪৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ), শুআবুল ঈমান, বাইহাকি- ১৫১৪ (মাকতাবাতুর রুশদ সংস্করণ)

দাওয়াতি তৎপরতা

হজের মৌসুম যখন ঘনিয়ে আসে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। কারণ, দূরদূরান্ত থেকে আগত লোকদের তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার এরচেয়ে মোক্ষম সুযোগ দ্বিতীয়টি নেই। অপরদিকে কুরাইশ সরদাররা ভীষণ চিন্তিত ছিল। কারণ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনাম করা এবং মানুষের কাছে দাওয়াতকে অকার্যকর করার জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেও আশানুরূপ ফল তারা দেখছিল না। তারা নবীজিকে (নাউজুবিল্লাহ) ধর্মত্যাগী, পাগল ও কবি বলে প্রচার করা সত্ত্বেও এক-দুজন করে মুসলমান হওয়া অব্যাহত ছিল। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কুরাইশ সরদাররা এক জরুরি মিটিং আহ্বান করে। তাদের মধ্যে স্বনামধন্য সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলল, 'হজের মৌসুম আসন্ন। আরবের বিভিন্ন কবিলার লোকজন আসবে। তাদের কানে অবশ্যই এই ধর্মের কথা পৌঁছেছে। তাই ব্যক্তি মুহাম্মদের ব্যাপারে আমাদের ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমাদের পরস্পরের কথার মাঝে বৈপরীত্ব থাকে।'

অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মজবুত আপত্তি তুলতে ব্যর্থ হয়, তখন ওয়ালিদ বলল, 'সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত কথা হলো, তোমরা তাকে জাদুকর বলো। সে তার জাদুর বলে ভাইকে ভাই থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে, বংশের লোকদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।'

তারা এ কথার উপরই একমত হয় এবং হাজিদের আগমনের পথে তারা ঐসব কথা প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে বসে যায়। এটা নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের অবস্থা।[২৯৪]

---

[২৯৪] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/২৭০

উকাজ বাজারে ইসলামের দাওয়াত (শাওয়াল নবুওয়াত ৪বর্ষ)

আরব জাহানে শাওয়াল থেকে জিলহজ মাসের শেষপর্যন্ত সময়টুকু আনন্দ-উল্লাস, মিল-মহব্বত এবং জমিচাষের দিন ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে কাফেলা আসা-যাওয়ার কারণে চতুর্দিকে আনন্দোৎসব। এই দিনেই আরবদের প্রসিদ্ধ মেলা এবং হাট বসত। সবচেয়ে বড় বাজার ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলা নামক স্থান-লাগোয়া উকাজ বাজার। উকাজ মক্কা থেকে পায়দল সফরে তিনদিনের দূরত্বে ছিল।

হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এবং বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো পুরো শাওয়াল মাস এখানে অবস্থান করত। জিলকদ মাসে মানুষের এই ঢল মক্কা অভিমুখী হতো এবং যি-মাজান্নাহর মধ্যে যিলকদের ২০দিন এভাবে কাটত যে, বিরান ভূমিও আবাদ হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেত। ১লা যিলহজের এই আয়োজন মক্কার থেকে পাঁচ মাইল (৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত জাবালে কাবকাবের পার্শ্বে 'যুলমাজাযে' তারা চলে যেত। এই জায়গাটি আরাফাত থেকে তিন মাইল তথা পৌনে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৮ তারিখ পর্যন্ত মেলার পসরা সাজাত। ৯ যিলহজ সবকিছু ত্যাগ করে তারা হজ আদায় করে আরাফার ময়দানের দিকে রওনা হতো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জনসমাগমকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তাদের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে দূরদূরান্তের কবিলাগুলোর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নবুওয়াতের চতুর্থ বর্ষের শাওয়াল মাসে তিনদিন সফর করে মক্কা থেকে উকাজ বাজারে পৌঁছলেন এবং বিভিন্ন কবিলার সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করলেন। এরপর তিনি যুলমাজাযের বাজারে আসেন এবং সেখানেও দিনরাত মেহনত করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দাওয়াতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আবু লাহাব তার পিছে পিছে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাট-বাজারের বিভিন্ন আসরে উপস্থিত হয়ে মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তিনি বলতেন, হে মানবমণ্ডলী, তোমরা বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই), তা হলে তোমরা সফল হয়ে যাবে।'

আবু লাহাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছে লেগেই থাকত। তার চোখে-মুখে ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুন ঠিকরে পড়ত। ক্রোধ-গোসসায় সে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতো। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করে চিৎকার করতে থাকত- আরে, তোমরা কি দেখো না! এই লোক তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে সরিয়ে নিচ্ছে!! সে চাচ্ছে তোমরা লাত-উজ্জার উপাসনা পরিত্যাগ করো।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে আপন দাওয়াত প্রচারে নিমগ্ন থাকতেন।[২৯৫]

জিমাদ আযদির ইসলামগ্রহণ

মক্কাতে নবীজির দাওয়াতি তৎপরতা চলমান ছিল, সাথে কুরাইশের শত্রুতাও। সে সময়েই 'আয্‌দ' গোত্রপতি জিমাদ মক্কায় আসেন। মুশরিকরা তাকে ভয় দেখায় সে যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় প্রভাবিত না হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করানোর জন্য নবীজিকে তারা পাগল বলল (নাউজুবিল্লাহ)। যিমাদের ঝাঁড়ফুঁক করার অভিজ্ঞতা ছিল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'আমার হাতে আল্লাহ বহু মানুষকে আরোগ্য দান করেছেন। আপনি চাইলে আপনাকেও আমি ফুঁক দিতে পারি।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد-

জিমাদ দম বন্ধ করে উপর্যুক্ত কথাগুলো শোনে। তার অন্তরে বিশ্বাস তৈরি হয় যে, ইতোপূর্বে সে এমন কথা কোনো দিন শোনেনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে বলে ফেলে 'আবার শোনান।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ শব্দমালাই পুনরায় শোনালেন। জিমাদ বলতে থাকে, জ্যোতিষ, জাদুকর, কবিদের কথা আমি শুনেছি।

---

[২৯৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১০৬

কিন্তু আপনার বলা কথার মতো কখনো শুনিনি। এ তো দেখছি ভাষার অলংকারের সাগর।'

জিমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম কবুল করেন এবং তার কওমের পক্ষ থেকেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করে নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যান।[২৯৬]

কুরআনের প্রভাবের ব্যাপারে মুশরিকদের স্বীকারোক্তি

ইসলামের শত বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের নিকট কোনো উত্তর ছিল না। তাদের যেসব সরদারের কবিতার উন্নত রুচিবোধ ছিল, সেই তারাই মুখিয়ে থাকত কুরআনের সুরে আকর্ষিত হওয়া এবং তার সাহিত্যরস থেকে স্বাদ নেওয়ার জন্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতেরবেলা কুরআন তেলাওয়াত করতেন, আবু জাহল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস বিন শারিক তখন চুপিসারে এসে তা শুনত।

সুবহে সাদিক পর্যন্ত নীরবে কান পেতে তারা কুরআন শুনত। ভোরের আলো ফুটতেই তারা ফিরে যেত। রাস্তার কোনো মোড়ে গিয়ে যখন তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়ে যেত, একে অন্যকে তিরস্কার করে বলত, 'আগামীতে এমন করবে না। কেননা, কওমের অন্যান্য লোক যদি তা জানতে পারে তা হলে তাদের অবস্থা কী হবে?' কিন্তু পরবর্তী রাতেও একই অবস্থা হতো। এভাবে যখন কয়েকদিন হয়ে গেল, তো একদিন আখনাস বিন শারিক লাঠি নিয়ে আবু জাহলের কাছে যায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, বলো, মুহাম্মদ থেকে যে তেলাওয়াত শোন, তার ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?'

আবু জাহল বলে, 'আমরা এবং বনু হাশিম সম্মান ও গৌরবের সকল বিষয়ে পরস্পরে তুলনা করছিলাম। আমরা যখন প্রায় বরাবর হয়ে গিয়েছিলাম তখন তারা বলে যে, আমাদের মাঝে নবীও আছে। তার উপর অহি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর কসম, আমরা কখনো এই কথা বিশ্বাস করি না।'[২৯৭]

---

[২৯৬] সহিহ মুসলিম- ২০৪৫ (কিতাবুল জুমুআ, বাবু তাখফিফিস সালাহ ওয়াল খুতবা)
[২৯৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬১, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২০৬

কুরাইশ সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনে অনেক প্রভাবিত হয়। ফিরে আসার পর তার পরিবর্তীত অবস্থা দেখে আবু জাহল তাকে তিরস্কার করে এবং তাকে এমন কথা বলতে পীড়াপীড়ি করে, যদ্দ্বারা সে কুরআন অস্বীকার করে বুঝা যায়।

ওয়ালিদ উত্তরে বলে, 'আমি কী বলব! তোমরা তো জানো, কবিতা, রণকাব্য আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউ নেই। আল্লাহর কসম, তার কথাগুলো এমন, উপর্যুক্ত কোনো বিষয়ের সাথেই যার সাদৃশ্য নেই। তার কথার মধ্যে বিস্ময়কর মাধুর্য রয়েছে। সেটি এমন কালাম, যা সবকিছুর উপর প্রাধান্য পাবে। তার উপর কোনো কিছু প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না। এই কালাম অন্যান্য সব কালামকে উলট-পালট করে দেয়।'

আবু জাহল বলে, 'তোমার তো এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা উচিত, যদ্দ্বারা তোমার কওম সন্তুষ্ট হয়।'

ওয়ালিদ গভীরভাবে ভেবে উত্তর দেয়, 'একে জাদু বলা যেতে পারে।'[২৯৮]

কিন্তু নজর বিন হারিস (লোকেরা যাকে মানবরূপী শয়তান বলতো) কুরাইশের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে অনর্থক বলে সাব্যস্ত করে। সে কুরআনের প্রতিক্রিয়াকে আরবের প্রচলিত দীনের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক আখ্যা দেয়। একদিন সে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে-'কুরাইশের লোকেরা, আল্লাহর কসম, তোমরা আজ এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ, ইতোপূর্বে তার কোনো নজির নেই। তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ তোমাদের বংশেরই একজন। এখানেই সে বড় হয়েছে। সে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বাধিক আমানতদার। এবার মাঝবয়সে এসে সে যখন নতুন বার্তা নিয়ে এল, তোমরা তাকে জাদুকর বলতে শুরু করলে। আল্লাহর কসম, সে জাদুকর নয়। কেননা, আমরা জাদুকর এবং তাদের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে ভালো করেই জানি। তাকে কখনো বলো জ্যোতিষী। আল্লাহর কসম, সে জ্যোতিষী নয়। কেননা, আমরা জ্যোতিষী এবং তাদের অবস্থা খুব ভালো করেই প্রত্যক্ষ করেছি। কখনো বলো পাগল। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। কেননা আমরা

---

২৯৮ মুসতাদরাক, হাকিম- ৩৮২৭

পাগলামি এবং তার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের কর্মতৎপরতা ভালো করে ঠিক করে নাও। সত্যিই কি তোমাদের উপর অনেক বড় আপদ নেমে এসেছে?'[২৯৯]

উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে কথোপকথন

একদিন কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় সরদাররা মিলে তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান সরদার উতবা বিন রবিয়াকে বুঝিয়েসুজিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠায়। সে নবীজির কাছে গিয়েই বলে, তুমি উত্তম নাকি তোমার বাপ-দাদা উত্তম?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উত্তর দিলেন না। নবীজিকে নীরব দেখে সে বলতে থাকে, তারাই যদি উত্তম হয় তা হলে তারা তো বিভিন্ন উপাস্যের পূজা করতেন, তুমি যেগুলো ভুল বলছো। আর যদি তুমিই উত্তম হয়ে থাক, তা হলে তোমার অবস্থান পরিষ্কার করো, আমরা শুনব। আমাদের নিকট তো তোমার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কেউ জন্ম নেয়নি, যে আমাদের সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং আরবদের মাঝে আমাদের কলঙ্কিত করেছে। প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কুরাইশের মধ্যে একজন জাদুকর ও জ্যোতিষী রয়েছে।

জনশ্রুতি আছে যে, কুরাইশের মধ্যে একজন জাদুকর আছে, একজন জ্যোতিষী রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের অবস্থা তো তরবারি নিয়ে পরস্পরে সজ্ঘাতে লিপ্ত হওয়ার মতো। ভাই! তুমি যদি কোনো নারী চাও, তো আমরা তোমাকে দশজন নারীর সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেব। আর যদি ধনদৌলত চাও, তা হলে আমরা তোমাকে এত সম্পদ দেব যে, তুমিই কুরাইশের সবচেয়ে বড় সম্পদশালী হয়ে যাবে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ হয়ে সব কথা শোনার পর বললেন, 'তোমার যা বলার ছিল, সবকিছু বলা শেষ হয়েছে?' সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি এই আয়াতগুলো পাঠ করলেন,

حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ .

---

[২৯৯] দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২০১

'হা-মিম, এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না।'[৩০০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করছিলেন আর উতবা মাটিতে হাতে ভর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। নবীজি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন,

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

(অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আজাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আজাবের মতো)[৩০১] তখন উতবা এই আয়াত শোনার পর একেবারে দাঁড়িয়ে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে হাত রেখে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে এর চেয়ে অধিক তেলাওয়াত না করার অনুরোধ করে। পবিত্র কুরআনের আয়াত তাকে এমন কাবু করে ফেলে যে, সে ঘর থেকেই বের হতে পারছিল না।

এরপর অন্য মুশরিকরা এসে তার কুশল জিজ্ঞেস করে। সে পুরো ঘটনা বলে এবং রাসুলের মুখে হাত রাখার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, তোমরা তো জানো, মুহাম্মদ যা-ই বলে তা সত্য হয় এবং বাস্তবে ঘটে। আমি তো সে সময় 'আদ ও সামুদের বজ্রধ্বনি' কথাটি ছাড়া কিছুই বুঝিনি। তার কথা শুনে আমার তখন মনে হচ্ছিল সে যেন বলছে- না জানি বাস্তবেই তোমাদের উপর আজাব নাজিল হয়ে যায়।'

এরপর সে আরো বলে, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যা শুনিয়েছে, তা না জাদু, না কবিতা, না কোনো তন্ত্রমন্ত্র। তোমরা আমার একটা কথা মেনে নাও, এরপর আর কোনো কথা মান আর না-ই মান; এই ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। ও যা বলে নিশ্চিত তার বাস্তবায়ন হবে। আরবরা যদি তাকে কাবু করে ফেলতে পারে, তা হলে তো তোমাদের কিছু করার

---

৩০০ সুরা হামিম সিজদা, আয়াত ১-৪

৩০১ সুরা হামিম সিজদা, আয়াত ১৩

দরকার নেই। আর সে যদি আরবদের উপর বিজয়ী হয়, তা হলে তার বিজয় তোমাদেরই বিজয়। তার ইজ্জত-সম্মান তোমাদেরই গৌরব হবে।'

কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় সরদাররা উঠতে উঠতে বলে, 'মুহাম্মদের জাদু তোমাকেও কাবু করে ফেলেছে।'[৩০২]

তুফাইল বিন আমর দাওসির ইসলামগ্রহণ

এই সময়েই ইয়েমেনের দাওস গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তুফাইল বিন আমর মক্কায় আগমন করেন। মুশরিকরা অভ্যাস অনুযায়ী তাকে সাবধান করে দেয়। এখানে এক লোক এমন নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। তোমারও তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই তার কথা শুনতে যেয়ো না।

তুফাইল বিন আমর পেরেশান হয়ে কানে তুলা দিয়ে রাখলেন। কিন্তু একদিন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার নিকটে নামাজ পড়তে দেখলেন। তখন তার নিকটে গেলেন। নবীজির তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। আল্লাহ তায়ালার কালামের মাধুর্য এবং অলৌকিকতা তাকে একেবারে নির্বাক করে দিয়েছিল। স্বগতোক্তির মতো করে তিনি বলতে থাকলেন, 'আমি তো নিজেই কবি এবং প্রখর স্মৃতিধর ব্যক্তি। কথার ভালো-মন্দ যাচাই করার সক্ষমতা আমার আছে। তা হলে এই ব্যক্তির কথা শুনতে সমস্যা কোথায়! ভালো হলে তো ঠিক আছে, অন্যথায় পরিত্যাগ করব।'

নামাজ শেষ হওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার মোলাকাত হলো। তাওহিদের দাওয়াত শুনে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। ইয়েমেন ফিরে গিয়ে তিনি প্রথমে পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দেন। পিতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। এরপর কওমের মধ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিন্তু কওম সাড়া দেয়নি।[৩০৩]

---

[৩০২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ- ৩৬৫৬০; মুসতাদরাক, হাকিম- ৩০০২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৫৫-১৬০

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এই ঘটনা একাধিক সনদে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে তিন-চার সনদের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছি।

[৩০৩] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৮৩, ৩৮৪

কিছুদিন পর তিনি দ্বিতীয়বার মক্কায় এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, দাউস গোত্র জেদি। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে। আপনি তাদের উপর বদদোয়া করুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, দাউস গোত্রকে আপনি হেদায়েত দান করুন এবং তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন।'[৩০৪]

---

[৩০৪] সহিহ বুখারি- ৬৩৯৭ (কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুদ দোয়া আলাল মুশরিকিন) এই দোয়া কয়েক বছর পর কবুল হয়। দাউস গোত্র মুসলমান হয় এবং তাদের মধ্য থেকে আশিটি পরিবার ৭ হিজরিতে মদিনায় আগমন করে। [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৮৫]

অভয়াশ্রমের খোঁজে : হাবশায় হিজরত

কুরাইশের জুলুম-অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করে, মক্কার জমিন মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। শত্রুতা ও বৈরিতায় কুরাইশের সীমালংঘন করার দরুন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরীহ মজলুম মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা জরুরি মনে করছিলেন। কিছু সাহাবি অপারগ হয়ে নিজ থেকেই নবীজির নিকট অন্যকোনো দেশে চলে যাওয়ার আবেদন নিয়ে আসেন। কিন্তু অন্য দেশে যাওয়াটাও একদম মামুলি ব্যাপার ছিল না।

আরবভূমির সবচেয়ে নিকটবর্তী বড় শহর ছিল ইয়াসরিব। এর সাথে বনু হাশিমের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। কিন্তু ইয়াসরিবে দুই আরব কবিলা আউস-খাযরাজ তো নিজেরাই মুশরিক এবং মূর্তিপূজারি ছিল। উপরন্তু তারা মক্কার কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চাইত না। বিশেষত ঐ সময় তাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু ইহুদিরা তাদেরকে হেয় করার জন্য বিভিন্ন পাঁয়তারা করছে। এই অবস্থায় যদি তারা মক্কার মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেয়, তা হলে তাদের শত্রুতার মাত্রা আরো বেড়ে যাবে।

ইয়াসরিবে আশ্রয় নেওয়া এজন্যও উপযুক্ত ছিল না যে, হিজাজের এই অঞ্চলটি সর্বদা যুদ্ধে যুদ্ধে উত্তাল থাকত। কুরাইশই কেবল এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যথায় তারাও ইয়াসরিব এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরতিহীনভাবে চলা যুদ্ধ-বিবাদের বলী হতো। আউস-খাযরাজের অধীনস্থ কবিলাগুলো বার বারই পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হতো।

বনু নাযির, বনু কুরাইজ ও বনু কাইনুকার ইহুদিরা এই যুদ্ধের পালে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছিল এবং তাতে পূর্ণোদ্দমে শরিক হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহের এই ধারাকে 'হারবে সুমাইর' দ্বারা আরম্ভ হয়েছিল। এরপর অনবরত ইয়াওমুস সারারা, হারবু ফারি', হারবু হাতিব, ইয়াওমুর রাবি, ইয়াওমুল

বাকি, ইয়াওমু ফিজার'-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতিটি ঘরেই নিহতের ওয়ারিস ছিল, প্রত্যেক্যের বুকেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। এমন লোকেরা কীভাবে অন্যদের সমস্যার সমাধানের প্রতি আগ্রহী হবে?[৩০৫]

দক্ষিণ দিকে আরেক নিকটবর্তী দেশ ইয়েমেন। কিন্তু সেখানে সাবা এবং হিময়ার হুকুমতের অবসান হয়ে তিন দশক ধরে পারস্যের শাসন চলছে। তাদের মতো অহংকারী, গোঁড়া এবং স্বার্থপূজারি লোকেদের কাছ থেকে ভালো আচরণ আশা করা যায় না।

পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলীয় রাষ্ট্র হাবশা এমন একটি স্থান, যেখানে নিরীহ ও নিপীড়িত মুসলমানরা আশ্রয় নিতে পারে। যদিও মুসলমানদের জন্য তা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভূমি ছিল। উপরন্তু সেখানকার হুকুমত ও প্রজারা খ্রিষ্টান হওয়ার কারণে তাদের থেকে কোনোরূপ প্রতিরক্ষা এবং পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার আশাও ছিল না। তবে সেখানকার বাদশাহর ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তথ্য ছিল যে, তিনি ন্যায়-ইনসাফ পছন্দ করেন, কারো উপর জুলুম করার সুযোগ দেন না।

হাবশা লোহিতসাগরের তীরে হওয়ার কারণে আরবের অন্যান্য নগরীর তুলনায় মক্কার কুরাইশদের আয়ত্তের বাইরে ছিল এবং তাদের সামরিক অভিযান থেকেও ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। সর্বোপরি সেখানে যাওয়ার পথও প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ, আরব-ব্যবসায়ীরা একটা সময় পর্যন্ত জেদ্দা উপকূল থেকে নৌকায় পণ্যসামগ্রী বোঝাই করে হাবশায় নিয়ে যেত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাস্তবতা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতেন যে, হাবশা ইসলামের প্রচার-প্রসারের কেন্দ্র হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাজুকতা ও অবস্থার ক্রমাগত অবনতির কারণে এমন একটি ঠিকানার প্রয়োজন ছিল, যেখানে অন্তত মুসলমানরা শত্রুদের কবল থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সেখানে প্রয়োজন হলেই মুসলমানরা আশ্রয় নিতে পারবে।

[৩০৫] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৫৮৩-৬০১ (দারুল কিতাবিল আরাবি সংস্করণ)

হাবশায় প্রথম হিজরত

(রজব - নবুওয়াত ৫ম বর্ষ)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর আলোকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হাবশায় হিজরতের পরামর্শ দেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে কয়েকটি মুসলিম-পরিবার গোপনে মক্কা থেকে হাবশা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়।[৩০৬] তাদের মধ্যে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন নারী মুহাজির ছিলেন। এখানে তাদের সবার নাম উল্লেখ করা হলো :

১. হজরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।
২. তার স্ত্রী হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৩. হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৪. তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৫. হজরত আমের বিন রবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৬. তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসমা (উম্মে আবদুল্লাহ)।
৭. হজরত আবু হুযায়ফা বিন উকবা।
৮. তার স্ত্রী হজরত সাহলা বিনতে সুহাইল।
৯. হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম।
১০. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ।
১১. হজরত উসমান বিন মাজউন।
১২. হজরত মুসআব বিন উমাইর।
১৩. হজরত আবু মাসিরা বিন আবি রুহ্‌ম।
১৪. সুহাইল বিন বায়যা এবং
১৫. আবু হাতিব বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[৩০৭]

---

[৩০৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৫

[৩০৭] তারিখুত তাবারি- ২/২৩০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৫; সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩২১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৬৩

স্বাভাবিকতই মনে করা হয় যে, হাবশার মুহাজির কেবল নিঃস্ব ও নিরীহ ব্যক্তিরাই ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই কাফেলায় সর্বস্তরের লোকই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো অভিজাত এবং আমির-পর্যায়ের ব্যক্তি। ছিলেন জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি বাহাদুরি ও সাহসিকতায় প্রবাদতুল্য ছিলেন। অপরদিকে হজরত বিলাল বিন রাবা ও আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সবচেয়ে নিপীড়িত ব্যক্তিরাও ছিলেন। এসব মুহাজির সাহাবি আত্মগোপন করে থাকতেন। তারা এতটাই অক্ষম ছিলেন যে, মক্কা থেকে বের হওয়াই তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা হাসিমুখে সকল নির্যাতন সহ্য করতেন।

হিজরতে বের হওয়ার পরিকল্পনা এভাবে করা হলো যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক-দুজন করে মক্কা থেকে বের হবেন এবং দূরবর্তী জায়গায় গিয়ে সবাই মিলিত হবেন, যাতে করে মক্কাবাসীরা তাৎক্ষণিক টের না পায়।[৩০৮]

উম্মে আবদুল্লাহ এবং উমর বিন খাত্তাবের কথোপকথন

হজরত আমের বিন রবিয়া ও তার স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ তাদের সামানা উটের উপর বেঁধে মক্কা থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খুব জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যায়। ফলে তিনি তার স্ত্রীকে সেখানে রেখেই শহরে ফিরে আসেন।

সে সময় বনু আদির দুঃসাহসী যুবক উমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ তাকে বোধশক্তি, আত্মসম্ভ্রম এবং আভিজাত্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সামনে ন্যায় ও সত্য বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়ায় তখনও তিনি মুসলমান হননি। এজন্য স্বদেশি মুসলমানদেরকে পুরোনো ধর্মে ফিরিয়ে নিতে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। দুর্ভাগ্য হলো, উম্মে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা যেখানে আসবাবপত্র নিয়ে উটে বসে ছিলেন, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উমর যখন

---

[৩০৮] সামনে উল্লেখকৃত মুজামে কাবির তাবারানির বর্ণনা থেকে এই বিন্যাস বুঝা যায়।

সেখানে এসে তাকে দেখলেন, তখন পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো?'

পরবর্তীতে উম্মে আবদুল্লাহ এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছিলেন, 'উমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের কঠোর বিরোধী ছিলেন।' কিন্তু সেদিন আল্লাহ তায়ালা তার এক বান্দির মুখে সত্য উচ্চারণ করার মতো সাহস দিয়েছিলেন। ফলে তিনি সাতপাঁচ না বলে নির্ভয়ে সুস্পষ্টরূপে বলেন, 'তোমরা আমাদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে নির্যাতন করো। তো আমরা আল্লাহর জমিনের এমন এক জায়গায় যাচ্ছি, যেখানে আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে পারব, কেউ আমাদেরকে কোনো কষ্ট দেবে না।'

না জানি এই শব্দগুলো কত দরদি দিল থেকে উৎসারিত হয়েছিল, যা উমর বিন খাত্তাবের অন্তরেও আঘাত করেছে। তার চেহারায় অনুতাপ এবং দয়া-মায়ার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। মুখে শুধু এটুকু বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন।' -এতটুকু কথা বলে ভারীপদে তিনি প্রস্থান করেন। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল মুসলমানদের আপন দেশ ছেড়ে যাওয়াটা উমর বিন খাত্তাবের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। উম্মে আবদুল্লাহও নীরব হয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে আমের বিন রবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে পড়েন। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেন, এইমাত্র উমর এখান দিয়ে গেলেন। তবে আপনি যদি তার চেহারার সেই ব্যাকুলতা, পেরেশানি দেখতেন!'

আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে বলেন, কী, তোমার তার ইসলাম গ্রহণের আশা হচ্ছে?

স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ।

আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যতদিন না খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করবে, ততদিন খাত্তাবপুত্রও ইসলামধর্ম গ্রহণ করবে না।'[৩০৯]

---

[৩০৯] আলমুজামুল কাবির, তাবারানি- ২৫/২৯
আমের বিন রাবিয়া মূলত হজরত উমরের ইসলামের কট্টর বিরোধিতা দেখে এমনটি বলেছিলেন। তার জানা ছিল না এই উমরই একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় নিকটতম সাহাবি হবেন এবং মুসলমানদের দ্বিতীয়

হাবশায় আশ্রয়

মুহাজির সাহাবিগণ কিছু পায় হেঁটে আর কিছু সওয়ার হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে লোহিতসাগরের পাড়ে পৌঁছেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। হাবশাগামী দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ প্রস্তুত ছিল। আধা দিনার ভাড়ার বিনিময়ে তাদেরকে জাহাজে ওঠায়।

মুসলমানদের বেরিয়ে যাওয়ার সংবাদ কুরাইশদের কাছে একটু দেরিতে পৌঁছে। ফলে তারা যখন পিছু ধাওয়া করে উপকূলে আসে, ততক্ষণে জাহাজ-দুটি ছেড়ে দিয়েছিল। এভাবেই মুসলমানরা হাবশা পৌঁছে যায়। নাজাশি এই বিদেশি লোকদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিজ দেশে থাকার সুযোগ দেন। মুসলমানরাও আফ্রিকার এমন তীব্র গরম এবং অনুন্নত দেশে মক্কার তুলনায় অনেক সুখেই জীবনযাপন করতে লাগলেন।[৩১০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশত্যাগী মুসলমানদের নিয়ে চিন্তা করতেন। আপন কন্যা রুকাইয়া এবং জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেও তিনি পেরেশান ছিলেন। তাদের কোনো খবর পাচ্ছিলেন না। তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে আগত মুসাফিরদের নিকট হাবশার মুহাজিরদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। অবশেষে আফ্রিকা থেকে আগত কিছু নারী তাদের সম্পর্কে ভালো সংবাদ প্রদান করে বলে যে, 'আমি আপনার কন্যার সওয়ারিতে বসে এবং তার লাগাম ধরে দেখে এসেছি।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কলিজার টুকরা কন্যা এবং জামাতার জীবিত থাকা এবং নিরাপদ থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের সঙ্গী হোন। নিঃসন্দেহে উসমান লুত

খলিফা হবেন। আসলে হেদায়েত এবং ইজ্জত-সম্মান তো আল্লাহ তায়ালার হাতে।

৩১০ তারিখুত তাবারি- ২/৩২৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৫; আসসিরাতুল হালাবিয়াহ- ১/৪৫৮
অনেক বর্ণনাকারী প্রথম মুহাজিরদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর বিন আবু তালিব এবং তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো, এই সাহাবিরা প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন। সামনে সূত্রসহ তার আলোচনা আসবে।

আলাইহিস সালামের পর পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরতকারী প্রথম ব্যক্তি।'[৩১১]

সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও অবিচলতার বিধান

মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করে চলে যাওয়ার পর মক্কায় থেকে যাওয়া সাহাবিগণের উপর কাফেররা পূর্বের চেয়ে অধিক নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করে। তারাও কাফেরদের সবরকম নিপীড়ন সীমাহীন ধৈর্যের সাথে সয়ে যাচ্ছিলেন। ইচ্ছা করলে তারা শক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিরত রাখেন।

একদিন তো হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেই ফেলেন যে, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা মুশরিক অবস্থায় তো ইজ্জত-সম্মানের সাথে ছিলাম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে আমরা দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে গেলাম!!'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আমাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা সংঘাতে জড়াবে না।'[৩১২]

এর পেছনে হেকমত ছিল, দুর্বলদের উপর সবলদের সাময়িক প্রাবল্য দেখা গেলেও, পুরোপুরি কর্তৃত্ব তাদের হাতে কখনোই আসবে না। ফলে শত্রুদের কেবল বৈরিতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের উপর বিপর্যয়ও বেড়ে যাবে।

---

[৩১১] ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ- ৬৬২৭, উসদুল গাবাহ- (রুকাইয়া বিনতে রাসুলিল্লাহর জীবনী দ্রষ্টব্য), আলআহাদ ওয়াল মাসানি, ইবনে আবি আসিম- ১২৩

[৩১২] সুনান নাসায়ি- ৩০৮৬

(يا رسول الله! إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا)

ইসলামের নতুন ত্রাণকর্তা

ইসলামের নাম নেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যা কম ছিল। দীন ইসলাম তখনও অজানা পৃথিবীতেই ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার দীনের জন্য একজন মদদগার তৈরি করার ফয়সালা করলেন। নবীজির চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব ৪০-৪৫ বছর বয়সি একজন বিখ্যাত বীর এবং বড়মাপের যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল তরবারি দ্বারা রক্ষাই করেননি বরং ইসলামেও দীক্ষিত হন।

একদিন আবু জাহল সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অনেক মানুষের সামনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক অপমান ও গালিগালাজ করে। একজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজপথে বেইজ্জতি ও লাঞ্ছিত করার দৃশ্য ন্যূনতম অনুভূতিসম্পন্ন কোনো মানুষ সহ্য করতে পারবে না। হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব সেদিন তার অভ্যাসমতো শিকার ও তিরন্দাজি শেষ করে ঘরে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একজন মহিলা তাকে দেখে বলে, 'আবু উমারা, আজ তো তোমার ভাতিজাকে আবু জাহল অনেক কষ্ট দিয়েছে। গালিগালাজ করেছে এবং অনেক মন্দ কথা বলেছে।' -এ কথা শুনেই হামজা অগ্নিশর্মা হয়ে আবু জাহলকে খুঁজতে থাকেন। দেখলেন, সে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে কুরাইশের একটা মজলিসে বসে আছে। সেখানে গিয়েই দুই হাত উত্তোলন করে ধনুক দিয়ে আবু জাহলের খুপড়িতে এত জোরে আঘাত করলেন, তার মাথা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।'

কুরাইশ তখন হামজাকে বিদ্রুপ করে বলতে থাকে, 'আবু উমারা, তুমি তো আগে এতটা অথর্ব ছিলে না; তুমিও কি মুসলমান হয়ে গেছো?'

মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য এটিই ছিল মোক্ষম সুযোগ। হজরত হামজা হৃদয়ের গভীর থেকে তার ভাতিজার সততা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি

কালবিলম্ব না করে ঘোষণা দেন, 'হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। সে আল্লাহর নিকট থেকে সত্য দীন নিয়ে এসেছে।' এরই সাথে তিনি কুরাইশকে সতর্ক করে দেন, 'আজকে তো ছিল ধনুকের আঘাত, আগামীতে তলোয়ারের মার হবে।'

কুরাইশের সরদারদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। তাদের আশঙ্কা হতে থাকে, এমন বাহাদুর ব্যক্তিদের ইসলামগ্রহণের কারণে মুসলমানদের প্রতিহত করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।[৩১৩]

---

[৩১৩] আল-মুসতাদরাক, হাকিম- ৪৮৭৮

হজরত উমরের ইসলাম গ্রহণ

(যিলহজ নবুওয়াতের ৫ম বর্ষ)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরাইশের এত শত্রুতা, নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি এমনসব বিশেষ ব্যক্তির হেদায়েতের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন, যাদের মধ্যে সত্যান্বেষণ, সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ এবং নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। যদিও তারা ইসলামের অনেক বিরোধিতা করত এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বহু কষ্ট দিত।

এটা ছিল প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতা এবং দিলের প্রশস্ততা। এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট তিনি দোয়াও করতেন। কুরাইশের দুই ব্যক্তির মাঝে তিনি নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

একজন আমর বিন হিশাম (আবু জাহল); বিরোধিতা, দুষ্টামি এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। অপরজন ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর ও দুঃসাহসী বীর। আটাশ বছর বয়সি যুবক উমর বিন খাত্তাব। বীরত্ব, হিম্মত এবং রণকৌশলে তিনি ছিলেন অনন্য। এক দুটি ঘটনা এমন ছিল, যার বদৌলতে তার দিলে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কিছুটা অনুভূতি তৈরি হয়েছিল।

আশার বাণী

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দীনের প্রচার-প্রসারের কাজ শুরু করার কয়েকদিন পূর্বে উমর একদা হারামের চত্বরে শুয়ে ছিলেন। তখন একজন লোক এসে মূর্তির সামনে প্রাণী জবাই করল। এমন সময় বিকট আওয়াজ শোনা গেল। এক ব্যক্তি বলছে,

"يا جَلِيح! أمرٌ نَجِيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله".

'হে জালিহ, খুশির কথা, একজন বিশুদ্ধভাষী লোক বলছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'

হজরত উমর এই আওয়াজ শুনে যারপরনাই বিস্মিত হন। তিনি বক্তাকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথাও তার হদিস পেলেন না। এর কয়েকদিন পর থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের আলোচনা হতে থাকে।[৩১৪]

হজরত উমরের চুপিসারে নবীজির তেলাওয়াত শ্রবণ

একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামাজে সুরা হাক্কাহ তেলাওয়াত করছিলেন। হজরত উমর চুপিসারে তা শুনছিলেন। কুরআন কারিমের স্বর ও মর্মের সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে তোলে, মনে মনে বলতে লাগলেন, 'এই ব্যক্তি তো কবি'। আর তখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

এটি কোনো কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান আন।

হজরত উমর পেরেশান হয়ে পড়লেন। তিনি আমার দিলের কথা কীভাবে জানলেন! নিশ্চয় তিনি জাদুকর। এ সময়ই নবীজিকে পড়তে শুনলেন,

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

এটি কোনো জাদুকরের কথা নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

সেদিনই হজরত উমরের দিলে ইসলামের বীজ রোপিত হয়।[৩১৫]

হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন কুরাইশরা ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়ে। ইসলামকে তারা কীভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, সেজন্য তাদের দৌড়ঝাঁপ বেড়ে যায়।

একদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার রাত থেকে এই দোয়া করছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমর বিন হিশাম কিংবা উমর বিন

---

[৩১৪] সহিহ বুখারি- ৩৮৬৬ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইসলামি উমর বিন খাত্তাব রা.)
[৩১৫] মুসনাদ আহমাদ- ১০৭, কানযুল উম্মাল- ৩৫৭৩৯

খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।' অপরদিকে কুরাইশ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হয়েছেন তিনদিন হলো। আবু জাহলের উসকানিতে কুরাইশের প্রতিশোধের আগুন প্রশমিত করার দায়িত্ব হজরত উমর বিন খাত্তাব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তিনি তরবারি উঁচিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে নুয়াইম বিন আবদুল্লাহ আন-নাহহাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি গোপনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত উমরের ভাবমূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'উমর, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?'

বললেন, মুহাম্মদের উদ্দেশে যাচ্ছি। সে তো কুরাইশের প্রাজ্ঞ লোকদের মূর্খ আখ্যা দিচ্ছে। আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলে এবং আমাদের সমাজের বিরোধিতা করে।'

হজরত নুয়াইম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, উমর, অত্যন্ত খারাপ কাজে যাচ্ছেন। যদি মুহাম্মদকে হত্যা করেন, তা হলে বনু হাশিম, বনু জুহরা আপনাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন?'

কিন্তু হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে হজরত নুয়াইম তার চিন্তা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল আঁটলেন। তার আত্মসম্মানে আঘাত করার চিন্তা করলেন। বললেন, উমর, প্রথমে তো নিজের ঘরের খবর নেন! বোন ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি সাঈদও তো মুসলমান হয়ে গেছে।'[৩১৬]

---

৩১৬ স্বাভাবিকতই মনে হবে- হজরত উমর রা. আগে থেকে তার বোন এবং ভগ্নীপতির ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে জানতেন না; এ কথা সহিহ নয়। কারণ, স্বয়ং সাঈদ বিন যায়েদ রা. বলেন, উমর রা. এর ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমার এবং তার বোনের মুসলমান হওয়ার কারণে তিনি আমাদেরকে শেকলে বেঁধে রাখতেন। [সহিহ বুখারি- কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইসলামি সাঈদ বিন যায়েদ রা., আততারিখুল আওসাত, বুখারি- ১/১১২, দারুল ওয়ী সংস্করণ]
তাই হজরত উমরের ইসলামগ্রহণের সময়ই তিনি তার বোন এবং ভগ্নীপতির মুসলমান হওয়ার কথা জানতে পারেন- কথাটি ভুল। বাস্তবতা হলো, তিনি আগে থেকেই জানতেন; কিন্তু তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা অবস্থায় যখন এমন খোঁচা শুনতে

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বোনের বাড়িতে পৌঁছেন, তখন ভেতর থেকে কুরআন পড়ার এবং পাঠদানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন পড়াচ্ছিলেন। হজরত উমর খুব জোরে দরজার কড়া নাড়েন। বোন জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, 'উমর'। তিনি ঘাবড়ে যান। হজরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ত্বরিত গতিতে কোনো নিভৃত কামরায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। এরপর ফাতেমা বিনতে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা দরজা খুলে দেন। উমর ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করেন, তোমরা সবাই কী পড়ছিলে?

বোন-ভগ্নীপতি উত্তর দেন, আমরা তো পরস্পর কথা বলছিলাম।

উমর তখন হুংকার ছেড়ে বললেন, 'আমি জানি তোমরা বিধর্মী হয়ে গেছো।'

সাঈদ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, 'আচ্ছা উমর, যদি তোমাদের দীন ছাড়া অন্য দীনের মধ্যে সততা মিলে, তা হলে তুমি কী করবে?'

এটা শুনেই উমর সাঈদ বিন যায়েদকে মাটিতে ফেলে নির্দয়ভাবে পেটাতে লাগলেন। বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে উমর তাকে এত জোরে থাপ্পড় দেন যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'খাত্তাবের পুত্র, তোমার যা মন চায় করো। আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।'

বোনের মুখে এই কথা শুনে এবং তার চেহারায় রক্ত দেখে হজরত উমরের রাগ পড়ে যায়। তিনি চৌকির উপর বসে বোনকে বলতে লাগলেন, 'তোমরা কী পড়ছিলে, আমাকে দেখাও।'

বোন বললেন, 'তুমি অপবিত্র। এই গ্রন্থ কেবল পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে। তাই প্রথমে তুমি গোসল করে এসো।'

পান; তখন প্রথমে এই মাসআলা খতম করার কথা মাথায় চড়ে বসে এবং যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তার কথা ভুলে যান।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসল করার কারণে দেহের অভ্যন্তরে ঘনীভূত হয়ে থাকা ময়লা-আবর্জনাও পরিষ্কার হয়ে যায়। এবার বোন অহি লেখা কাগজগুলো তার সম্মুখে পেশ করেন। কাগজে তখন সুরা তহার আয়াত লেখা ছিল, যা তখন নাজিল হয়েছিল।

হজরত উমর আয়াত পড়তে থাকেন আর দিলের মধ্যে ঈমানের আলোয় আলোকিত হতে থাকেন। এরপর তিনি অস্থির হয়ে বলতে থাকেন, 'আমাকে নবীজির নিকট নিয়ে চলো।'[৩১৭]

---

[৩১৭] হজরত উমরের ইসলামগ্রহণের সময়কাল সংক্রান্ত আলোচনা:
হজরত হামজা রা. এর ইসলামগ্রহণের তিনদিন পর হজরত উমর রা. মুসলমান হন। [দালাইলুন নুবুওয়াহ- আবু নাঈম, পৃষ্ঠা ২৪১]
এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, ইসলামের এই শক্তি অর্জন হাবশায় প্রথম হিজরত এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য গমনকারী কুরাইশ প্রতিনিধিদলের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পরই সংঘটিত হয়েছে। নিচের আরবিপাঠ দেখুন-
كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة
'উমরের ইসলামগ্রহণ হাবশায় (১ম) হিজরতকারী মুসলমানদের মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর।' [সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১৮১, সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৪২, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৭০]
এ সময় চল্লিশের কিছু বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/২৬৯]
তন্মধ্যে ১১জন পুরুষ এবং ৪জন মহিলা হাবশা হিজরত করে চলে গিয়েছিল। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,৪/১৬৫]
মোদ্দাকথা, প্রথম হাবশা হিজরতের পরের ঘটনা এটি। পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত হয়ে যায় যে, প্রথম হাবশা হিজরত রজব পঞ্চম নবুওয়াতবর্ষে হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,৪/১৬৫]
এর ক'দিন পর হজরত উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেন?
ইবনুল জাওযি রহ. নবুওয়াতবর্ষের কথা উল্লেখ করেন। [আলমুনতাযাম- ২/৩৮৪৮]
আল্লামা সালেহ আশশামি আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, এটি নববি ষষ্ঠবর্ষের যিলহজ মাসে এবং প্রথম হিজরত ও দ্বিতীয় হাবশা হিজরতের মাঝামাঝি সময় সংঘটিত হয়। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৭০]
কিন্তু ঐ সময়টাকে যদি তার বাহ্যিক দৃশ্যপটের উপর বিবেচনা করি, তা হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, হজরত উমর রা. মুসলমান হয়েছেন মুসলমানদের প্রথম হাবশা হিজরতের (রজব ৫ নববি-বর্ষ) দেড় বছর পর। ঘটনার গতিবিধির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তার ইসলামগ্রহণ এবং হাবশা হিজরতের মাঝে তেমন পার্থক্য

হজরত উমরের এই কথা শুনে খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কামরা থেকে বের হয়ে এসে বলেন, 'উমর, তোমাকে মোবারকবাদ! জুমার রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমর বিন হিশাম কিংবা উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন।' মনে হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তোমার ক্ষেত্রে নবীজির দোয়া কবুল করেছেন।[৩১৮]

নেই। কারণ, স্বয়ং প্রথম হিজরত ও দ্বিতীয় হাবশা হিজরতের মাঝেই সর্বোচ্চ দেড় বছর তারতম্য।

মূলকথা হলো, তাদের এই বছর গণনা মূলত নবুওয়াতের সময়টাকে মূল ধরে হতো। ফলে এক মত অনুযায়ী বছর হয় রবিউল আওয়াল থেকে রবিউল আওয়াল। আরেক মত অনুযায়ী রমজান থেকে রমজান। কিন্তু ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই মহররম থেকে মহররম পর্যন্ত বছর গণনা করেছেন। যদিও কেউ কেউ কোথাও কোথাও এর বিপরীত রীতি অনুসারে বছরের হিসাব করেছেন। কিন্তু একে সাধারণ নববি-বর্ষের হিসাবের সাথে যুক্ত করলে দ্বিধা-সংশয়ে পড়তে হয়। এ স্থানে কিছু বর্ণনাকারী যে যিলহজের কথা বলেছেন, মূল বর্ষ গণনা, অর্থাৎ রমজান থেকে রমজানের হিসাব অনুসারে নববি ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ মাস ছিল। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী তা পঞ্চম নববি-বর্ষের যিলহজ মাস হয়। অপরদিকে পঞ্চম নববি-বর্ষের রজব মাস এবং উমর রা. এর ইসলামগ্রহণের মাঝে কেবল পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়।

এখন ঘটনার বিবরণ এরকম হয় যে, পঞ্চম নববি-বর্ষের রজব মাসে প্রথম হাবশা হিজরত হয়। আর এর জন্যই হজরত উমর ক্ষিপ্ত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি চুপিসারে নবীজির তেলাওয়াত শুনতেন। এরপর যিলহজ মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তখন থেকেই মুসলমানদের উপর ব্যক্তিগত নির্যাতনও হ্রাস পায়। সাধারণভাবেই উক্ত সংবাদগুলো বিভিন্ন উপায়ে হাবশা পৌঁছে। ফলে তারা ষষ্ঠ নববি-বর্ষের মাঝামাঝিতে মক্কা ফিরে আসেন।

মুশরিকরা অস্থির হয়ে বনু হাশিমের উপর চাপপ্রয়োগ করে এবং অন্যান্য মুসলমানের উপর সামাজিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়। যার কারণে বড় সংখ্যক মুসলমান দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত সফর করতে বাধ্য হন। এরপর হয় শেবে আবু তালিবের বয়কট। এক মত অনুযায়ী তা হয়েছিল ৭ নববি-বর্ষ মহররম মাসে। আরেকমত অনুযায়ী ৮ নববি-বর্ষ মহররম মাসে।

এর থেকে অনুমিত হয় যে, শিআবে আবু তালিবের বয়কটের কিছুদিন পূর্বে হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত হয়েছিল। এক-দু'জন করে হিজরতের ধারা বয়কটের পরেও চালু ছিল। যেমন হজরত আবু বকর রা. এর হাবশা হিজরত-প্রচেষ্টার কথা সিরাতে ইবনে হিশামে শেবে আবু তালিবে বয়কটের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩১৮] কানযুল উম্মাল- ৩৫৭৪০; দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২১৫-২২৩ (বাবু যিকরে ইসলামি উমর)

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সোজা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত হজরত আরকামের ঘরের কাছে পৌঁছে গেলেন। এখানে নবীজি তার প্রায় চল্লিশজন সাহাবিকে নিয়ে (যারা হাবশা হিজরত করেননি) পুরো পৃথিবীতে দীন ইসলামকে জিন্দা করার ফিকিরে মশগুল ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর, আলি এবং হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমও উপস্থিত ছিলেন।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজার কড়া নাড়লেন। এক সাহাবি দরজার ফোঁকড় দিয়ে দেখে বললেন, 'উমর তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাকে আসতে দাও। যদি সে সৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তা হলে তো ভালো। অন্যথায় আমরা তার তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করব।'

হজরত উমর যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তার কিছু বলার পূর্বেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিরস্কার করে বলেন, 'উমর, আল্লাহর তরফ থেকে লাঞ্ছনা এবং শাস্তি আসার পূর্বে কি তোমার সংযত হওয়ার সময় হবে না?'

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, এ হলো উমর বিন খাত্তাব। হে প্রভু, তার মাধ্যমে দীনের ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে দিন।'

এবার হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে থাকেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল।'

মুসলমানরা তা শুনে এত উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দেন যে, পুরো মক্কার অলিগলিতে যেন তা গুঞ্জরিত হয়েছে।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, তিনি যেন এখন থেকে প্রকাশ্যে তাবলিগ করেন।[৩১৯]

---

[৩১৯] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৪৩-৩৪৬, কানযুল উম্মাল- ৩৫৭৪০, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/২১৫-২২৩ (বাবু যিকরি ইসলামি উমর) যদিও হজরত উমর রা. এর ইসলামগ্রহণের রেওয়ায়েতগুলো সনদের দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরদিন সকালে মসজিদে হারামে গিয়ে কাফেরদের সম্মুখে নিজের ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেন। কাফেররা একযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি একাই তাদের মোকাবেলা করেন। দীর্ঘসময় পর্যন্ত তাদের মাঝে ঝগড়া হয়। পরিশেষে কাফেররা হতাশ হয়ে পিছু হটে। হজরত উমরের ইসলামগ্রহণের সংবাদে সমগ্র মক্কায় হইচই পড়ে যায়।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলতেন, 'উমর বিন খাত্তাবের ইসলামগ্রহণ ছিল ইসলামের বিজয়। তার ইসলামকবুলের পূর্বে আমরা কাবার সামনে স্বাধীনভাবে নামাজ আদায় করতে পারতাম না। তিনি যখন মুসলমান হলেন, তখন তিনি কুরাইশের সঙ্গে লড়াই করেন এবং কাবার সামনে নামাজ আদায় করেন। তার সাথে সাথে আমরা নামাজ পড়ি।'[৩২০]

সকল সিরাতগ্রন্থকারই তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাই এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই।

[৩২০] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৪২। এর দ্বারাই পরিষ্কার হয় যে, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. প্রথমবার হাবশা হিজরতকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

(নবুওয়াত ষষ্ঠবর্ষের মাঝামাঝি)

হাবশার মুহাজিরদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, নবীজি এবং মুসলমানদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন বন্ধ হয়েছে। এই কথা এভাবে চাউর হয় যে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামাজে সুরা নাজম তেলাওয়াত করছিলেন। এটিই প্রথম সুরা, যার মধ্যে সেজদার আয়াত নাজিল হয়। সুরার শেষ আয়াত পড়ে যখন তিনি সেজদায় গেলেন, তখন মুসলমানদের পাশাপাশি উপস্থিত মুশরিকদেরও এমন অবস্থা হলো যে, তারাও মুসলমানদের সঙ্গে সেজদাবনত হয়। এমনকি জিনরাও সেজদা করে। দৃশ্যপটের প্রত্যক্ষদর্শী হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেবল একজন মুশরিক দাঁড়িয়ে একমুষ্ঠি মাটি নিয়ে তার কপালে রেখে দেয়। পরবর্তীতে সে বদরযুদ্ধে নিহত হয়।[৩২১]

উপর্যুক্ত সংবাদটা অনেক বাড়িয়ে-চড়িয়ে হাবশায় প্রচার করা হয়। যেহেতু সুরা নাজমে কাফেরদের উপাস্য লাত-মানাত-উজ্জার আলোচনা এসেছে, তাই এর মধ্যে কিছু শব্দ বাড়িয়ে মক্কার কাফেররা প্রচার করতে থাকে যে, (নাউজুবিল্লাহ) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদের মূর্তির প্রশংসা করছেন।[৩২২]

---

[৩২১] সহিহ বুখারি- ৪৮৬২, ৪৮৬৩ (কিতাবুত তাফসির)
আল্লামা হালাবি এই ঘটনার তারিখ পঞ্চম নববি-বর্ষ রমজান মাস উল্লেখ করেছেন। [সিরাতে হালাবিয়্যাহ- 1/8৫৮] তবে আনুমানিক যিলকদ, যিলহজের মাঝেই এই সংবাদ হাবশায় পৌঁছে গিয়ে থাকবে। এর উপর নির্ভর করেই বলা যায় ষষ্ঠ নববি-বর্ষের প্রারম্ভেই মুহাজিরিনে হাবশার প্রত্যাবর্তন শুরু হয়।

[৩২২] কিছু তাফসির যেমন তারিখুত তাবারি- তাবাকাতে ইবনে সাদ ইত্যাদি কিতাবের কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা নাজম পড়তে পড়তে যখন তিনি লাত-মানাতের আলোচনার আয়াতে পৌঁছেন, তখন শয়তান নবীজির জবানে এই শব্দগুলো উচ্চারিত করান:

تلك الغرانيق العُلى* وان شفاعتهن لتُرتجى

এর বিপরীতে কিছু লোক যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কার কাফেরদেরকেও সেজদা করতে দেখে, তখন তারা মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয় যে, কাফেররাও সেজদা করেছে এবং সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। প্রকৃত সেজদাকারীরাও বিশেষ এক পদ্ধতিতে সেজদা করেছে।

অন্যদিকে আবু জাহল, নজর বিন হারিস, উকবা বিন আবি মুয়াইত, আস বিন আবু ওয়াইলের মতো ইসলামের বড় বড় দুশমনরা (কাফের

(অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো শ্রদ্ধার পাত্র এবং এগুলোর শাফাআতও গ্রহণযোগ্য)
এটা শুনে কাফেররা বড় আনন্দিত হয় এবং ভাবে যে নবীজিও তাদের স্বধর্মী হয়ে গেছেন। ফলে আয়াতে সেজদার সময় তার সঙ্গে সেজদাও করে। [তারিখুত তাবারি- ২/৩৪০, তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২০৫]
এ ধরনের সকল রেওয়ায়েত সনদ এবং মতনের দিক থেকে বাতিল। আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, 'এই কথাটি শয়তান জিন বা মানব শয়তানের ছিল, যা মুশরিকরা শুনতে পেয়েছিল; কারণ তাদের অভ্যাসই ছিল নবীজির তেলাওয়াতের সময় হট্টগোল করা, চেঁচামেচি করা। পবিত্র কুরআনে তাদের এই অভ্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমরা এই কুরআন শোনো না, এবং তার তেলাওয়াতের সময় গোলমাল বাঁধিয়ে দাও।' [সুরা হামিম সাজদাহ- ২৬]
এই সুরা শোনার পর কিছু শয়তান আগের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করে। মুশরিকরা তখন ভাবে এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কারণ, এই শব্দগুলো নবীজির তেলাওয়াতের সময়ই উচ্চারিত হয়। প্রশ্ন হয় যে, এধরনের বাক্য উচ্চারিত হওয়া কি নবীজির পবিত্র জবান থেকে সম্ভব? উত্তর- এটা কখনোই সম্ভব নয়। আপনারা কিছু কিছু তাফসিরগ্রন্থে এই শব্দগুলো লেখা দেখে কেউ ধোঁকা খাবেন না যে, এসব শব্দ নবীজির মুখে উচ্চারিত হয়েছে। যদি এগুলো বিশুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়, তা হলে সত্য-মিথ্যার মাঝে মিশ্রণ হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ ও অকাট্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও কখনো এমন সন্দেহ জাগতে পারে যে, এটাও হয়তো শয়তানের কথা। অথচ আল্লাহ তায়ালা শয়তান থেকে নবীদের মাহফুজ রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা ওহিকে শয়তান থেকে মাহফুজ রাখার ব্যাপারে ইরশাদ করছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার আগে-পিছনের মুহাফিজ ফেরেশতা পাঠিয়েছেন।' (সুরা জিন, আয়াত ২৭) [কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন: ১/২৭৪, ২৭৫]
একাধিক গবেষক উক্ত রেওয়ায়েত অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। [উমদাতুল কারি- ৭/১০০, মিরকাতুল মাফাতিহ- ২/৮০৯] শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রহ. এ বিষয়ে 'নাসবুল মানাজিক লিনাসফি কিসসাতিল গারানিক' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন, উক্ত রেওয়ায়েতের কোনো সহিহ সনদ নেই। পুস্তিকাটি অধ্যয়নযোগ্য।

অবস্থাতেই যাদের মৃত্যু হয়) কিন্তু সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৩২৩] এজন্য সবার মুসলমান হয়ে যাওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। কিন্তু এই ভুল সংবাদই হাবশায় পৌঁছে যায়। মুহাজিররা তা শুনেই আপন দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা দিয়ে দেয়।[৩২৪]

সর্বোপরি, মুহাজিররা যখন মক্কার সন্নিকটে পৌঁছেন, তখন তাদের কর্ণগোচর হয় যে, কুরাইশ ইসলামের শত্রুতার ব্যাপারে আপন অবস্থাতেই আছে। তখন মুহাজিররা পেরেশান হয়ে যান। কেউ কেউ তো সেখান থেকেই পুনরায় হাবশা চলে যান। বাকিরা সাময়িক বা কোনো কুরাইশির নিরাপত্তা ও আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। যেমন আবু সালামা এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু তালেবের আশ্রয়ে চলে আসেন। উসমান বিন মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালিদ বিন মুগিরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে সাময়িকের জন্য হলেও কুরাইশের নেতাগিরি থেকে রেহাই পান।[৩২৫]

আবারো জুলুমের সম্মুখীন

যেসব মুসলমান কারো আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেননি, তারা পুনরায় অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার শিকার হন। এটা দেখে একদিন হজরত উসমান বিন মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহুর আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে। তিনি ওয়ালিদকে বলেন, 'তোমার পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রতিরক্ষা আমার আর প্রয়োজন নেই।'

---

[৩২৩] আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ঐ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মুশরিকদের মধ্যে উমাইয়া বিন খালাফের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায়, যেসব মুশরিক সেজদায় শরিক হয়েছিল, পরবর্তীতে তাদের ইসলামগ্রহণের তাওফিক হয়েছিল এবং সুন্দর মৃত্যুও হয়েছিল। [ফাতহুল বারি- ২/৫৫৪] অন্যদিকে আবু জাহল, উকবা বিন আবু মুয়াইত, আস বিন আবু ওয়াইল, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে; সম্ভবত তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিতই ছিল না।

[৩২৪] এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, হজরত হামজা এবং হজরত উমর-এর ইসলামগ্রহণে মুশরিকরা তাৎক্ষণিক ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতনের মাত্রা তুলনামূলক হ্রাস পেয়েছিল। তাই হতে পারে, এই প্রেক্ষাপটের সংবাদও মুহাজিরদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অনুপ্রাণিত করে।

[৩২৫] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৬৯

মুশরিকরা তো এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল। ফলে এ জায়গায় এক মুশরিক তাকে এই পরিমাণ প্রহার করে যে, একটি চোখ প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ওয়ালিদ তখন তাকে তিরস্কার করে বলে, 'আগে তোমার চোখ সংরক্ষিত ছিল, তুমি শক্তিশালী একটি আশ্রয়ে ছিলে।'

হজরত উসমান দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার অপর চোখটিও এমন বিপদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'[৩২৬]

---

[৩২৬] প্রাগুক্ত- ১/৩৭০-৩৭১

দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত

(ষষ্ঠ নববিবর্ষের শেষে)

পূর্বের তুলনায় মুসলমানদের জন্য জীবনযাপন করা কঠিনতর হয়ে যায়। বিশেষ করে নাজাশির নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে দিনাতিপাত করার পর কুরাইশের এই অত্যাচার ও কঠোরতা বরদাশত করা সত্যিই কঠিন ছিল। ফলে আরেকবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তারা হাবশায় হিজরতের অনুমতি চান। তিনি সাহাবিদেরকে সানন্দেই অনুমতি প্রদান করেন।

সাবেক মুহাজিরদের সাথে এবারের কাফেলায় আরো মুসলমান যুক্ত হয়। এবার হিজরত করেছিলেন ৮৮জন পুরুষ এবং ১৯জন নারী। তাদের মধ্যে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর বিন আবু তালেব, মিকদাদ বিন আসওয়াদ, শুরাহবিল বিন আবদুল্লাহ (শুরাহবিল বিন হাসানা), সাকরান বিন আমর ও তার স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ, উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান, তার স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ এই কাফেলায় ছিলেন। হজরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফেলার আমির নিযুক্ত করা হয়।[৩২৭]

---

[৩২৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/১৬৯

কিছু কিছু বর্ণনায় মুহাজিরদের মধ্যে হজরত জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু সালামা এবং তার স্ত্রী উম্মে সালামা রা. এর নাম উল্লেখ করা হয় না, বরং তারা প্রথমবার হিজরতে শামিল ছিলেন। অথচ সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, উল্লিখিত সবাই দ্বিতীয় ৮০জনের কাফেলায় শামিল ছিলেন এবং তাদের আমির ছিলেন জাফর রা.। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সা আমাদেরকে নাজাশির নিকট পাঠিয়েছেন, আমরা ছিলাম প্রায় আশিজন লোক। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর... ।' [মুসনাদ আহমাদ- ৪৪০০]

হাবশা পৌঁছার পর নাজাশির দরবারে জাফর রা. এর বক্তব্য বর্ণিত আছে। উম্মে সালামা রা. এর বর্ণনাও গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। তার বর্ণনায় তিনি জাফর রা. এর বক্তব্য দিয়েই শুরু এবং কুরাইশ প্রতিনিধির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করার

উপরন্তু প্রথম হিজরতকারী কয়েকজন সাহাবি যেমন: হজরত রুকাইয়া, উসমান বিন আফফান, উসমান বিন মাজউন প্রমুখ দ্বিতীয় কাফেলায় শরিক না হয়ে মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।[৩২৮]

পর তিনি বলেন, 'এরপর আমরা তার নিকট উত্তম ঘরে উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে অবস্থান করেছি।' তারপর নাজাশির দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে উম্মে সালামা রা. হজরত জুবাইর রা. এর দুঃসাহসিকতার ঘটনা শোনান। [মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮, সনদ হাসান]

[৩২৮] আলইসতিয়াব, আলইসাবাহ, উসদুল গাবা, মারিফাতুস সাহাবাহ পড়ুন তাদের সে সময়কার অবস্থা জানার জন্য। তাদের রেওয়ায়েতগুলোতে দৃষ্টি বুলালে জানা যায়, তারা দ্বিতীয়বার হাবশা যাননি, বরং কয়েক বছর পর নবীজির নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করেন। আর ৭ম হিজরিতে হাবশার মুহাজিররাও মদিনায় চলে আসেন।

নাজাশির দরবারে কুরাইশের প্রতিনিধিদল

(সপ্তম নববিবর্ষের শুরুতে)

কুরাইশরা যখন জানতে পারে মুসলমানরা হাবশায় গিয়ে নিরাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছে, তখন তাদের খুব গোসসা হয়। তারা আমর বিন আস এবং আবদুল্লাহ বিন আবু রবিয়াকে দূত হিসেবে হাবশার বাদশাহ নাজাশির নিকট এ দাবি দিয়ে প্রেরণ করে যে, এ লোকগুলো বিধর্মী এবং বিশৃঙ্খলাকারী। তাদেরকে আপনার দেশে থাকার অনুমতি না দিয়ে আমাদের হস্তান্তর করুন।

নাজাশি একজন বুদ্ধিমান এবং ইনসাফপ্রিয় বাদশাহ ছিলেন। তিনি একপক্ষের অভিযোগ শুনেই কোনো ফয়সালা না দিয়ে মুসলমানদের আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেন এবং তাদের আপত্তির জবাব তলব করেন। তখন হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'হে বাদশাহ, আমরা ইতিপূর্বে মূর্খ ছিলাম, মূর্তিপূজক ছিলাম, মৃত প্রাণীর গোশত খেতাম, পাপাচার, চরিত্রহীনতা, আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের মধ্যে যারা সবল ছিল, তারা দুর্বলদের গ্রাস করত।

'এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালা একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরই বংশের। আমরা তার বংশধারা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, আভিজাত্য, চরিত্র সম্পর্কে ভালো করেই অবগত। তিনি আমাদেরকে দাওয়াত দেন যে, আল্লাহকে এক মানো। তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো।

তিনি আমাদেরকে হারাম কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রক্তপাত করা, মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে আমাদের বারণ করেছেন। আমরা যখন তার এই দাওয়াত শুনতে পেলাম, তার উপর ঈমান আনলাম। তার নির্দেশিত কথার উপর আমল করার কারণে আমাদের কওম আমাদের পিছু লেগে যায়।

আমাদের উপর পাহাড় পরিমাণ নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। আমরা নিরুপায় হয়ে এই আশা নিয়ে আপনার দেশে এসেছি যে, অন্তত এখানে আমাদের উপর জুলুম হবে না।'

নাজাশি তার বক্তব্য শুনে বললেন, 'তোমাদের নবীর আনীত কিছু বিষয় আমাকে শোনাও।'

তখন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুরা মারিয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। নাজাশি এবং দরবারে উপস্থিত পাদরিরা তেলাওয়াত শুনে এ পরিমাণ কাঁদেন যে, তাদের দাড়ি ভিজে যায়।

নাজাশি বলেন, 'এই কালাম এবং মুসা আলাইহিস সালামের আনীত কালাম একই জায়গা থেকে উৎসারিত।' এরপর তিনি কুরাইশ দূতদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমরা চলে যাও। তাদেরকে আমি কিছুতেই তোমাদের হাতে তুলে দেব না।'

নাজাশির উত্তর শুনে কুরাইশরা অনেক লজ্জিত হয়। পরদিন তারা নতুন অভিযোগ নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়। বলে, 'এরা ঈসা বিন মারিয়ামের ব্যাপারে অনেক বেয়াদবিমূলক কথা বলে। ঈসা আলাইহিস সালামকে একজন সাধারণ বান্দা হিসাবে মানে।'

কুরাইশ দূতরা মনে করেছিল নাজাশি যেহেতু খ্রিষ্টান, তাই এই অভিযোগ শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হবেন এবং মুসলমানদের হত্যার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু নাজাশি তদন্ত ছাড়া কোনো ফয়সালা দিতে নারাজি প্রকাশ করেন। মুসলমানদেরকে দ্বিতীয়বার দরবারে ডেকে পাঠান। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা হজরত ঈসা বিন মারিয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কী বলো?'

হজরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা তা-ই বলি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা বলেছেন। তিনি (ঈসা)

আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রুহের ধারক ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর এমন হুকুম, যা কুমারী মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে।'

নাজাশি এটা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের সম্পর্কে এর থেকে বেশি একটুও বলেননি।'

এভাবে কুরাইশ প্রতিনিধি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অপরদিকে মুহাজিররা হাবশায় নিরাপত্তার সঙ্গে দিনাতিপাত করতে থাকেন।[৩২৯]

নাজাশির সাহায্যের জন্য মুসলমানদের ভাবনা এবং প্রস্তুতি

কিছুদিন পর নাজাশির বিরুদ্ধে একজন দুশমন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাকে দমন করার জন্য নাজাশিকে নীলনদের পাড়ে যেতে হয়। সাহাবায়ে কেরাম তখন অনুভব করেন, এখনই কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়ার মোক্ষম সময়। তারা সিদ্ধান্ত নেন-সবার পক্ষ থেকে একজন গিয়ে নদীর তীরে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করবে।

হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সবচেয়ে কমবয়সি মুহাজির। তিনি এই কাজের জন্য নিজের নাম প্রস্তাব করেন। সম্মতি লাভের পর তিনি মশকে পানি ভরে তার উপর ভর করে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে পৌঁছে যান। ওদিকে সাহাবায়ে কেরাম নাজাশির বিজয়ের জন্য দোয়া করতে থাকেন। হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব দ্রুতই সংবাদ পাঠান যে, আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম এতে দারুণ খুশি হন।[৩৩০]

হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের সময়কাল

হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে জুবাইর ইবনুল আওয়াম,[৩৩১] আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ,[৩৩২] আবু সালামা, উম্মে সালামা,[৩৩৩]

---

[৩২৯] মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮ (সনদ হাসান), সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৩৪-৩৩৮

[৩৩০] মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮

[৩৩১] 'জুবাইর হাবশায় হিজরতে দু'বারই শরিক ছিলেন।' 'জুবাইর যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন তিনি মুনজির বিন মুহাম্মদের নিকট অবস্থান করেন।' [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/৭৫]

সাকরান বিন আমর, সাওদা[৩৩৪] বিনতে জামআ-সহ অনেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরতের পূর্বেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সম্ভবত হজরত জুবাইর রা. মক্কা থেকে মদিনা হিজরতকারী প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা ১২ নববি-বর্ষে মক্কা থেকে রওনা হন। এই কাফেলায় হজরত মুসআব বিন উমাইর, আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমও ছিলেন। কারণ, তিনি নবীজি সা এর হিজরতের পূর্বেই মদিনাতে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি শামেও আসা-যাওয়া করতেন। আর শাম থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ই মদিনার কোনো এলাকায় নবীজির সঙ্গে তার মোলাকাত হয়। [সহিহ বুখারি- ৩৯০৬-কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবী সা.]

[৩৩২] হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/৪০৯]
অন্যান্য সাহাবির সঙ্গে তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৩/৪১০] গাজওয়ায়ে বদরে তার অংশগ্রহণের ঘটনা অনেক মশহুর। [আলইসতিয়াব: ৪/১৭১০]
এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তিনি হাবশায় কিছুদিন থেকে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন।

[৩৩৩] উম্মে সালামা রা. নিজেই তার প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণনা করেন, 'আমরা নাজাশির কাছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করি, এরপর আমরা মক্কায় নবীজির নিকট ফিরে আসি।' [মুসনাদ আহমাদ- ২২৪৯৮]

[৩৩৪] সাউদা বিনতে জামআ রা. তার স্বামী সাকরান বিন আমরের সঙ্গে মদিনায় হিজরতের পূর্বে হাবশা থেকে মক্কা এসেছিলেন। মক্কাতেই স্বামীর ওফাত হয়। [আলইসতিয়াব: ২/৬৮৫, ৬৮৭] এরপর নবীজি সা ১০ নববি-বর্ষের রমজানে তাঁকে বিবাহ করেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

মুহাম্মদ বিন ইসহাক হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসা মুহাজিরদের সংখ্যা ৩৩জন উল্লেখ করে তাদের নামের তালিকা তুলে ধরেছেন। বাহ্যিকভাবে এই তালিকা দেখলে মনে হবে এটা প্রথম হাবশা হিজরতকারীদের থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের তালিকা। কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম মুহাজির ছিলেন সর্বোচ্চ ১৫ কি ১৬জন। তাই তালিকাটি ১ম ও ২য় হিজরতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের সামষ্টিক তালিকা। এই তালিকায় যারা কেবল প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হিজরতে শামিল ছিলেন, তাদের নামও ছিল। (কেউ কেউ মনে করেন, এই তালিকা কেবল উভয় হিজরতে শামিল লোকদের, আবার কেউ মনে করেন প্রথম হিজরতে শামিল ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারীদের নামের তালিকা; কিন্তু এটা ভুল ধারণা।) যেমন- হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ২য় হিজরতে শামিল ছিলেন, হজরত জুবাইর বিন আওয়াম, উম্মে সালামা, আবু সালামা ১ম-২য় উভয় হিজরতে শামিল ছিলেন। আয়েশা রা. এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নবীজির হিজরতের পূর্বেই হাবশার

অনেকেই মদিনায় হিজরতের পূর্বপর্যন্ত হাবশাতেই অবস্থান করেন। সেখানে একটি নিরাপদ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যখন পর্যাপ্ত তথ্য পান, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা মদিনায় চলে আসেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।[৩৩৫]

অনেকে আবার প্রায় দশ বছর সেখানে অবস্থান করেন। সেখানেই তাদের সন্তানরা লালিত-পালিত হচ্ছিল। তারা এক-দুজন করে মদিনায় আসতে থাকেন। যেমন: উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৬ হিজরিতে শুরাহবিল বিন হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মদিনায় চলে আসেন।[৩৩৬] সর্বশেষ

মুহাজিরদের এক বড় সংখ্যা তার মদিনা হিজরতের সংবাদ অবগত হওয়ার পর তারা সোজা হাবশা থেকে মদিনায় চলে যান।

رجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر إلى المدينة،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رِسْلِك

হাবশায় যারা হিজরত করেছিলেন, তাদের অনেকেই মদিনায় হিজরত করেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-ও মদিনায় হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা তাঁকে বললেন, অপেক্ষা করুন।' [সহিহ বুখারি-৩৯০৫]

৩৩৫ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ২ হিজরিতে গাজওয়ায়ে বদরের কিছুদিন পূর্বে মদিনায় পৌছেন। হাদিসের কিতাবগুলোতে এভাবে তার বর্ণনা এসেছে যে, 'তারপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তড়িঘড়ি মদিনায় পৌছলে গাজওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন।' [মুসনাদ আহমাদ- ৪৪০০, মাজমাউয যাওয়াইদ: ৯৮৪১]

আরেক রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হাবশা থেকে মদিনায় ঐসময় ফিরে আসেন, যখন নামাজে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তিনি নবীজিকে নামাজ পড়া অবস্থায় সালাম দিলে, উত্তর না পেয়ে পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন।' [সুনান নাসায়ি- ১২২১, আলবানি রহ. বলেছেন, হাসানুন সহিহ]

অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী কথা নিষিদ্ধ হওয়ার এই বিধান মদিনায় অবতীর্ণ হয়। কারণ, নামাজ ফরজ হয়েছে হাবশার দ্বিতীয় হিজরতের তিন চার বছর পরে মেরাজে। এরপর নামাজের বিধানের মধ্যে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে মদিনায় পূর্ণতা পায়।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হাবশায় দ্বিতীয়বারের হিজরত থেকে মদিনায় ফিরে আসেন (মক্কায় নয়)। তার ভাষায়: 'আমরা নবীজিকে হাবশার ভূমিতে আসার পূর্বে মক্কা থাকাকালে (নামাজে) সালাম দিতাম।' [মুসনাদ আহমাদ-৩৫৭৫]

৩৩৬ সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/২২০, ২২১

আবদুল্লাহ বিন জাফর তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস এবং অন্যান্য মুহাজিরকে নিয়ে খাইবারযুদ্ধ চলাকালে মদিনায় আগমন করেন।[৩৩৭]

হাবশায় হিজরতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

বাহ্যত হাবশায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে মুসলমানদের গমন যদিও বিদেশি শরণার্থীদের মতো মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ, ইসলাম তার শুরুর ধাপেই এশিয়া থেকে বের হয়ে আফ্রিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের নীরবতার কারণে তৎকালীন পৃথিবীর বড় পরাশক্তিগুলোরও তাদের এই স্থানপরিবর্তনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেক সাহাবি বছরের পর বছর আফ্রিকার এমন অশিক্ষিত, অনুন্নত দেশে পড়ে থাকেন। তারা এখানে পূর্ণ নীরবতার সঙ্গেই কাটান। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তারা হাবশায় ইসলামের প্রচারের জন্য আসেননি, বরং আশ্রয়ের জন্য এসেছেন। সম্ভবত এ কারণেই হাদিস ও সিরাতের ভাণ্ডারে এখানে দাওয়াত ও তাবলিগের কর্মতৎপরতার কোনো উল্লেখ নেই। হতে পারে তারা গোপনে গোপনে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কাজ করেছেন।

কিন্তু আফ্রিকা থেকে কোনো নওমুসলিম কাফেলা মক্কা-মদিনায় দেখা যায়নি। এর থেকে অনুমান করা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার আলোকে আরবের তৎকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রজ্ঞার দাবিও এটা ছিল যে, হাবশার মুহাজিরদের কোনো কর্মকাণ্ডের দ্বারা এই শান্তি-নিরাপত্তা হুমকির মুখে না ফেলা, স্থানীয় সরকার এবং পাদরিদের কোনো ভুল বোঝাবুঝি ও ক্রোধের শিকার না হওয়া। যথাসম্ভব সরকারের অফাদারি ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে জীবনযাপন করাই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত।

---

[৩৩৭] সহিহ বুখারি- ৪২৩০ (বাবু গাজওয়াতি খায়বার)

হাবশার মুহাজিরদের এমন নিরাপদ ও শৃঙ্খলিত জীবনপদ্ধতিরও প্রভাব ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা নিশ্চিত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কারণ, পরবর্তীতে হাবশার শাসক ইসলামের শিক্ষা, মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও কর্মতৎপরতা এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জিন্দেগির প্রতিচ্ছবি দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন।

প্রথম যুগে আফ্রিকাতে যদিও এশিয়ার মতো ইসলামের তেমন বিস্তার ঘটেনি; তবে হজরত উসমান, জাফর বিন আবু তালেব, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, রুকাইয়া, উম্মে সালামা, উম্মে হাবিবা প্রমুখ সাহাবির মতো ঈমানদার ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য ছিল। যার ফলে এই অঞ্চলটি পৃথিবীর মানচিত্রে ইসলামের অনেক বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়। আজও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। এজন্যই পশ্চিমারা আফ্রিকাকে 'মুসলিম মহাদেশ' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

হাবশা হিজরতের শিক্ষা

হাবশা হিজরতের উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা যখন পৃথিবীর কোথাও নিরীহ ও নির্যাতিত হবে এবং ইসলামের দুশমনদের দ্বারা অবরুদ্ধ হবে, তখন তাদেরকেও এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেওয়া আবশ্যক, যেন তারা নিজেদের জীবন-যোগ্যতা বাঁচিয়ে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ফলপ্রসূ কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত হতে পারে।

এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মুসলমানরা যদি কোনো অমুসলিম দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা, ন্যায়-ইনসাফের ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারে, তা হলে সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা থেকে বেঁচে থাকবে, যা অযথা মানুষের মধ্যে ক্ষোভ এবং ভুল বোঝাবুঝির উদ্রেগ করবে। ব্যক্তিগত সমস্যা, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে পরিপূর্ণ সতর্কতা, প্রজ্ঞা এবং চিন্তাফিকিরের সঙ্গে দাওয়াতি কার্যক্রমে ধীরস্থিরতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। আর অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা জরুরি।

সামাজিক বয়কট

(মহররম, অষ্টম নববিবর্ষ)

হাবশায় মুসলমানদের একটি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করা এবং হজরত হামজা ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতো সাহসী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ করাতে কুরাইশ যদিও তাৎক্ষণিক বিচলিত হয়ে যায়; কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মধ্যে পূর্বের প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। তারা ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে তাদের হীন উদ্দেশ্য সফল করতে চায়।

আবু তালেব যখন কুরাইশের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হন, তখন তৎক্ষণাৎ বনু হাশিমকে একত্রিত করে তাদেরকে নির্দেশনা দেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন অনতিবিলম্বে কোনো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয় এবং কেউ যেন তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

কুরাইশদের এই আশঙ্কা ছিল যে, তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হবে বনু হাশিম। ফলে তারা বনু হাশিমের সাথে সামাজিক এবং পারিবারিক সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষা-দায়িত্ব পরিত্যাগ করার জন্য বনু হাশিমকে তারা বাধ্য করে। তারা সকলে মিলে একটি চুক্তিপত্র লেখে, যার সারকথা ছিল 'বনু হাশিমের সঙ্গে বিবাহ এবং যেকোনো ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাদের সাথে লেনদেন করা যাবে না।'

চুক্তিনামার দৃঢ়তার জন্য কাবা শরিফে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।[৩৩৮] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল তখন ৪৮ বছর।

---

[৩৩৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২০৭-২১৬, ২৩৬-২৩৯
মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং ওয়াকিদির বর্ণনা অনুযায়ী এটি মহররম ৭ম নববি-বর্ষের ঘটনা। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২০৯]

শা'বে আবু তালেবে সীমাহীন কষ্ট-দুর্দশা

বৃদ্ধ আবু তালেব হাশিম পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার ঐসব পাহাড়ি ঘাঁটিতে অবস্থান করা শুরু করেন, যেগুলো তাদের বংশীয় সম্পত্তি ছিল। তাকে 'শে'বে বনু হাশিম' বলা হয়।[৩৩৯] অবরুদ্ধ লোকদের মধ্যে নারী এবং নিষ্পাপ শিশুরাও ছিল। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা ঈমানি স্পৃহায় আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা বংশীয় সম্মান-গৌরবের খাতিরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিল। কেবল আবু লাহাব তাদের সঙ্গ দেয়নি; বরং ইসলামের প্রতি তার বৈরিতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়ে বনু হাশিমের সাথে রয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী খাদিজা এবং সন্তানদের নিয়ে ঘাঁটিতে বসবাস শুরু করেন। চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দেহরক্ষী ছিলেন।[৩৪০] হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেখানে ছিলেন। আর সেই ঘাঁটিতেই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।[৩৪১]

বনু হাশিম পানাহারের যাবতীয় সামগ্রী সাথে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহে সব ফুরিয়ে যায়। অভাব-অনটন শুরু হয়ে যায়। নিষ্পাপ শিশুদের ক্ষুধাজনিত চিৎকারের আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যেত। কুরাইশের এই সামাজিক বয়কট এতই কঠোর ছিল যে, বনু হাশিমকে মক্কার হাট-বাজারে যাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেয়।

বাইরে থেকে কোনো সওদাগর যদি পণ্য নিয়ে আসতে চাইত, তাদের সব পণ্য কুরাইশরা ক্রয় করে গুদামজাত করত; উদ্দেশ্য ছিল বনু হাশিম যেন কিছুই না পায়। কোনো মুসলমান যদি বনু হাশিমকে কোনো ধরনের সহায়তা ও সহমর্মিতা দেখাতে গিয়ে তরি-তরকারি নিয়ে আসত, কুরাইশ তার থেকেও সবকিছু ছিনিয়ে নিত।

অন্যদিকে আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. এটাকে ৮ম নববি-বর্ষের ঘটনার অধীনে উল্লেখ করেছেন। [আলমুনতাযাম- ২/৩৮৮]

[৩৩৯] এ স্থানের প্রাচীন নাম এটি। পরবর্তীতে 'শেবে আবি তালেব' হিসেবে পরিচিত পায়। [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ২/৩৮২]

[৩৪০] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৫১-৩৫৪

[৩৪১] হাকিম নিশাপুরি রহ. বলেন, তিনি 'শেবে আবু তালেবের মধ্যে হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।' [মুসতাদরাক হাকিম- ৬২৭৭]

কখনো কখনো এমন হতো যে, একজন গোপনে কিছু খাদ্য পৌঁছে দিতে সক্ষম হতো। যার ফলে অবরুদ্ধ লোকদের কোনোরকম জীবনধারণ করা সহজ হতো। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে গাছের পাতা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। শরীরের চামড়াও শুকিয়ে আসছিল।[৩৪২]

অভাবের একটি চিত্র

বনু হাশিম ছাড়াও অনেক মুসলমান এই বন্দিখানায় আটকা পড়েছিল। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাশিমি বংশোদ্ভূত বনু জুহরার লোক ছিলেন (অর্থাৎ আবদে মানাফের বংশধর)। তিনিও সেই ঘাঁটিতে বন্দি ছিলেন। অন্যদের সঙ্গে তিনিও এই ভয়াবহ সংকটে পতিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'একদিন পেশাব করতে বসলে মাটিতে বাতাসের কারণে পাশেই কিছু নড়ার শব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি উটের চামড়ার শুকনো টুকরো। আমি সেটা নিয়ে ধুলাম, ঘষলাম, পানিতে ভিজিয়ে পান করলাম। এভাবে তিনদিন কেটে গেল।'[৩৪৩]

ব্যস, এই একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় এই ঘাঁটিতে তখন অভাব-অনটনের কী শোচনীয় অবস্থা ছিল!

কাফেররা কেবল হজের মৌসুমে লড়াই করাকে হারাম মনে করত। আর তখনই অবরুদ্ধ মানুষগুলোর কিছুটা স্বাধীনতা মিলত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময়টাকে কাজে লাগান। হাজিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি বের হতেন। কিন্তু আবু লাহাব তার পিছু ছাড়ত না। তার কথার মধ্যে হইচই করত। এই সময়ে বনু হাশিম ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম পরিবারও তাদের ঘরে একরকম অবরুদ্ধ ছিল।[৩৪৪]

রোম-পারস্যের লড়াই এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

সময়টা তখন অষ্টম নববিবর্ষ। এ বছরই রোম-পারস্যের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। একে রোমান এবং পারস্যের মাঝে চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুশরিকরা তো শুরু থেকেই মুসলমানদের

---

[৩৪২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২০৭-২১৬

[৩৪৩] সিরাতে ইবনে ইসহাক- ১/১৯৪, আররাউযুল উনুফ- ৩/২১৬-২১৭

[৩৪৪] রাহমাতুললিল আলামিন- ১/৯১

নির্যাতন করে দাম্ভিকতায় ভুগছিল। তাদের এই অহংকার এখন আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, তারা বিশ্বাসগতভাবে নিজেদেরকে পারসিকদের সঙ্গে এবং মুসলমানদেরকে রোমানদের অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মনে করত। ওরা অহংকারবশত বলতে থাকে যে, যেমনিভাবে আমাদের পারসিক ভাইয়েরা রোমান আহলে কিতাবদের পরাজিত করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তেমনি আমরাও তোমাদের খতম করে দেব।

মুশরিকদের এই আত্মম্ভরিতার জবাবে কুরআন শরিফে সুরা রুমের প্রথম আয়াতগুলো নাজিল হয়। আয়াতে বলা হয়, রোমকরা পরাজিত হওয়ার পরেও কয়েক বছরের মধ্যে তারা পুনরায় বিজয় লাভ করবে।'[৩৪৫]

মুশরিকরা ঠাট্টা করতে থাকে, রোমকদের এমন শোচনীয় পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয়ী হওয়া কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, যদি পাঁচ বছরের ভিতর রোমকরা বিজয়ী না হয়, তা হলে তোমরা জিতে গেলে, অন্যথায় নয়। পরাজিতরা বিজয়ীদের কী প্রদান করবে, তাও নির্ধারিত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্তারোপের সংবাদ পৌঁছলে, তিনি কুরআনের بِضْعِ سِنِينَ শব্দের আলোকে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঁচ বছরের জায়গায় নয় বছর করার পরামর্শ দেন। তখন তিনি তার শর্তের সংশোধনী আনেন। সাত বছর পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। রোমানরা পারসিকদের অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।[৩৪৬]

---

[৩৪৫] তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা রুম, আয়াত ১-৪

[৩৪৬] সুনান তিরমিজি: ৩১৯৩ (আবওয়াবুত তাফসির), দালাইলুন নুবুওয়াহ- ২/৩৩২, ৩৩৩

ফায়েদা : এই ধরনের শর্তারোপ করা জুয়া। কিন্তু জুয়া হারামের বিধান তখনও নাজিল হয়নি। সাত বছর পর গাজওয়ায়ে বদরের পর (২ হিজরিতে) রোমকরা পারস্যকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ফলে কুরআনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণতা পায়। [শারহু মুশকিলিল আছার, তাহাবি, ২৯৮৭, ২৯৮৯]

ফায়েদা : নবীজি সা যখন শেবে আবু তালেবে অবরুদ্ধ তখনই আবু বকর রা. হাবশা হিজরতের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেসময়ই তিনি কাফেরদের সঙ্গে শর্তারোপ করেন ও নবীজির পরামর্শে শর্তের মধ্যে

হাবশার পথে হজরত আবু বকরের রওনা এবং মাঝপথ থেকেই ফেরত আসা

(নববি ৯ বর্ষ)

বনু হাশিম অবরুদ্ধ হবার পর পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল দুনিয়াতে মুসলমানদের আশ্রয়ের কোনো ঠিকানা নেই। এই অবস্থায় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এমন পর্বতসম অবিচল মানুষও হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হন।[৩৪৭]

এই ঘটনাটি সহিহ বুখারিতে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'যেদিন আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে সেদিন হতেই আমি আমার আব্বা-আম্মাকে দীনের অনুসারী হিসেবেই পেয়েছি। আমাদের এমন কোনো দিন যায়নি, যে দিন—সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে আসেননি।'

মুসলমানরা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন। এ সময় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাবশা-অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন তিনি 'বিরকুল গিমাদ'[৩৪৮] নামক (মক্কা থেকে পাঁচ মঞ্জিল দূরবর্তী সমুদ্র অভিমুখী) স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে 'কারা' গোত্রের সরদার ইবনে দাগিনা তার সাথে সাক্ষাৎ করে।

সংশোধনী আনেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি বয়কটের আওতার বাইরে ছিলেন এবং নবীজির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সাক্ষাত করতেন।

৩৪৭ সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৭২

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ضاقت عليه مكة وأصابه الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأذن له. فخرج أبوبكر رضي الله عنه مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة

৩৪৮ বারকুল গিমাদ : লোহিতসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর নগরী। মক্কা থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্দর। বর্তমানে বিরক নামে প্রসিদ্ধ। মুজামুল মাআজিমিল জুগরাফিয়া ফিস সিরাত্তিন নাবিবিয়্যা, পৃষ্ঠা ৪২ (অনুবাদক)

সে বলল, আবু বকর, আপনি কোথায় যাওয়ার এরাদা করেছেন?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি ইচ্ছা করেছি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব।

ইবনে দাগিনা বলল, আপনার মতো লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মতো লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অক্ষমের বোঝা বহন করেন। মেহমানদারি করেন এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং শহরে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন।

তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এল। কাফের কুরাইশদের নেতারা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তাদেরকে বলল, আবু বকর-এর মতো লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার মতো লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। আপনারা এমন একজন লোককে বহিষ্কার করতে চান, যে নিঃস্বকে সাহায্য করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, অক্ষমের বোঝা বহন করে, মেমহমানকে আপ্যায়ন করে এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করে।'[৩৪৯]

কুরাইশ ইবনে দাগিনার আশ্রয় প্রদান মেনে নিল এবং তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিরাপত্তা দিয়ে আশ্রয়দাতাকে বলল, আপনি তাকে বলে দিন যেন তিনি নিজ বাড়িতে তার প্রতিপালকের ইবাদত করেন। সেখানেই যেন নামাজ আদায় করেন এবং তার যা ইচ্ছা তা যেন পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরকে কোনো কষ্ট না দেন এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে নামাজ ও তেলাওয়াত না করেন। কেননা, আমরা আশঙ্কা

---

[৩৪৯] লক্ষ করে দেখুন, হুবহু এই শব্দগুলোর মাধ্যমেই হজরত খাদিজা রা. প্রথম ওহি নাজিলের পর নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেটা তো সনদসহ রেওয়ায়েত বর্ণনার যুগ ছিল না যে, যার বদৌলতে ইবনে দাগিনার কাছে হজরত খাদিজা রা. এর শব্দগুলো পৌঁছাতে পারবে। তাই এটি নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, হজরত আবু বকর রা. এর মধ্যে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চারিত্রিক সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখতে পেয়েই ইবনে দাগিনা কথাগুলো বলেছিল।

করছি, তিনি (প্রকাশ্যে এসব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফেতনায় ফেলে দেবেন।

ইবনে দাগিনা এসব কথা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল। ফলে তিনি শর্তানুযায়ী নিজ বাড়িতেই ইবাদত করতে থাকেন। নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে নামাজ আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন না।

কিছুদিন পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য এক খেয়াল উদয় হলো। তিনি নিজ ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ বানালেন[৩৫০] এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সেই মসজিদে নামাজ আদায় এবং তেলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তার কাছে ভিড় জমাতে থাকল। তাদের কাছে তা ভালো লাগত এবং তার প্রতি তারা তাকিয়ে থাকত।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ভয়ে অনেক কাঁদতেন। যখন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এসব কারণে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ঘাবড়ে গেল। তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে তাদের কাছে আসার পর তারা তাকে বলল, আমরা তো আবু বকরকে এই শর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে তার প্রতিপালকের ইবাদত করবেন।

কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ গৃহের আঙিনায় মসজিদ বানিয়ে নিয়েছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যে নামাজ আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াত করছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফেতনায় লিপ্ত করবেন। কাজেই আপনি তাকে বলুন, তিনি যদি নিজ গৃহে তার প্রতিপালকের ইবাদত সীমাবদ্ধ রাখতে চান, তবে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এসব করতে চান তবে আপনি তাকে বলুন, তিনি যেন আপনার জিম্মাদারি ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা যেমন তার সাথে আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পছন্দ করি না, তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যে ইবাদত করাটাও মেনে নিতে পারি না।

---

৩৫০ এটিই ছিল উম্মতে মুহাম্মদির নির্মিত প্রথম মসজিদ। মসজিদে কুবা, মসজিদে নববি থেকেও পাঁচ বছর পূর্বে তা নির্মিত হয়।

ইবনে দাগিনা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'যে শর্তে আমি আপনার জিম্মাদারি নিয়েছিলাম, তা আপনার জানা আছে। হয়তো আপনি সে শর্তের উপর সীমাবদ্ধ থাকবেন, নয়তো আমার জিম্মাদারি আমাকে ফেরত দেবেন। কেননা, কারো সাথে আমার নিরাপত্তার চুক্তি হওয়ার পর আমার পক্ষ হতে তা ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন একটা কথা আরবজাতি শুনতে পাক, তা আমি একদম পছন্দ করি না।'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি আপনার জিম্মাদারি ফেরত দিচ্ছি এবং আল্লাহর আশ্রয়েই আমি সন্তুষ্ট।'[৩৫১]

শে'বে আবু তালেবের বয়কট থেকে মুক্তি

শে'বে আবু তালেবের এই বয়কট প্রায় আড়াই বছর অব্যাহত ছিল। এরপর আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ সরদারদের দিল নরম করে দেন। তাদের মধ্যে হিশাম বিন আমর, যুহাইর বিন আবু উমাইয়া এবং মুতইম বিন আদি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কুরাইশ সরদারদের লজ্জা দিয়ে ঐ চুক্তিনামা বর্জন করেন। এভাবেই ঐ নিষ্ঠুর বয়কটের সমাপ্তি হয়। বনু হাশিম এমন নির্মম ঘাঁটি থেকে মুক্তি পায়।[৩৫২]

---

[৩৫১] সহিহ বুখারি (কিতাবুল হাওয়ালাত, বাবু জিওয়ারি আবি বাকরিন ফি আহদিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আকদিহি)

[৩৫২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২৩৬-২৩৯

ফায়দা : ১। ওয়াকিদি, ইবনে ইসহাকের মত অনুযায়ী এই বয়কট ৭ নববি-বর্ষের মহররমে শুরু হয়ে তিন বছর (তথা ১০ম বর্ষের মহররম) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে উবাইদুল্লাহ বিন মুসার মত অনুযায়ী দু'বছর পর্যন্ত চলে। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২০৯, ২১০]

ইবনুল জাওযি রা. আলমুনতাযাম গ্রন্থে ঐ বয়কটের সূচনা ৮ম নববি-বর্ষের ঘটনাতে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযির মতই অগ্রগণ্য বলে মনে হয়। কারণ, তার মত অনুযায়ী অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ এভাবে বলা যাবে যে, ৮ম নববি-বর্ষের মহররমে আরম্ভ হয়ে ১০ম বর্ষের মহররমের মাঝেই তা অব্যাহত থাকে। তাবাকাতে ইবনে সাদের ইবারত [১/২১০]- "وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة"-এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, দশম বছরের কোনো এক মাসে তা হয়। তবে সেই মাসটি নির্দিষ্টীকরণ এভাবে হতে পারে যে, ঘাঁটি থেকে বের হওয়ার ছ'মাস পর আবু তালেবের মৃত্যু হয়। [আলমুহাব্বার- পৃষ্ঠা ১১]

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত হলো, তার ওফাত ১৫ শাওয়াল হয়েছে। যদি ছ'মাস দ্বারা পূর্ণ ছ'মাস উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বয়কট ১৫ রবিউল আখির মাসে

হজরত খাদিজার ইনতেকাল

শা'বে আবু তালেবের কষ্ট ও নির্দয়তা ৮৫ বছর বয়সি আবু তালেবের স্বাস্থ্যের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। এর ফলে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অনুরূপ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী হজরত খাদিজার বয়সও পয়ষট্টি হয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ কষ্ট-যাতনা তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। বয়কট থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। সময়টা ছিল তখন ১০ রমজান নববি ১০ম বর্ষ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'হাজুন' কবরস্থানে দাফন করেন। তিনি নিজে কবরে নামেন। তখনও জানাজা নামাজের বিধান নাজিল হয়নি।[৩৫৩]

হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নবীজির প্রতি কদমের, প্রতি মুহূর্তের সহমর্মী হতেন এবং প্রশান্তির পরশ ছড়িয়ে দিতেন।

সমাপ্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। এতে করে বয়কটের সময়কাল দু'বছর তিন মাস হয়। এটাকেই কিছু ঐতিহাসিক তিন বছর এবং কিছু ঐতিহাসিক তিন বছর পূর্ণ না হওয়ায় দু'বছর বলেছেন (আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবগত)।

ফায়দা : ২। মক্কি-মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ম নববি-বর্ষ এবং ৮ম নববি-বর্ষ একই থাকবে। উভয় ক্যালেন্ডারে বয়কট শুরু-সমাপ্তির বছর এক। [তাকউয়িমে আহদে নববি, আলি মুহাম্মদ খান]

ফায়দা : ৩। কিছু কিছু বর্ণনায় চুক্তিনামা সমাপ্ত হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয় যে, চুক্তিপত্রে উইপোকা ধরে এবং আল্লাহর নাম ছাড়া তার সবকিছু মুছে যায়।' [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৩৭৭] এই যয়িফ রেওয়ায়েতগুলো বাদ দিলেও, বংশীয় রীতিনীতি এবং চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আরবদের মধ্যে যদি চুক্তিনামা নষ্ট হয়ে যেত, তখন চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হতো।

উপরন্তু এটুকু তো বলা যায় যে, চুক্তিপত্রে উইপোকা পড়ে যাওয়া বয়কট সমাপ্তিকে আরো জোরালো করে। তবে মূল কারণ তো ছিল চুক্তিসম্পন্নকারী লোকেরা নিজেরাই লজ্জিত হয় এবং কিছু বুদ্ধিমান লোকের অভিশাপ ও তিরস্কারের কারণে তাদের বোধোদয় হয়েছিল যে, তারা একটি অমানবিক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। এতে করে সমগ্র আরবজাতির কাছে তারা ছোট হয়ে যাচ্ছে।

[৩৫৩] দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৩৫৩, তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/১৮

এমন একজন অদ্বিতীয় জীবনসঙ্গিনীর অন্তর্ধান ও বিয়োগব্যথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক বড় ধাক্কা দেয়। তার জীবন প্রায় অসহনীয় করে তোলে।[৩৫৪]

৩৫৪

"لما توفيت خديجة اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خُشي عليه حتى تزوج عائشة"

হজরত খাদিজা রা. যখন ইনতেকাল করেন, নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে যায়। এরপর তার হজরত আয়েশার সঙ্গে বিয়ে হয়। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১৫২৮৮, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সহিহ বুখারির রাবি]

হজরত খাদিজার ওফাতের সময় নিয়ে পর্যালোচনা

এটা সর্বজনসিদ্ধ যে, হজরত খাদিজার ইনতেকাল হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়েছে। [সহিহ বুখারি- ৩৮৯৬, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

তবে কোন্ মাসে ওফাত হয়েছে, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আবু তালেবের ওফাত ১ম নববি-বর্ষের ১৫ শাওয়ালে হয়েছে। [আলমুনতাযাম- ৩/৭] আর হজরত খাদিজার ওফাত তার ৩৫দিন পূর্বে হয়েছে। [দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৩৫৩] এ হিসাবমতে খাদিজার ইনতেকাল হয়েছে ১০ রমজানে।

দ্রষ্টব্য : সিরাত-লেখকরা যখন অমুক বছর কিংবা অমুক নববি বছর বলেন, তখন সর্বদা তাদের সবার একই উদ্দেশ্য হয় না। কারণ, একশ্রেণির নিকট নবুওয়াতের সূচনা রবিউল আওয়ালে হয়েছে। তারা এই মাস থেকেই ১ম নববি-বর্ষ, দ্বিতীয় নববি-বর্ষ; এভাবে গণনা করেন। আর যারা রমজান মাসকে নবুওয়াতের সূচনার মাস গণ্য করে থাকেন, তারা এ মাস থেকেই বছর গণনা করেন।

তৃতীয় আরেকটি শ্রেণি রবিউল আওয়াল কিংবা রমজান মাসের মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মহররম মাস থেকে বছর গণনা করে থাকেন এবং সহজ ও সুবিধার জন্য অধিকাংশ লেখকের রীতি এটিই চলে আসছে। তবে সম্ভবত এর কারণ এটিও হতে পারে যে, হিজরত মক্কি ক্যালেন্ডার মোতাবেক মহররম মাসে হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই হিজরতপূর্ব পূর্ণ তেরো বছর নববি-বর্ষ হিসেবে গণনা করা হয়।

তবে এই পদ্ধতির একটি সমস্যা রয়েছে, এর মাধ্যমে নববি-বর্ষের বাস্তবতা বাকি থাকে না। কারণ, কারো নিকটই মহররম মাসে নবুওয়াতের সূচনা হয়নি। তা ছাড়া মহররম থেকে নবুওয়াতের বছর গণনা করার দ্বারা কিছু মাসেও কমবেশি হয়। যেমন- প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আবু তালেবের ওফাত এবং নবীজির তায়েফ সফর নববি ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে বলা হয়ে থাকে। ফলে যাদের নিকট

আবু তালেবের অফাত

হজরত খাদিজার ইনতেকালের পঁয়ত্রিশ দিন পর আবু তালেবও আখেরাতের যাত্রী হন। এটা ছিল নবুওয়াতের এগারোতম বছরের ঘটনা।[৩৫৫]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এ দিনটি ছিল সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির। তাই পুরো বছরকে 'আমুল হুজ্ন' তথা দুশ্চিন্তার বছর বলা হয়ে থাকে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঁয়তাল্লিশটি বছর আবু তালেবের স্নেহছায়ায় কেটেছে। প্রতিটি কদমে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। স্ত্রী ও চাচার মৃত্যুর পর নিজেকে খুব একা অনুভব করতে থাকেন।[৩৫৬]

হজরত সাওদা ও হজরত আয়েশার সাথে বিবাহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাকিত্ব জীবনের অবসান ঘটে, যখন সাহাবি সাকরান বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিধবা স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এটি ১১তম নববিবর্ষের রমজান মাসের ঘটনা।[৩৫৭]

পরবর্তী বছর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আপন

রমজানে নবুওয়াতের সূচনা হয়েছে, তাদের হিসাবমতে দশম বছর শেষ হয়ে ১১তম আরম্ভ হয়ে গেছে।

আর যদি রবিউল আওয়াল মাসে নবুওয়াতের সূচনা ধরা হয়, তা হলে শাওয়াল মাসে দশম বর্ষ তখন পর্যন্ত পূর্ণ হয় না, বরং নবম বর্ষ হয়। বছর গণনার ভুল থেকে বাঁচার জন্য কর্তব্য হলো নবুওয়াতের সূচনা প্রকৃত মাস থেকে বছর শুরু ও সমাপ্তিকে সামনে রাখা।

[৩৫৫] আলমুনতাযাম- ৩/৭, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি- ২/৩৫৩

[৩৫৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩০৪-৩১৬

[৩৫৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/৫৩ (সাওদা রা. জীবনী দ্রষ্টব্য) এ থেকে বুঝা যায় যে, হজরত সাওদার রা. এর বিবাহ রমজানের শেষদিকে হয়েছে। কারণ, ১০ রমজানে খাদিজার ইনতেকাল হয়। এরপর কিছুদিন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় অতিক্রান্ত হয়। ফলে কিছু সময়ের ব্যবধান অবশ্যই ছিল।

কন্যা হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে দেন। এই সময় শুধু বিয়ের আকদ হয়। উঠিয়ে নেওয়া হয় তার তিন বছর পর।[৩৫৮]

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার অলৌকিক ঘটনা

এই সময়েই মুশরিকরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেকায়দায় ফেলার জন্য দাবি করে যে, তুমি যদি সত্য নবীই হয়ে থাক, তা হলে এই চাঁদকে কিছু করে দেখাও। আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মুজিজা প্রকাশ করলেন। তার আঙুলের ইশারায় চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর টুকরো-হওয়া-চাঁদ পুনরায় জোড়া লেগে যায়। কিন্তু মুশরিকরা তারপরও ফিরে আসেনি। তারা তাকে জাদুকর বলতে থাকে।[৩৫৯]

---

[৩৫৮] এর উপর সবার ঐকমত্য যে, হজরত আয়েশাকে বিয়ের তিন বছর পর শাওয়াল মাসে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কোন্ মাসে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে মতানৈক্য। কারো মতে ২রা হিজরির শাওয়াল মাসে। [সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/১৩৫]

ইবনে সাদের রেওয়ায়েত মতে হিজরতের আট মাস পর শাওয়াল মাসে হয়েছে। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ৮/৫৮ আয়েশা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য] এই হিসেবে আকদে নিকাহের প্রকৃত তারিখ অনুযায়ী তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ১২ নববি-বর্ষের শাওয়াল মাসে। (যেমন মহররম থেকে মহররম পর্যন্ত বছর গণনার ক্ষেত্রে শাওয়াল হয় ১১তম নববি-বর্ষ।) আর এটিই অগ্রগণ্য মত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-ও এটি গ্রহণ করেছেন। [আলইসাবাহ- ৮/৩৩২]

[৩৫৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২৯৩-৩০৩, তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা কামার, আয়াত ১, ২

দ্রষ্টব্য : ১। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনার বিষয়ে শুরুর দিকের সিরাতগ্রন্থগুলো থেকে বুঝা যায়, এই ঘটনা শেবে আবু তালেবের বয়কট থেকে মুক্তির পরে হয়েছে। তবে মুক্তির পরপরই তা ঘটে গেছে, এমন উদ্দেশ্য নেওয়া মনে হয় ঠিক হবে না। কারণ, পূর্বের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা দেখলে একটি পর্যায়ক্রমিক কাল ক্ষেপণ বুঝা যায়। প্রথমে হজরত খাদিজার ইনতেকাল, এরপর আবু তালেবের মৃত্যু হয়। তারপরই নবীজির উপর কাফেরদের বাধা-বিপত্তি এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ এই পরিমাণ বেড়ে যায় যে, তারা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মতো দাবি উত্থাপন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঐ ঘটনা নববি দশম বছরের শেষে যিলকদ কিংবা যিলহজ মাসের। (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন)

দ্রষ্টব্য : ২। প্রসিদ্ধি আছে যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক ঘটনাটি হিন্দুস্থানেও দেখা গিয়েছিল। মালাবারের রাজা নিজ দেশে এই দৃশ্য দেখে কিছু লোককে আরবদেশে পাঠায়। অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার পর তিনি মুসলমান হয়ে যান। [তাফসিরে উসমানি, সুরা কামার]

তায়েফ সফরের মর্মান্তিক ঘটনা

আবু তালেবের ইনতেকালের পর মুশরিকরা সর্বদিক থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তাকে কষ্ট ও নির্যাতনের মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু তাদের বিরোধিতা, শত্রুতা, গোঁয়ার্তুমি দিনদিন কেবল বাড়তেই থাকে। চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার মতো অলৌকিক ঘটনাকেও তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। কুরাইশদের এলাকায় ইসলামপ্রসারের তেমন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের হেফাজত এবং প্রচার-প্রসারকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করার মতো একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে বাধ্য হন, যেখানকার লোকেরা আল্লাহর নাম নেবে, তারই ইবাদত করবে।

মক্কা থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত (১২০ কিলোমিটার) তায়েফে বসবাসকারী সাকিফ গোত্র জনসংখ্যার আধিক্যের দিক থেকে খুব শক্তিশালী ছিল। এখানকার লোকেরা সুখ-শান্তিতে জীবনযাপন করত। কুরাইশের বিত্তবানরা পর্যন্ত এখানে জমি খরিদ করে রেখেছিল। তায়েফের বাইরে তাদের বাগ-বাগিচা ছিল। গ্রীষ্মকালে লোকেরা ওখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য অবস্থান করত।

তায়েফের অনতিদূরেই অবস্থিত বনু সা'দের বসতি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশবকাল এখানেই অতিবাহিত হয়। এবং দুধমাতা হজরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িও এখানে। এজন্য তার আশা ছিল সেখানকার লোকেরা তাকে দুধভাইয়ের সম্পর্কের খাতিরে সাদরে বরণ করে নেবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

কিন্তু এই কথা প্রামাণিক পর্যায়ে পৌঁছে না। তবে এই রাজার ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা তাবেয়িদের যুগে হয়েছে। তিনি তাবেয়িদের থেকে এই অলৌকিক ঘটনা শুনে অনেক বিস্মিত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। [আযওয়া আলাল হিন্দ, আবদুল মুনঈম আননামির, পৃষ্ঠা ৬২-৬৪]

ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তারা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে মুসলমানদের উপর থেকে বড় মুসিবত কেটে যাবে এবং দীনের প্রচার-প্রসারের একটি কেন্দ্রের বন্দোবস্ত হবে।

দশম নববিবর্ষের শাওয়াল মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় আশা নিয়ে তায়েফের উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন তার আজাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু।[৩৬০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে দশদিন লোকজনকে গোপনে-প্রকাশ্যে, একাকী, সামগ্রিকভাবে দাওয়াত দেন। তিনি বাজারে দাঁড়িয়ে কুরআনে কারিমের আয়াত শোনাতেন এবং লোকদেরকে তার সাহায্য-সহযোগিতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

আবদুর রহমান বিন খালিদ উদওয়ানি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তায়েফের একটি নগরী) বনু সাকিফের পূর্বদিকের একটি এলাকায় তার লাঠি কিংবা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তিনি তাদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এসেছিলেন। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুরা তারিক তেলাওয়াত করতে শুনেছি। সে সময় আমি মুশরিক ছিলাম। কিন্তু শুনে শুনেই সেই সুরাটি মুখস্থ করে ফেলি।

বনু সাকিফের (সরদাররা) আমার কাছে এসে বলে, তুমি এই ব্যক্তির মুখে কী শুনেছো? আমি তাদেরকে সুরা তারিক শুনিয়ে দিই। বনু সাকিফের সরদারদের কাছে কুরাইশ গোত্রের লোকও ছিল। তারা বলে, আমরা এই লোককে ভালো করেই চিনি। আমরা যদি তাকে সত্য মনে করতাম, তা হলে আমরাই সর্বপ্রথম তাকে গ্রহণ করে নিতাম।'[৩৬১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক দাওয়াতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমেও দাওয়াত দিতেন। তায়েফের বনু সাকিফ

---

[৩৬০] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২১১

[৩৬১] মুসনাদ আহমাদ- ৩১/২৮৯, আলআহাদ ওয়াল মাছানি: ১২৭৪, আততারিখুল কাবির, বুখারি- ৩/১৩৮

গোত্রের তিন ভাই—আবদে ইয়ালিল, মাসউদ এবং হাবিবকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাকে নুসরত ও সহায়তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারা তো দীন কবুল করেইনি; এমনকি আরবের আতিথেয়তার রেওয়াজটুকু পর্যন্ত রক্ষা করেনি। উপরন্তু তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠোরভাবে জবাব দেয়।

তাদের একজন বলে, 'তুমি তো এমন বিধর্মী, যে কাবার গিলাফকে অসম্মান করেছে।'

আরেকজন বলে, 'আল্লাহ কি রাসুল হিসেবে প্রেরণ করার মতো তোমাকে ছাড়া কাউকে পাননি?'

তৃতীয়জন বলে, 'আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ। কারণ, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তা হলে তো অস্বীকার করলে বিপদ আছে; আর যদি মিথ্যা নবী হয়ে থাক, তা হলে আমি এমন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

বনু সাকিফের সরদাররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওখানে অবস্থান করার অনুমতি পর্যন্ত নাকচ করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাহত হয়ে তখন অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেউই তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না। বরং বেয়াদবি করে বলে যে, আমাদের শহর থেকে এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও এবং যেখানে মন চায়, সেখানে যাও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ বদমাশরা শহরের দুষ্ট ছেলেদেরকে উপহাস করতে উসকানি দেয়। তারা তাকে পাথর মারার জন্য পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে। পাথরের বর্ষণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ আহত হলেন। কষ্টের আতিশয্যে তিনি মাঝেমধ্যেই বসে পড়তেন। তখন লোকেরা তার হাত ধরে উঠিয়ে দিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরপূর্বক চলার চেষ্টা করতেন। আর তখনই ওরা আবার পাথর-বর্ষণ শুরু করত।

তায়েফের ভূমিতে সৃষ্টির সেরা ও পবিত্র মানুষটির এত রক্ত প্রবাহিত হয় যে, জুতা-জোড়া রক্তাক্ত হয়ে যায়। সফরসঙ্গী হজরত যায়েদ বিন হারিসার উপর এত পাথর বর্ষিত হয় যে, তার মাথা ফেঁটে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আঘাত খেতে খেতে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে একটি বাগিচা দৃষ্টিগোচর হলে সেখানে প্রবেশ করেন। তখন পেছনে পেছনে আসা ঐসব দুষ্ট লোক ফিরে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। জখমে নেতিয়ে পড়া দুর্বল শরীর এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, মানুষের লাঞ্ছনার অনুযোগ করছি। হে আরহামুর রাহিমিন, আপনিই তো দুর্বলদের প্রভু! আপনিই তো আমার রব! আপনি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করেছেন? এমন অপরিচিত লোকদের কাছে, যারা আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, ভ্রুকুঞ্চিত করে, নাকি কোনো শত্রুর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন, যে আমার উপর কর্তৃত্ব খাটাবে?

‘হে আল্লাহ, আপনি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে কোনো কিছুর ব্যাপারেই আমার পরোয়া নেই। আপনার হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার চেহারার সেই নুরের অসিলায়, যার মাধ্যমে অন্ধকার আলোকিত হয়, দুনিয়া-আখেরাতের সববিষয় বিশুদ্ধ হয়- পানাহ চাচ্ছি যেন আমার উপর আপনার ক্রোধ বর্ষিত না হয় কিংবা আপনি যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার অসন্তোষ আমার থেকে দূরে রাখুন। আপনি ছাড়া কোনো শক্তি-ক্ষমতা কারো নেই।’

এমন হৃদয় নিংড়ানো ফরিয়াদ করার পর আল্লাহ তায়ালার শাহি দরবারে জোশ আসে। তিনি তৎক্ষণাৎ জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতা এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেন, ‘আল্লাহ তায়ালা আপনার সঙ্গে কওমের সব কথা শুনেছেন। তো, পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা আপনার খেদমতে হাজির। আপনি তাকে যেকোনো নির্দেশ দিতে পারেন।’

এবার পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম দিয়ে বলল, 'আপনার আদেশ হলে দুই পার্শ্বের পাহাড়কে চাপা দিতে পারি। ফলে এই গোত্র একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'আমি আশাবাদী, এই লোকেরা মুসলমান না হলেও তাদের সন্তানদের এমন কেউ মুসলমান হবে, যে আল্লাহর ইবাদত করবে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বাগানে বসেছিলেন, তা ছিল দুই কুরাইশ-সরদার উতবা ও শাইবার মালিকানাধীন। ঘটনাক্রমে তারা দুজন সেখানেই অবস্থান করছিল। দূর থেকে তারা পরিস্থিতি অবলোকন করছিল। নবীজির শারীরিক অবস্থা তখন এতই নাজুক ছিল যে, তাদের দিলেও চোট লাগে। ফলে তারা তাদের গোলাম 'আদ্দাস'কে আঙুরের একটি থোকা দিয়ে পাঠায়।

আদ্দাস আঙুর নিয়ে হাজির হলে নবীজি খাওয়ার আগে পড়লেন 'বিসমিল্লাহ'।

আদ্দাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই শব্দ তো এখানকার লোকেরা উচ্চারণ করে না!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তখন মনে হলো, এমন অচেনা শহরে আর কেউ না হোক অন্তত এই গোলামকে যদি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়, তা হলে মুসলমান হয়ে যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন, 'আদ্দাস, তোমার বাড়ি কোথায়? এবং ধর্ম কী তোমার?'

সে বলে, 'নিনাওয়া এলাকায়। আমি খ্রিষ্টান।'

নবীজি বললেন, নেককার ব্যক্তি হজরত ইউনুস বিন মাত্তার শহরের (অধিবাসী তুমি)?

আদ্দাস বিস্মিত হয়ে বলে, আপনি কীভাবে জানেন? বললেন, তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী।'

আদ্দাস তখন বুঝতে পারে যে, তিনি সত্য নবী। ফলে সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুমু খেয়ে বিদায় নেয়।[৩৬২]

---

[৩৬২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৩৭-৩৪২ (কিছু কিছু রেওয়ায়েত মোতাবেক আদ্দাস তখনই মুসলমান হয়, কিন্তু পরে প্রকাশ পায়। [আল ইসাবাহ- ৪/৩৮৬]

জিনদের ইসলামগ্রহণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন। সেখানে একরাতে তিনি নামাজে তেলাওয়াত করছিলেন। তখন ৭ অথবা ৯ জন জিনের ছোট একটি দল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুরআন কারিমের তেলাওয়াত শুনেই বুঝতে পারে এটি সত্য ধর্ম। তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং কওমের নিকট গিয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এমন হৃদয় শীতলকারী ফল এল। পরবর্তীতে জিনদের একটি বড় দল এসে মুসলমান হয়ে যায়।[৩৬৩]

দ্বিতীয়বার মক্কায় প্রবেশ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফরের লক্ষ্য ছিল সেখানে ইসলামের একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরি করা। বাহ্যিকভাবে ফলপ্রসূ সফর ছিল না এটা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপর্যস্ত অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ভয় ও শঙ্কা ছিল। কারণ, তার অনুপস্থিতিতে কুরাইশদের ক্রোধ-গোসসা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখন তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠপোষক আবু তালেব বেঁচে নেই, যার কারণে কুরাইশরা তার উপর হাত তুলতে পারত না, সবাই যাকে শ্রদ্ধা করত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করছিলেন মক্কায় প্রবেশের সময় কুরাইশরা তার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে, কিংবা কোনো কঠিন নির্যাতন করবে। আরবদের একটা রীতি ছিল—কেউ যদি কারো কাছে আশ্রয় চাইত, তা হলে তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করা অসম্মানজনক মনে করত। তারা এই আশ্রয়প্রার্থীকে নিজের জানমাল দিয়ে হেফাজত করত।

---

৩৬৩ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৪২, তাফসিরে ইবনে কাসির; সুরা আহকাফ: আয়াত ২৯-৩১

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف راجعا إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة، قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى: (سبل الهدى والرشاد: ٢/٤٤٣)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার একজন মহৎ সরদার মুতয়িম বিন আদির নিকট আশ্রয় নেওয়ার জন্য বার্তা পাঠান। মুতয়িম বিন আদি তার অস্ত্রসজ্জিত ছেলেকে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বরণ করে নেন। হারাম শরিফে এসে ঘোষণা দেন, 'মুহাম্মদ আমার আশ্রয়ে রয়েছে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তী সময়ে মুতয়িম বিন আদির এই ভালো কাজটির প্রশংসা করেছেন।[৩৬৪]

মুতয়িম বিন আদির আশ্রয়ে আসার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি কার্যক্রম সীমিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আশ্রয়দাতা এ ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিল যে, মক্কায় থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া যাবে না। তবে মক্কার বাইরে গিয়ে বিশেষ করে হজের মৌসুম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হাট-বাজারে এবং মিনার জনসমাগমে দাওয়াত দিতে কোনো সমস্যা নেই। এরই পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি আশ্রয়ের খোঁজ করছিলেন।

---

[৩৬৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৪৩-৩৪৪

তায়েফ সফরের সময়কাল

ইবনে সাদের মত অনুযায়ী তায়েফ সফর শাওয়ালের শেষের দিকে শুরু হয় এবং সেখানে তিনি দশদিন অবস্থান করেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২১১]

ইমাম বালাযুরি রহ. এর মত অনুযায়ী সফরের (রওনা ও প্রত্যাবর্তন) সময়কালটা ছিল ২৭ শাওয়াল থেকে ২৩ যুলকাদার মাঝামাঝিতে। [আনসাবুল আশরাফ- ১/২৩৭]

যেহেতু হজের মৌসুমের কারণে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ অনেক থাকে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলকদের শেষের দিকে ফিরে আসেন, যেন অভ্যাস অনুযায়ী হজে আগত লোকেদের মাঝে তাবলিগ করতে পারেন। এইবার হজে তাবলিগ করলে নগদ ফল দেখতে পান যে, ছ' ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। সামনে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

হিজরতভূমি

মক্কা থেকে দুশো নয় মাইল (তথা ৩৩৬ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত 'ইয়াসরিব'। এই স্থানটিকেই আল্লাহ তায়ালা তার শেষনবীর হিজরতভূমি, মুসলমানদের হেফাজত ও নুসরত, ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি, দাওয়াত, তাওহিদের প্রচার-প্রসারের জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

এই শহরটি ভৌগোলিকভাবে এতই সুরক্ষিত ছিল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ভেতরে থেকেই নির্বিঘ্নে দুশমনের সঙ্গে লড়তে পারতেন। শহরটির দক্ষিণ দিকে ঘনবসতি এবং খেজুর বাগান দিয়ে এমনভাবে পরিবেষ্টিত ছিল যে, বাইরে থেকে কেউ আক্রমণ করত, তা হলে ওখানের দুর্বোধ্য রাস্তাঘাট এবং গলিতে ঘুরেই ঘুরেই খেই হারিয়ে ফেলবে। নগরীর পূর্বদিকের অংশকে 'হাররায়ে ওয়াকিম' এবং পশ্চিমের অংশকে 'হাররায়ে ওয়াবারাহ' বলা হতো। আগ্নেয়গিরি থেকে সর্বদা লাভা উদগিরণ হতো। এজন্য কাফেলা ব্যতিত একাকী চলাফেরা করা কঠিন ছিল।

নগরীর উত্তরদিক কেবল উন্মুক্ত ছিল। সাধারণ কাফেলার যাতায়াতপথও এদিক দিয়েই ছিল। কোনো দুশমন আক্রমণ করলেও এদিক দিয়েই করত। কিন্তু 'ইয়াসরিব' নগরবাসী যেন পূর্ণরূপে নগরী রক্ষা করতে পারে, সেজন্য জায়গায় জায়গায় দুর্গসদৃশ বিভিন্ন পাঁচিল নির্মাণ করে। এগুলোকে আরবিতে 'আতাম' বলা হতো।

ইয়াসরিবের রাজনৈতিক পরিবেশও মক্কা থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে কোনো কবিলার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও শাসন চলত না। ইয়েমেন থেকে আগত দুই কবিলা- আউস ও খাযরাজ, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মর্যাদা এবং বলয় ছিল। উভয় গোত্রই অসাধারণ বাহাদুরি ও সাহসিকতার অধিকারী ছিল। অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকর্ম এবং ধর্মীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের দক্ষতায় ইহুদিদেরও একটা অবস্থান ছিল। তারা শহরতলীতে দুর্গ নির্মিত বস্তিতে বসবাস করত।[৩৬৫]

---

৩৬৫ আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২০৬, ২০৭

ইয়াসরিবের প্রথম মুসলমান

আউস এবং খাযরাজের মধ্যে চরম শত্রুতা ছিল। একদিনের ঝগড়াতেই তাদের একাধিক লোক মারা যেত। সপ্তম নববিবর্ষে আউস গোত্রের শাখা বনু আবদুল আশহালের কিছু লোক খাযরাজের বিপক্ষে কুরাইশকে নিজেদের জোটবদ্ধ করানোর জন্য মক্কায় আসে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আগমনের সংবাদ শুনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে এরচেয়ে উত্তম কথা শোনাব।' এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন বনু আবদুল আশহালের একজন কমবয়সি তরুণ ইয়াস বিন মুয়াজ বলেন, 'ভাইয়েরা, আল্লাহর কসম, এই কথা গ্রহণ করে নাও। তোমরা যেজন্য এসেছ, এর চেয়ে এটি অধিক উত্তম।' কিন্তু অন্যান্য লোকজন নীরব রইল, এই দাওয়াতের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না।[৩৬৬]

বুআস যুদ্ধ এবং তার প্রভাব

আউস গোত্রের লোকেরা কুরাইশকে নিজেদের পক্ষে ভিড়াতে সক্ষম না হলেও সপ্তম নববিবর্ষে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী বুআস যুদ্ধে প্রথমে সে তাদের সমপর্যায়ের ইহুদি কবিলা বনু নাযির এবং বনু কুরাইযাকে মিত্র বানিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করে নেয়। ফলে খাযরাজ গোত্র জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করেও পিছু হটতে বাধ্য হয়।[৩৬৭]

আউস ও খাযরাজের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাদের প্রবীণ ও বরেণ্য সরদার প্রায় সবাই নিহত হয়। মদিনার নেতৃত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৩৬৬] আলমুনতাযাম- ২/৩৮৬
ফায়দা : ১। ইবনুল জাওযি রহ. এই ঘটনাটি ৭ম নববি-বর্ষের অধীনে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বুঝা যায়, শেবে আবু তালেবের বয়কট পরবর্তী বছর (৮ম নববি-বর্ষে) হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য।
ফায়দা : ২। এই ইয়াস বিন মুয়াজ ঈমান এনেছিল। কিন্তু দেশে ফেরার পর তাকে বনু খাজরাজ হত্যা করে ফেলেছিল। আর সে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে দুনিয়া ত্যাগ করে। [মারিফাতুস সাহাবাহ, আবু নুয়াইম: ১/২৯৩] তার শাহাদাতের কিছুদিন পরই 'বুআস' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৬৬]

[৩৬৭] আলকামিল ফিত তারিখ- ১/২০১, ২০২. এই যুদ্ধ বনু কুরাইযার দুর্গের নিকটবর্তী 'বুআস' উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। [আলকামিল ফিত তারিখ- ১/২০২]

ওয়াসাল্লামের জন্য খালি করতে তার আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দেন।[৩৬৮]

ইহুদিরা বিজয়ীদের মিত্র হয়ে থাকে। এর থেকে আউস-খাযরাজ উভয়েরই আশঙ্কা হয় যে, ইহুদিরা পুনরায় ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে। এই আশঙ্কার কারণেই দুই গোত্রের বুদ্ধিমান লোকেরা- যারা আগে থেকেই তাদের মধ্যকার যুদ্ধের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল- একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং সুদৃঢ় নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে বাধ্য হয়।

উভয় কবিলার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে খাযরাজের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ছিল একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে বুআস যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। বিচক্ষণতা, চাটুকারিতা, দূরদর্শিতায় সে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। আউস ও খাযরাজের সরদাররা এটাও ভাবে যে, ভবিষ্যতে পারস্পরিক সংঘাত থেকে বাঁচতে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা জোরদার করতে এই সুরতও হতে পারে যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলকে সমগ্র ইয়াসরিবের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। নতুন সরকারের অধীনে নগর-পরিচালনা করা হবে।[৩৬৯]

---

৩৬৮ সহিহ বুখারি- ৩৯৩০ (কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাকদামিন নাবিয়্যি ওয়া আসহাবিহিল মাদিনাহ)

৩৬৯ সহিহ বুখারি- ৪৫৬৬ (কিতাবুত তাফসির, মানাকিব, বাবু ওলা তাসমাউন্না মিনাল্লাযিনা উতুল কিতাবা), আসসিরাতুন নববিয়্যাহ, আবুল হাসান আলি নদবি- পৃষ্ঠা ২০০- ২০২

ইয়াসরিবের প্রথম কাফেলার ইসলামগ্রহণ

(নববি দশম বর্ষ)

আউস-খাযরাজের কল্পনাতেও ছিল না যে, আল্লাহ তায়ালা খুব শীঘ্রই তাদেরকে অনেক বড় সৌভাগ্য নসিব করতে যাচ্ছেন। তাদেরকে এমন নেয়ামত প্রদান করবেন, যার মধ্যে তাদের কোনো অংশীদার থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পরপরই ১১ নববিবর্ষের হজে তার অভ্যাসমতো বিভিন্ন কবিলাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাইরে বের হন।

মিনার বড় জামরার নিকটবর্তী পাহাড়ের এক ঘাঁটিতে খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা ইয়াসরিব থেকে হজের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত দেন এবং কুরআন কারিম থেকে পড়ে শোনান।

ইয়াসরিবের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের থেকে অনেক শুনেছে যে, খুব শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি অবয়ব, উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র দাওয়াতে তারা অনেক প্রভাবিত হয়। তাদের বিশ্বাস- তিনিই সেই নবী, যিনি মানবতার মুক্তির অগ্রদূত হবেন। পাশাপাশি তাদের এটাও অনুভব হয় যে, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের সমাপ্তি, দেশের জীবিকা এবং চাষাবাদের উপর জেঁকে বসা ইহুদিদের থেকে মুক্তি পাওয়ার এটিই একমাত্র পথ যে, আমরা সকলেই নবীর প্রতি ঈমান আনব। ফলে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, 'আমাদের কওমের মধ্যে যত অনিষ্ট, বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসাদ রয়েছে, তা দুনিয়ার অন্য কোথাও নেই। হতে পারে আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।'

ইয়াসরিবের ছ' ব্যক্তি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। আসআদ বিন যুরারা, আউফ বিন আফরা, রাফি বিন মালিক, জাবির বিন আবদুল্লাহ, কুতবা বিন আমির এবং উকবা বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তারা দেশে

ফিরে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সর্বত্র দাওয়াতের প্রচার-প্রসার হয়ে যায়। তখন বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করে।[৩৭০]

ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে আলোচিত হতে থাকে যে, মক্কাতে একজন সত্য নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তার গোত্রের কঠিন নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছেন। তিনি কুরাইশি এবং হাশিমি বংশোদ্ভূত। আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র এবং আবদুল্লাহর পুত্র। ইয়াসরিববাসীর কাছে এই বংশের পরিচয় অজানা ছিল না। তারা জানত কিছুদিন পূর্বে তাদেরই এক বংশ বনু নাজ্জারের কন্যা সালামা বিন আমর কুরাইশি সরদার হাশিমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা এটাও জানত যে, আবদুল মুত্তালিব বাল্যকালে এখানকার অলিগলিতেই খেলাধুলা করে কাটিয়েছেন। এই এলাকারই মেয়ে ফাতিমা বিনতে আমরকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তার গর্ভেই পুত্র আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বনু নাজ্জারের বয়স্ক নারীদের সেদিনকার কথা মনে আছে, যেদিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এখানেই অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন এবং এই এলাকাতেই তাকে দাফন করা হয়। এরপর আমিনা বিনতে ওয়াহাবের স্বামীর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা, ফিরে যাওয়ার পথে আবওয়াতে মৃত্যুবরণ করার কথাও তারা ভোলেননি। ছয় বছর বয়সি মুহাম্মদ তার সাথেই ছিলেন। আর আজ সেই 'মুহাম্মদ'ই একজন পথপ্রদর্শক ও নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করছেন। আসমানি বিধানের প্রতি ডাকছেন; যদিও এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তারপরও তাদের মধ্যে যেন অন্যরকম অন্তরঙ্গতা অনুভূত হচ্ছিল।

---

[৩৭০] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪২৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৭১, ৩৭২

প্রথম আকাবার বাইয়াত

(নববি ১১ বর্ষ)

পরবর্তী বছর তথা ১১তম নববি বর্ষে আউস ও খাযরাজের ১২ ব্যক্তি হজে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান। তারা পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। এখন তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত ছাড়াও তার মদদ-নুসরত এবং দীনের তালিম নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এই ১২জনের মধ্যে হজরত আসআদ বিন যুরারা, উকবাহ বিন আমির, উবাদা বিন সামিত এবং মালিক বিন তাইয়িহান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-ও ছিলেন। পরবর্তীতে এই ব্যক্তিরা প্রখ্যাত সাহাবিদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকা, সকল পুণ্য কাজে আনুগত্য করার উপর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নেন। এটাকেই 'প্রথম আকাবার বাইয়াত' বলা হয়ে থাকে।[৩৭১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্ধ কারি আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুরআন কারিমের শিক্ষক হিসেবে তাদের সাথে প্রেরণ করেন।[৩৭২]

হজরত আসআদ বিন যুরারার ঘরে হজরত মুসআব ও হজরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম অবস্থান করে ইসলামের নতুন কেন্দ্রে তাওহিদের দাওয়াত, নামাজের ইমামতি, কুরআন শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।[৩৭৩]

---

[৩৭১] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪২৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৭১, ৩৭২

[৩৭২] তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২৩৪, সহিহ বুখারি- ৩৯২৪ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সা., কিতাবুল মানাকিব)

কুরআনে কারিম শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সূচনা থেকেই অন্ধ কারিদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। আর পরবর্তী সকলেই হজরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমের উত্তরাধিকার। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। আমিন।

[৩৭৩] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪২৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৭১, ৩৭২

চার বছর পূর্বে বিগত হওয়া আউস-খাযরাজের মধ্যকার ঐতিহাসিক 'বুআস' যুদ্ধে উভয় গোত্রের বড় বড় সরদাররা অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে পরবর্তীতে আউসের নেতৃত্ব সাদ বিন মুয়াজ এবং খাযরাজের নেতৃত্ব সাদ বিন উবাদার নিকট আসে। হজরত মুসআব বিন উমাইর এবং আসআদ বিন যুরারা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলামের তাবলিগ করা আরম্ভ করেন, তখন আউস গোত্রের সরদার সাদ বিন মুয়াজ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। তার চাচাত ভাই উসাইদ বিন হুদাইরও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি গোত্রের নায়েব-সরদার এবং বাহিনীপ্রধান ছিলেন।

ইসলামের এই তাজা উৎসাহ-উদ্দীপনা আউস-খাযরাজের পুরোনো শত্রুতাকে কেবল ধুয়ে-মুছে সাফই করেনি; বরং নগরীতে এক নতুন ঐক্য এবং সংঘবদ্ধ হুকুমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে তারা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলকে একচ্ছত্র শাসক হিসেবে নিযুক্ত করার যে চিন্তা করেছিল, তা ত্যাগ করে। কারণ, সুদৃঢ় নিরাপত্তা এবং স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল তারা ইসলামের বদৌলতেই লাভ করেছিল।[৩৭৪]

[৩৭৪] তারিখে ইবনে খালদুন- ২/৪১৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৩৮৮, ৩৮৯

মেরাজ সফর

বিগত কয়েক বছর যাবৎ যেভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একের পর এক মুসিবত নেমে আসছিল, তার সীমাহীন ব্যথা ও বেদনা উপশম করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সম্মানে ভূষিত করলেন, ইতোপূর্বে কোনো মানুষের তা নসিব হয়নি। এটি ছিল 'মেরাজ সফর'-এর গৌরব। এই সফরে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সম্মাননা এবং নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে শুয়ে ছিলেন। ফেরেশতাদের সরদার জিবরাইল আলাইহিস সালাম সেখানে আগমন করেন। সঙ্গে ছিল তার ঘোড়াসদৃশ পালকযুক্ত এক প্রাণী। একেই 'বুরাক' বলা হয়। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উপর সওয়ার করিয়ে তিনিও উঠলেন এবং মসজিদে হারাম থেকে শামের দিকে নিয়ে চললেন। বুরাকের গতি এত দ্রুত ছিল যে, তার দৃষ্টি যতদূর যেত, তার পা-ও সেখানে পড়ত। সফরের এই প্রথম ধাপ তথা ইসরা বাইতুল মাকদাস নগরীর মসজিদে আকসাতে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী তার সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে নামাজ আদায় করেন। এর মাধ্যমে বাস্তবে প্রমাণিত হলো যে, তিনিই 'নবীকুল শিরোমণি'।

মসজিদে আকসা থেকে সফরের দ্বিতীয় ধাপ আরম্ভ হলো; একে বলে মেরাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে উচ্চ আসমানে পৌঁছেন। তার সঙ্গে আসমান সফর করেন। প্রতিটা আসমানের দরজাতেই ফেরেশতারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রথম আসমানে হজরত আদম আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয় আসমানে ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া আলাইহিস

সালাম, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম, চতুর্থ আসমানে ইদরিস আলাইহিস সালাম, পঞ্চম আসমানে হারুন আলাইহিস সালাম, ষষ্ঠ আসমানে মুসা আলাইহিস সালাম এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে নবীজির মোলাকাত হয়। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বাইতুল মামুরের দরজায় বসে ছিলেন, যা সোজা বাইতুল্লাহর বরাবর উপরে অবস্থিত। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার তাওয়াফ করে থাকে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোজখ এবং নাফরমানদের শাস্তির বিভিন্ন ধরন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। তদ্রূপ জান্নাতের নেয়ামতও অবলোকন করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজিমের নিচে একটি পবিত্র কুলবৃক্ষ 'সিদরাতুল মুনতাহা' পৌঁছলেন। এখানে ফেরেশতাদের সর্বদা ভিড় লেগে থাকে।

সবশেষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার একান্ত দরবারে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তার শান মোতাবেক দিদার লাভ করলেন। এই সাক্ষাতেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ হাদিয়া দিলেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালামের পরামর্শে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমানোর দরখাস্ত করেন। সবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হিসেবে রয়ে যায়। কিন্তু সাওয়াব ঠিকই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের দেওয়া হবে বলে সুসংবাদ দান করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সফর শেষ করে সসম্মানে আপন জায়গায় ফিরে আসেন, তখনও পৃথিবীর এত স্বল্প সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল যে, নবীজির বিছানাটি পর্যন্ত উষ্ণ ছিল।

ভোর হলে তিনি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন মুশরিকরা অভ্যাসমতো হাসিঠাট্টা করতে থাকে। আবু জাহল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করতে গিয়ে বলে, 'তোমার সাথি বলে সে নাকি এক রাতেই বাইতুল মাকদাস এবং আকাশ ভ্রমণ করে এসেছে। তুমি কি এটাকেও সত্য মনে করবে?'

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দ্বিধা এবং নিশ্চিন্তে বলেন, হ্যাঁ, আমি সর্বাবস্থায় তার কথা সত্য মনে করি।'

মোটকথা, মুসলমানরা এই ঘটনাকে সত্যায়ন করে এবং আল্লাহর উপর তাদের ঈমান আরো মজবুত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দির সঙ্গে আদায় করার কারণে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা আরো জোরদার হয়। মেরাজের এই ঘটনা জাগ্রত ও চেতনা অবস্থার কোনো স্বপ্ন ছিল না। কারণ, স্বপ্ন হলে এটাকে মুজিজা এবং বিস্ময়কর ঘটনা বলে বর্ণনা করার কিছু নেই। আর মুশরিকরাও এটা নিয়ে হাসিঠাট্টা করত না। কারণ, স্বপ্নে তো মানুষ কত কিছুই দেখে থাকে।[৩৭৫]

---

৩৭৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/২৭৬-২৮৫ (দারু হিজর সংস্করণ), আলকামিল ফিত তারিখ- ১/৬৫০, ৬৫১ (দারুল কিতাবিল আরাবি)

নোট : মেরাজের ঘটনার মাস ও বছর নিয়ে কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। ২৭ রজব ১০ নববি-বর্ষ মতটি প্রসিদ্ধ আছে।

আল্লামা আইনি রহ. ১২ নববি-বর্ষকে অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [উমদাতুল কারি- ৪/৩৯]

হাফেজ আবদুল গনি মাকদাসি রহ. তার 'সিরাত নববিয়্যাহ' গ্রন্থে '১২ রবিউল আওয়াল সোমবার' মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস রা. এর যে রেওয়ায়েত তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, হাফেজ ইবনে কাসির রহ. তাকে মুনকাতি বা দুর্বল বলেছেন।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. তার 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' [৪/২৭০] গ্রন্থে উপর্যুক্ত বক্তব্য ছাড়াও নিম্নোক্ত মতগুলো উল্লেখ করেছেন:

১ ইবনে আসাকির রহ. এর নিকট নবুওয়াতের প্রথম বছরগুলোতে হয়েছে (অর্থাৎ হিজরতের ৫ বছর পূর্বে)।

২ ইবনে ইসহাক রহ. এর নিকট নবুওয়াতের দশম বছরে হয়েছে (মাস জানা নেই)।

৩ সুদ্দি রহ. এর মত হলো হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে (যিলকদ ১২ নববি-বর্ষে) তা সংঘটিত হয়।

৪ যুহরি রহ. এর মত হলো হিজরতের এক বছর পূর্বে (রবিউল আওয়াল ১৩ নববি-বর্ষে) তা সংঘটিত হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত হওয়ার' মতটি দলিলের আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর তিনি মেরাজের সময় সম্পর্কে দশটি মত উল্লেখ করেন। সুদ্দি রহ. থেকে তিনি তার এই বক্তব্য নকল করে –হিজরতের ১৭ মাস পূর্বে সংঘটিত হয়– বলেন যে, এই হিসেবে মেরাজের ঘটনাটি রমজান কিংবা শাওয়ালে সংঘটিত হয়ে থাকবে। অন্যান্য মতের কোনটিই তিনি অগ্রগণ্য মত বলে মন্তব্য করেননি। [ফাতহুল বারি- ৭/২০৩]

সর্বোপরি, উপর্যুক্ত মতগুলো থেকে কোনো একটি অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা অনেক কঠিন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সবকটি মতই দুর্বল রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন অবস্থায় উত্তম পদ্ধতি হলো পূর্বের ঘটনাবলির

মেরাজের ঘটনা এই বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য আগমন করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত কোনো এক শহর-নগর বা রাজ্যের জন্য ছিল না। এর পরিধি সারা দুনিয়া নয় কেবল, বরং সমগ্র সৃষ্টির উপর। পূর্ববর্তী সব উম্মতেরও তার অনুসরণ করা ছাড়া মুক্তি পাবে না। কারণ, পূর্বেকার নবী-রাসুলগণও তার মুকতাদি হয়ে নামাজের জন্য একই কাতারে দণ্ডায়মান।

মেরাজের ঘটনা এদিকেও ইঙ্গিত করে যে, মুসলমানদের নিঃসঙ্গতা, দুর্বলতা এবং জনস্বল্পতার পরেও যথাশীঘ্রই ইসলাম পৃথিবীর দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার সময় অত্যাসন্ন।

ধারাবাহিকতা লক্ষ করা, ফলে আলোচ্যবিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ ও ইঙ্গিত মিলে যেতে পারে। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে কিংবা এক বছর পূর্বে; কোনোটিই পূর্বের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা ও গতির সঙ্গে খাপ খায় না। তবে হিজরতের ১৭ মাস পূর্বে'র যে মতটি ইবনে হাজার আসকালানি রহ. সুদ্দি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তা যুক্তিসঙ্গত।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হলো ইবনে সাদের বক্তব্য, এটি সুদ্দির মতেরও কাছাকাছি। তিনি বলেন, 'হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে রমজানের ১৭ তারিখ শনিবার রাত যখন হলো...'। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২১৩] ১৭ রমজান মাদানি পঞ্জিকা অনুযায়ী, মক্কি পঞ্জিকা মোতাবেক ১৭ রজব হয়। আর যদি মক্কি পঞ্জিকার ২৭ রজবের মশহুর বক্তব্য মেনে নেওয়া হয়, তা হলে মাদানি পঞ্জিকা তথা চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী তা ২৭ রমজান ১২ নববি-বর্ষের ঘটনা হবে। তার খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হবে ২৬ এপ্রিল ৬২১ সাল। আলি মুহাম্মদ খান এই মতটি গ্রহণ করেছেন। [তাকওয়ীমে আহদে নববি, পৃষ্ঠা ৮০, ১১৬]

দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত

(নববি ১২ম বর্ষ)

১২ নববিবর্ষে হজরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াসরিব থেকে হাজিদের বড় একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় আসেন। হজের পর ১২ যিলহজ রাতে মিনার সেই ঘাঁটিতেই সকলে সমবেত হন।[৩৭৬] তারা ছিলেন ৭৫জন। তন্মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী। এই কাফেলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানমাল সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তাদের দেশে নবীজিকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল।

নবীজির চাচা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও মুসলমান হননি। তবে তিনি তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকতেন সর্বক্ষণ। ইয়াসরিববাসীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখে তিনি বলেন, বুঝে নিও, তোমরা যে আবদার করছো, সত্যি সত্যিই যদি তোমরা তাকে দুশমন থেকে রক্ষা করতে পার, তা হলে তো ঠিক আছে। অন্যথায় এখনই অপারগতা প্রকাশ কর। কারণ, মুহাম্মদ আমাদের হেফাজতে রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, তাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবার দুশমনের হাতে সোপর্দ করে দিলে।'

তারা উত্তর দেয়, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতিই নিতে চান, আমরা তা দিতে প্রস্তুত।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের যেভাবে হেফাজত করো, সেভাবে আমারও হেফাজত করবে।'

হজরত বারা বিন মারুর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবেগের আতিশয্যে নবীজির হাত ধরে বাইয়াত করতে গিয়ে বলেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনাকে এমনভাবে হেফাজত

---

[৩৭৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৫১৩

করব, যেমন আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করি। আমরা যুদ্ধবাজ জাতি। যুদ্ধ করা আমাদের ঐতিহ্যগত স্বভাব।' এর উপর উপস্থিত সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করে। তখন মালিক বিন তাইয়িহান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, এমন হবে না তো যে, আল্লাহ তায়ালা যখন আপনাকে বিজয়ী করবেন, তখন আমাদেরকে ছেড়ে নিজের কওমের নিকট ফিরে আসবেন?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এটা হবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়বে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি হবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব। তোমাদের নিরাপত্তা-চুক্তি আমারই চুক্তি, তোমাদের সম্মান, আমারও সম্মান।'

এটি এমন মজবুত প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পৃথিবীর এক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ। একেই দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বারোজন দায়িত্বশীল নির্ধারণ করে দেন। তারা হলেন-আসআদ বিন যুরারা, সাদ বিন রাবি, সাদ বিন উবাদা, উসাইদ বিন হুদাইর, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, বারা বিন মারুর, উবাদা বিন সামিত, রাফি বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুনজির বিন আমর, সাদ বিন খায়সামা, আবুল হায়সাম মালিক বিন তাইয়িহান। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[৩৭৭]

বাইয়াতে উপস্থিত আরো কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

বাইয়াত-অনুষ্ঠানে আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যেমন : আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (উহুদযুদ্ধে শহিদ), আবু আইয়ুব আনসারি (খালেদ বিন যায়েদ), আউস বিন সাবিত, আবু তালহা আনসারি (যায়েদ বিন সাহল), সাদ বিন রাবি (গাজওয়া উহুদে শাহাদাত বরণকারী), আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (যিনি স্বপ্নে আজান দেখেছিলেন), খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ (খন্দকযুদ্ধে শহিদ), মুয়াজ বিন জাবাল এবং উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৩৭৮]

---

[৩৭৭] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৪৮
[৩৭৮] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৬০-৪৬৮

বনু মাজিনের যায়েদ বিন আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে স্ত্রী উম্মে উমারা (নুসাইবা বিনতে কাব) এবং দুই ছেলে হাবিব বিন যায়েদ এবং আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩৭৯]

বাইয়াতে আকাবাতে অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তা বাস্তবে পূর্ণ করে দেখান। এই লোকগুলোই পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জানমাল উৎসর্গ করেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দকযুদ্ধে তাদের অধিকাংশ অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন।

সাহাবিদের হিজরত

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার কিছুদিন পর ১৩ নববিবর্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালার দীনের খাতিরে স্থায়ীভাবে আপন দেশ ও পরিবার ছেড়ে ইয়াসরিব চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মক্কা থেকে একটি খেজুরভূমির দিকে হিজরত করে যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে তা ইয়ামামা কিংবা হাজারের কোনো এলাকা হবে। কিন্তু সেটা তো মূলত ইয়াসরিব নগরী।'[৩৮০]

---

[৩৭৯] এই মাজিন খান্দানের আত্মোৎসর্গের কাহিনি বড়ই বিস্ময়কর। যায়েদ বিন আসিম রা. বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদযুদ্ধে তার স্ত্রী উম্মে উমারা (নুসাইবা বিনতে কা'ব) রা. এবং তার দুই ছেলে: আবদুল্লাহ রা. ও হাবিব রা. অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উহুদযুদ্ধে উম্মে উমারা নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিরক্ষায় যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তা আজও ইসলামি ইতিহাসে বিস্ময়কর হয়ে আছে। পরবর্তীতে ভণ্ডনবী মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে হাবিব রা. শহীদ হন। উম্মে উমারা রা. মুসাইলামা-বিরোধী যুদ্ধে ছেলে আবদুল্লাহ রা. নিয়ে শরিক হন। অনেক বড় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তার এক হাতও কাটা পড়ে। তার ছেলে আবদুল্লাহই মুসাইলামা কাজ্জাবকে কুপোকাত করে। এই আবদুল্লাহ বিন যায়েদই মদিনায় প্রসিদ্ধ হাররা যুদ্ধে ইয়াযিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হন। [আলইসবাব, উসদুল গাবাহ, আলইসতিয়াব: নুসাইবা, আবদুল্লাহ বিন যায়েদ ও হাবিব বিন যায়েদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য]

[৩৮০] সহিহ বুখারি- কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দেশত্যাগের এই আমলকে হিজরত বলা হয়। মুসলমানরা ধীরে ধীরে ইয়াসরিব চলে যেতে থাকেন। হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার আগে হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন।[৩৮১]

কুরাইশরা এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল যে, আউস ও খাযরাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। ফলে তারা যথাসম্ভব হিজরতকারীদের পথ রোধ করতে থাকে। পরিবারসহ সর্বপ্রথম আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হন। তিনি তার স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও দুধের শিশু সন্তানকে নিয়ে রওনা হন। পথিমধ্যে মুশরিকরা তাকে ঘিরে ধরে। তারা বলে, তুমি যদি যেতে চাও, একা যেতে পারো; কিন্তু স্ত্রী-সন্তানকে আমাদের কাছে ছেড়ে যেতে হবে।'

আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে বের হয়ে যান। হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক বছর পর্যন্ত পিতার বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকেন। আর সন্তান মা-বাপ থেকে দূরে চাচাদের কাছে লালিত-পালিত হচ্ছিল।

সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের জন্য বের হলে কুরাইশ পিছু নিয়ে তার পথরোধ করে। অবশেষে তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি তাদেরকে দিয়ে মুক্তি পান। কেবল হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পুরোদস্তুর ঘোষণা দিয়ে হিজরত করেন এবং তার পথরোধ করার দুঃসাহস কারো হয়নি।[৩৮২]

---

[৩৮১] সহিহ বুখারি- ৩৯২৪, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

[৩৮২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৪২০-৪৩৭...। সাহাবায়ে কেরামের হিজরতে সময়ে নবুওয়াতের তেরো বছর পূর্ণ হয়ে চৌদ্দতম বছরের ৩য় মাস চলছিল।

নবীজির হিজরত

(রবিউল আওয়াল ১লা হিজরি/ সেপ্টেম্বর ৬২২)

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তখনও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুও নবীজির নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল নবীজির সঙ্গে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করা। তিনি সফরের উদ্দেশ্যে দুটি উষ্ট্রী চার মাস যাবৎ বাবলা বৃক্ষের পাতা খাইয়ে পালছিলেন।[৩৮৩]

সাহাবায়ে কেরাম মক্কা থেকে চলে যাচ্ছিলেন। হজরত উসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, যায়েদ বিন খাত্তাব, হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব, যায়েদ বিন হারিসাসহ ধীরে ধীরে সকল সাহাবিই

---

৩৮৩ সহিহ বুখারি- ৩৯০৫, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ফায়দা : ১। দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা ১২ নববি-বর্ষ যিলহজে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নববি-বর্ষে হিজরতে হুকুম নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরামের হিজরত আরম্ভ হয়। আর সে সময়ই হজরত আবু বকর রা. নবীজির নিকট হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করা শুরু করে দেন এবং এ উদ্দেশ্যে দুটি উটও খরিদ করেন। [وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر সহিহ বুখারি- ৩৯০৫]

ফায়দা : ২। সওয়ারিকে বাবলা বৃক্ষের পাতার মতো এমন উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, হিজরতের সফরে দুশমনের পিছু নেওয়ার আশঙ্কা ছিল। উষ্ট্রী যদি সুস্থ-সবল হয় এবং তার খাদ্যভাণ্ডারে খাবার সঞ্চিত থাকে, তা হলে সে দ্রুত ও বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ সফর করতে সক্ষম হবে। উটের জায়গায় উষ্ট্রী বেছে নেওয়ার পিছনে হেকমত হয়তো এটা ছিল যে, মরুভূমিতে যদি খাবার না পাওয়া যায় তা হলে উটের দুধ পান করা যাবে।

ফায়দা : ৩। ঐ দুটি উষ্ট্রী উন্নতজাতের ছিল। হজরত আবু বকর রা. দুটিকে আটশ' দিরহাম (বর্তমান সময়ে যা দুই হাজার ডলার) দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২২৮] এর মধ্যে একটি উষ্ট্রীর নাম ছিল 'কাসওয়া'। নবীজির শেষজীবন পর্যন্ত তা উত্তম সওয়ারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার নাম জাদআ এবং আযবাও ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/৪৯২]

মদিনায় হিজরত করতে থাকেন। কেবল এমন কিছু সাহাবি রয়ে যান, যারা কাফেরদের একেবারে নখদর্পণে থাকার দরুন হিজরত করতে একেবারেই অপারগ ছিলেন।[৩৮৪]

হিজাজের বিভিন্ন এলাকায় এমন কিছু সাহাবি ছিলেন, যাদের এলাকা নিরাপদ আশ্রয় ছিল। ফলে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আতিথেয়তার সৌভাগ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করতেন। তন্মধ্যে ইয়েমেনের দাউস গোত্রের এক বাহাদুর তুফাইল বিন আমর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার দুর্ভেদ্য দুর্গে আসার জন্য আবদার করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য আনসারদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরখাস্ত কবুল করেননি।[৩৮৫]

হত্যার ষড়যন্ত্র

মুসলমানরা একে একে মক্কা ত্যাগ করতে থাকায় কুরাইশদের মনে আশঙ্কা জাগে, তারা সেখানে গিয়ে হয়তো এমন ঘাঁটি তৈরি করবে, যা মক্কার জন্য বিপজ্জনক হয়ে যাবে। তাই নবীজি সম্পর্কে এমন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, এই নতুন ধর্ম যেন আর প্রসার লাভ করতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে মক্কার বড় বড় নেতারা 'দারুন নদওয়া'তে পরামর্শে বসে। বৈঠকে প্রত্যেক বংশের একজন সরদার আহ্বান করা হয়। উমাইয়া বিন খালফ, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, নজর বিন হারিস গং উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ প্রস্তাব দেয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দি করা হোক। কেউ বলে, তাকে দেশান্তর করাই যথেষ্ট।

আবু জাহলের মত ছিল তাকে কতল করা হোক। বৈঠকের অন্যরা এই মতটিই প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সমস্যা ছিল, তৎকালীন সমাজে কবিলার প্রত্যেক সদস্যের জীবন রক্ষা করা প্রত্যেকের উপর কর্তব্য হিসেবে মনে করা হতো। আশঙ্কা ছিল, এই সিদ্ধান্তের কারণে বনু হাশিম এবং বনু

---

[৩৮৪] সহিহ বুখারি- ৪৯৪১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪২০-৪৩৭
[৩৮৫] সহিহ মুসলিম- ৩২৬, (কিতাবুল ঈমান)

আবদু মানাফের সকল শাখা হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একজোট হয়ে যাবে। ফলে মক্কা রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। তখন অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক খান্দান থেকে একজন করে লোক নির্বাচন করা হবে এবং সম্মিলিতভাবে তারা আজ রাতেই নবীজির বাড়ি ঘেড়াও করবে এবং সকলে একযোগে আক্রমণ করবে।[৩৮৬]

হিজরতের নির্দেশ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে নবীজি

সেদিনই আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাৎক্ষণিক হিজরতের হুকুম করেন।[৩৮৭] কুরাইশের অনেক লোকই নবীজির প্রতি চরম দুশমনি থাকার পরেও নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র ঠিকই আমানত রাখত। তিনি ঐসব আমানত হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সোপর্দ করে তা নির্দিষ্ট মালিকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাকেও ইয়াসরিব চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৮৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘর ত্যাগ করলেন। এই ঘরে তিনি হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিয়ের পর দীর্ঘ আটাশ বছর অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আজ কেবল এই ঘরই না; বরং এই পবিত্র শহর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। তাকে তখন স্ত্রী হজরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং ছোট দুই কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকেও ছেড়ে যেতে হচ্ছে। বড় কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাও মক্কায় স্বামী আবুল আসের ঘরে ছিলেন। আবুল আস তখনও মুসলমান হননি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। যখন আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম আসে সেদিন ভোর পর্যন্ত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও জানতেন না যে, আজই তারা রওনা হবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরের তীব্র গরমের সময় মাথায় রুমাল দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা আবু

---

[৩৮৬] সুরা আনফাল, আয়াত ৩০; সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮০-৪৮২
[৩৮৭] সহিহ বুখারি- ৩৯০৫
[৩৮৮] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৫

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে গমন করেন। তাকে বলেন যে, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম এসেছে।'

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার সাহচর্য কি আমি পাব?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'[৩৮৯]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠেন। আবেগে উদ্বেলিত হয়ে কেঁদে ফেলেন[৩৯০] এবং আরজ করেন, 'আমার দুটি উষ্ট্রীর একটি আপনি গ্রহণ করুন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঠিক আছে, তবে মূল্য দিয়ে।'[৩৯১]

হজরত আয়েশা এবং আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অত্যন্ত দ্রুত সফরের জন্য খাবার-পানির আসবাবপত্র প্রস্তুত করেন। কিন্তু খাবারের থলি এবং পানির মশক বাঁধার জন্য কোনো রশি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফলে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'বাঁধার জন্য কোমরবন্দ ছাড়া কিছুই নেই।'

পিতা বললেন, 'এটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে খাবারের থলি, আরেকভাগ দিয়ে পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও।' তিনি তাই করেন। এই কারণেই তাকে 'জাতুন নিতাকাইন' তথা দুই কোমরবন্দওয়ালী বলা হয়ে থাকে।[৩৯২]

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যা আসমা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অন্ধ বৃদ্ধ পিতা আবু কুহাফাকে একা ফেলে যাচ্ছিলেন। তার ঘরের সব অর্থকড়ি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের জন্য নিয়ে নেন।[৩৯৩] এরপর তিনি নবীজিকে নিয়ে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যান।[৩৯৪]

---

[৩৮৯] সহিহ বুখারি- ৩৯০৫

[৩৯০] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৫

[৩৯১] সহিহ বুখারি- ৩৯০৫

[৩৯২] সহিহ বুখারি- ২৯৭৯ (কিতাবুল জিহাদ, বাবু হামলিয যাদ ফিল গাযবি)

[৩৯৩] মুসনাদ আহমাদ- ২৬৯৫৭, সহিহ বুখারি- ৩৯০৫ (কিতাবুল মানাকিব), সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৭

তারা বের হয়ে যাওয়ার পর হজরত আবু কুহাফার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন সন্দেহ হয়, তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার মনে হচ্ছে আবু বকর তোমাদের কষ্টে ফেলে অর্থকড়ি সব নিয়ে গেছে।'

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, 'না না, তিনি তো আমাদের জন্য অনেক রেখে গিয়েছেন।' তারপর আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যেই তাকে মুদ্রা রাখা হতো, সেখানে ছোট ছোট পাথর রেখে দিয়ে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর অন্ধ দাদার হাত ধরে সেই কাপড়ের উপর স্পর্শ করান। ফলে দাদা আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, যদি এত কিছুই রেখে গিয়ে থাকে, তা হলে তো সে খুব ভালো করেছে। তোমাদের দিনকাল স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যাবে।'[৩৯৫]

হিজরতের সফরের দূরদর্শিতা

যেহেতু মক্কা থেকে সোজা পথে ইয়াসরিব গেলে আশঙ্কা ছিল কুরাইশ পিছু নিয়ে আটক করে ফেলবে। তাই খুব বুঝে-শুনে তারা বের হলেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্র আবদুল্লাহ এবং আজাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহাইরাকেও যুক্ত করে নেন। আবদুর রহমান বিন আবু বকর যেহেতু তখনও মুসলমান হননি, তাই তাকে কিছুই জানানো হলো না। সিদ্ধান্ত হয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ফায়েদা : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুপুরে বের হওয়ার পিছনে হেকমত ছিল যে, কুরাইশ তার হিজরতের ব্যাপারে আঁচ করতে পেরেছিল, কিন্তু তারা নিশ্চিত ছিল যে, তিনি রাতের বের হবেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ধারণাতীত সময় দুপুরে বের হন, এ সময় সাধারণত লোকেরা বিশ্রামে থাকে। রওনা হন তিনি মাদানি রবিউল আওয়াল (মক্কি মহররম মাস) মোতাবেক সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মের মৌসুমে।
কিন্তু কিছু আলেম ইবনে ইসহাকের এই রেওয়ায়েত যেখানে হজরত আলি রা.কে চাদর দিয়ে ঢেকে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিছানায় শুইয়ে রাখার' কথা এসেছে; তাকে তারা 'মক্কি রবিউল আওয়াল (মাদানি জুমাদাল উলা) মোতাবেক নভেম্বর বলে উল্লেখ করেন। অথচ নভেম্বরের শীতের মৌসুমে কেউ-ই আঙিনায় শুয়ে থাকে না। বরং সেপ্টেম্বরের শেষদিকে তো এমন হয় যে, রাতেরবেলা আঙিনায় বিশ্রাম নেওয়া হয়। আর এমন স্বাভাবিক উষ্ণতার মধ্যেও চাদর গায়ে দেওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই এটি নিঃসন্দেহে সেপ্টেম্বর মাস ছিল।

[৩৯৪] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৫

[৩৯৫] মুসনাদ আহমাদ, ২৬৯৫৭

ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বাইরে গারে সাউরে গিয়ে তিনরাত আত্মগোপন করে থাকবেন। এ সময় মক্কাবাসীর অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত করার কাজ করতেন আবদুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তৃতীয়দিন যখন কুরাইশ ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দেয়, তখন তারা উষ্ট্রীতে চড়ে অপ্রসিদ্ধ পথে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন। অপরিচিত রাস্তায় পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত নামক একজন পেশাদার গাইড ভাড়া নেওয়া হয়। সে মুশরিক হলেও, গোপনীয়তা রক্ষায় ঝানু এবং বিশ্বস্ত ছিল।[৩৯৬]

আমার কওম যদি আমাকে না বের করে দিত!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উষ্ট্রীতে করে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। একটি টিলায় উঠে তিনি পবিত্র নগরীকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে মক্কা, আল্লাহর কসম, তুমি তো ভূপৃষ্ঠের সর্বোত্তম নগরী এবং আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। আমাকে যদি আমার কওম বের করে না দিত, আমি কখনোই তোমার থেকে বের হতাম না।'[৩৯৭]

এই ঘটনা ২৮ সফর (মাদানি) ১লা হিজরি (১০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)-এর।[৩৯৮]

কুরাইশ ধারণা করেছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতেরবেলা হিজরত করবেন। তারা সে রাতেই নবীজির ঘর ঘেরাও করে। সে সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মোতাবেক হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বিছানায় চাদর গায়ে

---

৩৯৬ ঘটনার এই বর্ণনাবিন্যাস বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত থেকেই পাওয়া যায়। দেখুন সহিহ বুখারি- ৩৯০৫, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৭

৩৯৭ সুনান তিরমিজি- আবওয়াবুল মানাকিব, বাবুন ফি ফাজলি মাক্কাহ

৩৯৮ তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২২৪ (خرج منها في صفر وقدم المدينة في شهر ربيع الأول)
অন্যান্য রেওয়ায়েত দ্বারা হিজরতের দিন সোমবার এবং রবিউল আওয়াল মাস সুনির্দিষ্ট। এর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য দেওয়া যায় যে, সফরের শেষদিকে ঘর থেকে বের হয়ে গারে সাওরে যান। সেখানে তিনরাত লুকিয়ে থাকার পর রবিউল আওয়ালের প্রথম সোমবার মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই হিসেবে গারে সাওরের মধ্যে আত্মগোপনের দিন ২৭ রজব শুক্রবার হয়।

দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন।[৩৯৯] কুরাইশ ধোঁকা খায়। তাদের কাছে আত্মীয়স্বজনের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা ছিল দোষের বিষয়। এজন্য তারা চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখে। দেওয়াল নিচু হওয়ার পরেও তারা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।[৪০০]

আবু জাহল সোজা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে যায়। হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অজ্ঞতার কথা

---

[৩৯৯] সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৩

ফায়েদা : ১। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত দুর্বল। মূলনীতি হলো, দুর্বল রেওয়ায়েত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা সহিহ রেওয়ায়েত পরিপন্থি না হবে। ইবনে ইসহাকের উল্লিখিত রেওয়ায়েতের কিছু কথা গ্রহণযোগ্য। যেমন হজরত জিবরিল আমিন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেন, আজ রাতে আপনি আপনার বিছানায় ঘুমাবেন না।' এতে কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এটা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক যে, ভোরেই তাঁকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

তদ্রুপ হজরত আলি রা.-ও নবীজির বিছানায় শোয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুপুরবেলা বের হওয়ার সময় তাঁকে এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন যে, মুশরিকদের মাথায় ধুলোবালি উড়িয়ে তিনি রাতেরবেলা ঘর থেকে বের হয়ে যান।

আল্লামা শিবলি রহ. এই দুই রেওয়ায়েতের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য দিয়েছেন যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুপুরবেলা আবু বকর রা. এর ঘরে গিয়ে হিজরতের প্রস্তুতি নেওয়ার হুকুম দিয়ে আসেন। তার এক দু'দিন পর রাতেরবেলা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘর থেকে হিজরতের জন্য বের হন।

কিন্তু সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতে দেখা যায়, হজরত আবু বকর রা. এর ঘরে এমন তাড়াহুড়ো পড়ে যায় যে, খাবারের থলে এবং পানির মশকের মুখ বাঁধার মতো কোনো রশি না পাওয়া যাওয়ায় পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে তা বাঁধা হয়।' এই বর্ণনার সঙ্গে তো উপর্যুক্ত সামঞ্জস্য খাপ খায় না।

ফায়েদা : ২। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে শোয়ার সময় চাদর মুড়িয়ে শুতেন, সেভাবেই হজরত আলি রা. শুয়ে ছিলেন। রেওয়ায়েতে এসেছে-

فبات فيه عليّ وتغشى بردا أحمر حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه

যারা হিজরতের ঘটনা শীতকালে হয়েছে বলেন, তারা তাদের দাবি জোরদার করার জন্য উপর্যুক্ত বর্ণনায় উল্লিখিত চাদরকে 'পশমি চাদর' হিসেবে ব্যক্ত করেন। অথচ 'পশমি' বুঝায় এমন কোনো আরবি শব্দ রেওয়ায়েতে ব্যবহৃত হয়নি।

[৪০০] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ৩/২৩৪

জানালেন। আবু জাহল তাকে এত জোরে থাপ্পড় মারে যে, কানের দুল খুলে পড়ে। কিন্তু এরপরেও আল্লাহর এই বান্দি মুখ খোলেননি।[৪০১]

গারে সাওরে আত্মগোপন এবং কুরাইশের টোপ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারে সাওর পৌঁছেই দুটি উষ্ট্রী আবদুল্লাহ বিন উরাইকিতকে দিয়ে[৪০২] তৃতীয় রাতে এখানে আসার জন্য বলে দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু অনেক চতুর বালক ছিলেন, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় মক্কাবাসীর সকল শলাপরামর্শ এবং পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ গুহায় পৌঁছে দিত। রাত গুহাতেই কাটাত। আমের বিন ফুহাইরা সারাদিন বকরি চড়িয়ে সন্ধ্যার পর বকরির দুধ পরিবেশন করতেন।[৪০৩]

কুরাইশ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহরে খুঁজে না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় তল্লাশি করতে শুরু করে। তাকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করে আনতে পারলে একশ' উট

---

৪০১ সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৭। এক যয়িফ বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আসমা রা. রাতেরবেলা গারে সাওরে খাবারও নিয়ে যেতেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৪৪৭]

৪০২ বুখারি ও ইবনে হিব্বানের সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতে ঘর থেকে বের হওয়ার রেওয়ায়েতগুলো সহিহ নয়। তা ছাড়া সনদের দিক থেকেও সেগুলো দুর্বল। তদ্রূপ পায়ে হেঁটে গারে সাওর পর্যন্ত যাওয়ার কথাও সহিহ নয়। কারণ, ইবনে হিব্বানের সহিহ রেওয়ায়েতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, 'এরপর তারা দু'জন উষ্ট্রীতে আরোহণ করে গারে সাওরে পৌঁছেন।' হ্যাঁ, একটি যয়িফ রেওয়ায়েতে এসেছে, পাহাড়ের এমন দুর্গম পথে হজরত আবু বকর রা. নবীজি সা কে কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৪৫০]
তবে যৌক্তিক হলো, গারে সাওর পাহাড়ের যতটুকু পর্যন্ত যাওয়া যায়, তারা দু'জন সওয়ারিতে করেই গিয়েছেন। এরপরের দুর্গম পথ পায়দল অতিক্রম করেছেন। সহিহ বুখারির রেওয়ায়েত থেকেও সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। [সহিহ বুখারি- ৪০৯৩ - فانطلقا حتى أتيا الغار]

৪০৩ সহিহ বর্ণনার মাধ্যমে আমের বিন ফুহাইরার কর্মতৎপরতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বুঝা যায়। তিনি দুধ পান করানোর জন্য বকরিগুলোকেও সঙ্গে নেওয়ার পেছনে কারণ ছিল বকরিগুলোর আসা-যাওয়ার ফলে মানুষের পদচিহ্ন মুছে যাবে। কেননা, কুরাইশ পদচিহ্নের মাধ্যমে খুঁজে নিতে পারদর্শী ছিল। [সিরাতে ইবনে হিশাম- ১/৪৮৬]

পুরস্কার ঘোষণা করে।[৪০৪] এমন লোভনীয় পুরস্কারের ঘোষণা শুনে বহুলোক তাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ঘটনাক্রমে খোঁজ করতে করতে কিছু কিছু লোক গারে সাওরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেরেশানি চরম আকার ধারণ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যান। অস্থির হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই লোকগুলো যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায়, তা হলেই তো আমাদের দেখে ফেলবে'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে উত্তর দেন, 'আবু বকর, ঘাবড়াবে না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

কুরাইশরা এত কাছে পৌঁছেও বিফল হয়ে ফিরে যায়।[৪০৫]

গারে সাওর থেকে হিজরতভূমির উদ্দেশে

তিনরাত লুকিয়ে থেকে রাতের শেষপ্রহরে পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুহা থেকে বের হন।[৪০৬] বাহন হিসেবে দুই উষ্ট্রী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। পথনির্দেশক

---

[৪০৪] সহিহ বুখারি- ৩৯০৫ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৭

[৪০৫] সুরা তাওবা, আয়াত ৪০; সহিহ বুখারি- ৩৬৫৩ (বাবু মানাকিবিল মুহাজিরিন, সহিহ ইবনে হিব্বান- ৬২৭৮

[৪০৬] শহর থেকে হেরাগুহা পর্যন্ত যেতে দুই প্রহর সময় লাগে। [সহিহ বুখারি- ৩৯০৫, ৩৯০৭]। আর গুহা থেকে মূল সফর রাতে শুরু হয়েছিল। সহিহ বুখারিতে হজরত আবু বকর রা. এর শব্দ থেকেও তা বুঝা যায়: (أسرينا ليلتنا ومن الغد: ٣٦١٥) (فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا: ٣٩٧١ ويومنا) কিন্তু হজরত আবু বকর রা. এর (صبح ثلاث: رواه البخاري: ٢٢٦٤) থেকে এটাও পরিষ্কার হয়, সফর রাতের শেষপ্রহরে আরম্ভ হয়েছে। আর এটাকেই তিনি 'সুবহ' শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গারে সাওরে পূর্ণ তিনদিন (৭২ ঘণ্টা) নয় বরং ৬০ ঘণ্টার কাছাকাছি সময় অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ জুমার দুপুরে তিনি ঘর বের হওয়ার পর আনুমানিক তিন ঘণ্টা তথা ষষ্ঠপ্রহরে তারা গারে সাওরে পৌঁছে যান। জুমার দিন ষষ্ঠপ্রহর থেকে নিয়ে রবি এবং সোমবারের মাঝামাঝি রাতের শেষপ্রহর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

ফলে আত্মগোপনের সময়কাল পূর্ণ তিনদিন তিনরাত নয়, বরং দুই দিন তিন রাত হয়। বুখারির রেওয়ায়েত [হাদিস : ৩০৯৫] 'তিন রাত' থেকেও উপর্যুক্ত বক্তব্য সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত এবং আমের বিন ফুহাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুও এসে পৌঁছেছিল। এবার চার ব্যক্তির কাফেলা একটি দুর্বোধ্য রাস্তা দিয়ে চলা শুরু করল। এটি সাধারণ জনপদের তুলনায় উপকূলের নিকটবর্তী রাস্তা ছিল।

১লা হিজরি রবিউল আওয়াল (১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) সোমবার আপন গন্তব্যের উদ্দেশে তারা যাত্রা করেন। একরাত এবং পরবর্তী দিন খুব দ্রুততার সাথে তারা পথ চলেন। প্রচণ্ড গরম ছিল। দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো মানুষ দেখা যেত না। গরম, ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে দ্বিপ্রহরের সময় তারা ছায়া তালাশ করতে লাগলেন। এক জায়গায় তারা একটি উঁচু চওড়া পাথর দেখতে পান। তার কিছু ছায়া দেখা যায়। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে জমিনে চাদর বিছিয়ে দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আরাম করুন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন, আর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চতুর্দিকে পায়চারি করে দেখছিলেন কেউ তাদের পেছনে পেছনে আসছে কিনা। কিছুক্ষণ পর এক রাখাল তার বকরির পাল নিয়ে ছায়ার খোঁজে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার রাখালি করো? সে কুরাইশের এক ব্যক্তির নাম বলল। সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার কাছে কি কোনো দুধাল বকরি আছে?' সে ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, আমাদেরকে দুধ পান করাবে?'

রাখাল তখন পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করার জন্য বসে যায়। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, প্রথমে তুমি বকরির ওলান, পাত্র এবং তোমার হাত ধুলোবালি থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাখাল সব পরিষ্কার করে নেয়। এরপর সে দুধ দোহন করে তাদের সম্মুখে পরিবেশন করে।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগাতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু দুধ নিয়ে কাছে আসতেই তিনি জেগে উঠলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে থাকা মুখ-বাঁধা মশক থেকে দুধের সাথে পরিষ্কার পানি মেশান এবং এই ঠান্ডা দুধ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরিবেশন

করে বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এইটুকু আপনি পান করুন!' পান করা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের রওনা হওয়ার সময় হয়েছে কি?'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হয়েছে!'[৪০৭]

সূর্য তখন ঢলে পড়েছিল। সফর পুনরায় শুরু হয়। বিরান পথ শেষ হয়ে গেছে। এখন এমন কিছু কবিলা সামনে পড়ছিল, যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিনতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিনতেন না। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে বয়স্ক মনে হতো, অপরদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একেবারে নওজোয়ান ও তরুণ দেখাত। লোকেরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করত, 'আবু বকর, তোমার সঙ্গে উনি কে?' তিনি উত্তর দিতেন, هذا الرجل يهديني السبيل 'উনি আমাকে পথ দেখান।'[৪০৮] মানুষ মনে করত তিনি

---

[৪০৭] সহিহ বুখারি- ৩৬১৫ (বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ), বাবু মানাকিবিল মুহাজিরিন, হাদিস : ৩৬৫২, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- হাদিস ৩৯১৭

[৪০৮] সহিহ বুখারি- ৩৯১১ বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

কিছু উপকারী তথ্য

১.সহিহ বুখারির এই দৃশ্যপট বর্ণনা বলে দিচ্ছে যে, হিজরত শীতে নয়, বরং গ্রীষ্মকালে হয়েছিল। অন্যথায় শীতকালে ধূমায়িত জিনিসই প্রিয়, ঠাণ্ডা পানীয় নয়।

২.নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহা থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম যে জায়গায় বিশ্রাম করেন, তার নাম 'কুদাইদ' ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২৩২] এটি মক্কা মুকাররমা থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ থেকে বুঝা যায়, প্রথম ১০ ঘণ্টার সফর খুব দ্রুত ছিল। প্রতিঘণ্টায় ১০ মাইল অতিক্রম করা হয়।

৩.যে অপ্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়ে হিজরতের এই দীর্ঘ সফর সংঘটিত হয়েছিল, তার দৈর্ঘ্য ছিল ৪৪৬ কিলোমিটার (২৭৭ মাইল) অর্থাৎ ১৭ মঞ্জিল। এই দীর্ঘপথ মাত্র সাতদিনে পাড়ি দেন। তার অর্থ হলো, সফরের গতি অস্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত ছিল। হজরত আবু বকর রা. এর [أحثثنا: সহিহ বুখারি- ৩৯৭১] শব্দও দ্রুতগতির কথা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে। বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে দুই উষ্ট্রীকে হজরত আবু বকর রা. এর চার মাস প্রতিপালন ভালো ফল দিয়েছে।

৪.হাদিসের রাবিগণ সফরের রাস্তার পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন। ইবনে সাদ এর রেওয়ায়েত মোতাবেক হিজরতের সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত স্থানগুলো দিয়ে অতিক্রম করেছেন : কুদাইদ, খাররার, সানিয়াতুল মাররা, লাক্‌ফ, মাদলাজাতু লাক্‌ফ, মাদলাজাতু মিজাজ, মিরহাজু মিজাজ, বাতনে মিরজা,

সাধারণ গাইড। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্য ছিল তিনি সঠিক পথের দিশারি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে কুরআনে কারিমের তেলাওয়াত করছিলেন। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন। কারণ, তখনও কারো পিছু নেওয়ার আশঙ্কা ছিল। বাস্তবেও বিপদ তাদের মাথার উপর ছিল। বনু মুদলাজের এক ঘোড়সওয়ার সুরাকা বিন মালিক কুরাইশের সেই একশ' উট পুরস্কারের ঘোষণা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানে লাগে। অবশেষে সে মরুভূমিতে দূর থেকে নবীর কাফেলার সন্ধান পেয়ে যায়। সুরাকা ঘোড়ায় চাবুকাঘাত করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে কাফেলা থেকে তার দূরত্ব কমিয়ে আনে। একপর্যায়ে সে এত নিকটে চলে আসে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের আওয়াজও শুনতে পায়। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত ধাবমান একটি ঘোড়সওয়ার আসতে দেখে বললেন, 'এ ঘোড়সওয়ার তো আমাদের নিকটে পৌঁছে যাবে?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'বিচলিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন।' এরপর তিনি দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, তাকে দাবিয়ে দিন।' সাথে সাথে সুরাকা বিন মালিক ঘোড়াসহ ভূমিতে দেবে যায়। সুরাকার তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা এবং তার আসন্ন বিজয় সম্পর্কে একিন হয়ে যায়। এজন্য কালবিলম্ব না করে নবীজির নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তার আবেদন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আমের বিন ফুহাইরা একটি চামড়ায় নিরাপত্তা-পত্র লিখে দেন। এরপর নবীজি তাকে নির্দেশ দেন, 'তুমি এই রাস্তায় থাক, কাউকে এদিকে আসতে দেবে না।' সুরাকা তার নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৪০৯]

বাতনে যাতু কাশদ, আলহাদায়িদ, আল-ইযাখির, বাতনে রায়েগ, যু-সালম, মাদলাজা, উসানিয়া, বাতনুল কাহাহ, আল-আরজ, আল-জাদাওয়াত, আল-গাবির (রাকুবার ডানে), বাতনুল আকিক, জিসজাসা, কুবা। [তাবাকাতে ইবনে সাদ- ১/২৩২, ২৩৩]

[৪০৯] সহিহ বুখারি- ৩৬৫২, ৩৬১৫ (বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ), বাবু মানাকিবিল মুহাজিরিন, হাদিস : ৩৬৫২, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

সুরাকা বিন মালিকের জন্য সুসংবাদ

ইসলামের ইতিহাসে যখন দুর্দিন চলছিল, স্বয়ং নবীজির জীবনই যেখানে বিপন্ন ছিল, সেই মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকা বিন মালিককে এমন সুসংবাদ দেন, যা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ বহন করে এবং মুসলমানদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জানান দেয়। তিনি সুরাকাকে বলেন, 'সুরাকা, তোমার তখন কেমন লাগবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ পরিয়ে দেওয়া হবে?'

সুরাকা বিন মালিক তখন সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। সাথে সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণতার উপর তার একিন হয়ে গিয়েছিল। কে জানত যে, মাত্র পনেরো বছর পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কিসরার ধনভাণ্ডার মুসলমানদের পদানত হবে এবং নওশেরওয়াঁর কঙ্কণ সুরাকার হাতে পরিয়ে দেওয়া হবে?'[৪১০]

সুরাকা বিন মালিক তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং সেদিকে আগত সকল মুশরিককে এ বলে ফিরিয়ে দেয় যে, আমি এদিক খুঁজে চলে এসেছি।[৪১১] পরবর্তীতে সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিদের কাফেলায় শামিল হয়ে যান।

অবশেষে এই মোবারক কাফেলা তার গন্তব্যের কাছাকাছি প্রসিদ্ধ জনপথে উঠে যান। এখানেই সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয় শাম থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের একটি বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে। এদের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামাতা জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়চোপড় ধুলোয়

ওয়াসাল্লাম; হাদিস ৩৯১৭; সহিহ মুসলিম, ৭৭০৬ (আয-যুহদ ওয়ার রাকায়িক, বাবুন ফি হাদিসিল হিজরাহ), দারুল জীল সংস্করণ

নোট : বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, উপকরণহীন এমন সফরেও লেখাপড়ার উপকরণ ঠিকই সঙ্গে নিয়েছিলেন। অথচ এ ধরনের সফরে এমন জিনিসের প্রয়োজন পড়ার আশংকা ছিল খুবই ক্ষীণ। এতেই বুঝা যায়, ইসলামে লেখালেখির গুরুত্ব কত।

[৪১০] দালাইলুন নুবুওয়াহ- ৬/৩২৫

[৪১১] সহিহ মুসলিম, ৭৭০২ (আযযুহদ ওয়ার রাকায়িক, বাবুন ফি হাদিসিল হিজরাহ), দারুল জীল সংস্করণ

ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে একটি সাদা কাপড় হাদিয়া দেন।[৪১২]

পাঠকবৃন্দ আশাকরি সুস্পষ্টভাবে বুঝে গিয়েছেন যে, এই ঐতিহাসিক হিজরত সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবারসহ জানমাল দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দিয়েছেন। হিজরত শুরুও হয়েছে তার ঘর থেকেই। গুহায় আত্মগোপনের বিষয়টি প্রকাশ হতে না দেওয়ার দায়িত্বও আদায় করেছে তার পরিবার। সর্বশেষ তার পরিবারের সদস্যই হাদিয়া পেশ করার গৌরব অর্জন করেন। এর থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে গভীর সম্পর্ক এবং তার উপর আস্থাশীলতার পরিমাণ অনুমান করা যায়।

গারে সাওরের আয়াতের আলোকে হজরত আবু বকরের মর্যাদা

হিজরতের এই স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক সফরের কথা কুরআনে কারিমেও আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা গারে সাওরের নিঃসঙ্গতায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহচর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

[৪১২] সহিহ বুখারি- ৩৯০৫ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
হিজরতের সফরনামা এত লম্বা করে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে-
প্রথমতঃ ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাটির অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। আর এজন্যই ইমাম বুখারি রহ. তার নিকট সংক্ষিপ্ততা পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সহিহ বুখারিতে হিজরতের সফরকাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।
দ্বিতীয়তঃ সিরাতের কিতাবসমূহে হিজরতের কাহিনি সংশ্লিষ্ট অনেক যয়িফ বরং মাওজু রেওয়ায়েতও এসেছে। অথচ সহিহ রেওয়ায়েতসমূহে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আসেনি। এজন্য আমরা চেষ্টা করেছি সহিহ রেওয়ায়েতের আলোকে হিজরতের মূল চিত্রটা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। কিছু টুকরো কথা ছাড়া অধিকাংশ তথ্যই সহিহ বুখারি থেকে নিয়েছি।

'যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন। যখন তারা গুহায় ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪১৩]

ইমাম রাজি রহ. এর তাত্ত্বিক আলোচনা

ইমাম রাজি রহ. তার 'তাফসিরে কাবির' গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। আমরা নিচে তার সারকথা তুলে ধরছি-

হিজরতের সফর মূলত কুরাইশের নিপীড়ন ও শত্রুতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের ব্যাপারে যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দুপরিমাণ সংশয় থাকত, তা হলে তাকে কখনোই সঙ্গে নিতেন না। কেননা, আশঙ্কা রয়ে যেত যে, সে আবার দুশমনকে অবহিত করে দেয় কিনা। কেবল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই তার উপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস প্রমাণ করে এবং এই বাস্তবতারও মজবুত দলিল যে, তিনি তার একজন নিষ্ঠাবান, মুখলিস, বিশ্বস্ত ও অনুগত সঙ্গী ছিলেন।

হিজরত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে হয়েছে। এত সাহাবি এবং আত্মীয়স্বজন থাকতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেবল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেছে নেওয়াই সবার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

আল্লাহ তায়ালা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'দুজনের একজন' বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, তিনিই মান-মর্যাদার অধিকাংশ আসনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় ব্যক্তি তথা সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৪১৩] সুরা তাওবা, আয়াত ৪০

ওয়াসাল্লামের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, যার মধ্যে তাওহিদ ও আকিদা ভরপুর ছিল। তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যার প্রচেষ্টায় হজরত তালহা, জুবাইর, উসমান বিন আফফানসহ বড় বড় সাহাবিরা মুসলমান হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনায় পৌঁছেন, তখন সঙ্গে কেবল হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন। আনসাররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখেছিল, তিনি হলেন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি প্রতিটি গাজওয়াতে শরিক হয়েছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হননি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতার সময়ও 'দুজনের একজন' ছিলেন। তিনিই নামাজের ইমামতি করেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে দাফন হয়ে তিনি ঐ জগতেও 'দুজনের একজন' হয়ে থাকেন।

গারে সাওরে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন,

ما ظنُّك باثنين الله ثالثُهما

ওই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ?

এই শত গুলো চিরকালের জন্য নবীজির সংশ্রব এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের সার্টিফিকেট ছিল। এর চেয়ে বড় কোনো সম্মাননা হতে পারে না।

মুফাসসিরগণ একমত যে, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ দ্বারা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা لِصَاحِبِهِ বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'যে ব্যক্তি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহাবি না মানবে, সে উক্ত আয়াত অস্বীকার করার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।[৪১৪]

* * *

[৪১৪] তাফসিরু মাফাতিহুল গায়েব (আততাফসিরুল কাবির), ফখরুদ্দীন রাজি : ১৬/৫০-৫৪ (দারু ইহয়াতিত তুরাসিল আরাবি সংস্করণ)

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে আল-মানহালের অনুমতিপত্র

Al-MANHAL
Publishers

Ref: AMP-107

Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلادیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور و معروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

SM 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Johar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

Al Manhal Publisher
Block 1-A, Gulistan-e-Johar, Karachi
021-34612901 | 0321-3135009

حامد علی کھوکھر
جنرل منیجر
المنہل پبلشرز، کراچی

ইত্তিহাদ

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

Cover: Kefayat 01712-813999